বিশ্বভারতী
পত্রিকা
সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সপ্তম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৫ — আষাঢ় ১৩৫৬

রচনাসূচী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

স্টেলা ক্রাম্‌রীশ

চিত্রসূচী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনোহর

শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শশিকুমার হেস

—

প্রতিকৃতি

—

বটতলা পুস্তক-চিত্র

—

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি

রাজপুত্তুর

শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫৫

পালকি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা
নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে
আয়ত তার আসনে,
যোলো বেহারার কাঁধের মাপের ডাণ্ডায়।
এ দিকে, এ কালের বরখাস্তকরা
নামকাটা অপমানের নানা দাগ
তার সকল গায়ে।
সে প'ড়ে থাকত দালানের বারান্দার
এক ধার ঘেঁষে
ঠেলামারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে।
আমার তলিয়ে-যাওয়া ডুবসাঁতার ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে।
খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি
এতেই ছিল আমার খুশি,
এক মুহূর্তে পেরিয়ে যেতুম
সতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

বাইরে বাড়িভরা লোক,
সামনের আঙিনায় চলছেই আনাগোনা।
যখন আটটা ন'টা বেলা,
এই আঙিনায় ভিখিরি জমেছে মুষ্টিভিক্ষার চালের জন্যে,
প্যারী বুড়ি ধামা কাঁখে হাত দুলিয়ে আনছে তরিতরকারি,
বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে দুখন বেহারা
গঙ্গার জল ঘড়ায় ভ'রে

অন্দরমহলে তাঁতিনি যাচ্ছে
নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওদা করতে,
স্যাকরা আসছে পাওনার দাবি জানাতে
খাতাঞ্চিখানায়,
পুরোনো লেপের তুলো ধুনতে
এসেছে ধুনুরি—
দেউড়িতে মাঝে মাঝে বাজছে ঘণ্টা।

আমি একলা,
এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্নহীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

আগের সন্ধেবেলায়
ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের ঝোপে,
রোঘো ডাকাতের গল্প জমেছিল
ছায়াকাঁপা ঘরে
মিট্‌মিটে আলোতে—
দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি।
ছুটির দিনের জাদু লাগল।
বিনা চলায় চলল আমার পালকি
অদৃশ্য ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে।
নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল
বেহারাগুলোর হাঁইহুঁই হাঁইহুঁই।
ধূ ধূ করে মাঠ,
বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে,
আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হাঁ হাঁ।

দূরে ঝিক ঝিক করে কালিদিঘির জল,
চিক চিক করে বালি—
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে
প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ।
ঐ অখ্যাত ভূবৃত্তান্তে
জমা হয়ে আছে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক
গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে।
এগোচ্ছি কাছে, দুর দুর করছে বুক,
ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে।
বাঁশের লাঠির পিতলবাঁধানো আগাগুলো
দেখা যাচ্ছে দুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে।
কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখেনে,
জল খাবে—
তার পরে ?
রেরেরেরে রেরেরেরে।

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল— এক দুই তিন,
এ কালের সময় এসে পড়ল
পালকির পাঁজি ডিঙিয়ে,
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা
দাঁড়িয়ে আছে গল্পটাকে মাড়িয়ে দিয়ে।

মংপু
২৪ এপ্রিল ১৯৪০

ইংরেজি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে মংপু-বাসের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিচিত্র গদ্যছন্দে প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ দুইটি কবিতা আছে; 'পালকি' তাহার অন্যতর। 'ছেলেবেলা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভাংশ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়। —শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তানসেন ঘরানা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বাদশাহী আমল হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতে ভারতীয় সংগীতের ধারাকে গৌরবের সহিত বজায় রাখিয়াছেন তানসেনের "ঘরানা" অর্থাৎ পরিবার। তাই তানসেনের ঘরানার ও সেই বংশীয়দের সাধনার কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। এই বিষয়ে আমার জানাশুনা যাহা ছিল তাহা অন্যত্রও আমি বলিয়াছি। তাহার পর পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য তাঁহার বিখ্যাত পুরাতন-সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে, এবং পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী "হিন্দুস্থানী কলচর ও সংগীত" নামে হিন্দুস্থানী-উর্দু কাগজ নয়া-হিন্দের মধ্যে বৎসরাধিক কাল যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই এই প্রবন্ধে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের সহায়তা বিনা এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইত না।

আকবরের দরবারে বাবা রামদাস, তানসেন, ব্রজচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় গুণী ছিলেন। সেই যুগে সিংহলগড়ের রাজা সমুখনসিংহ বীণার অসাধারণ গুণী ছিলেন। আকবর তাঁহাকে কোনো মতে বশ মানাইতে না পারিয়া তাঁহার পুত্র মিশ্রীসিংহকে জোর করিয়া ধরিয়া আনেন ও অনেক কষ্টে সিংহকে শান্ত করেন। মিশ্রীসিংহও পিতার মতই বীণার গুণী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদ্যে অসাধারণ ওজস্বিতা ছিল।

তানসেনের জন্ম গৌড় ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁহার পিতা মকরন্দ পাণ্ডে রেওয়ায় বাঘেল রাজা রামচন্দ্রের দরবারী গুণী ছিলেন। তানসেন প্রথমে ছিলেন বৃন্দাবনের বাবা হরিদাস স্বামীর শিষ্য, পরে গোয়ালিয়রের সুফী ফকীর মহম্মদ ঘোসের কাছে শিক্ষা নেন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে তানসেন-পরিবারে এখনও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের অনেক আচার বজায় আছে। তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

মোটামুটি ১৫৩১ হইতে ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তানসেন জীবিত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, গত হাজার বছরের মধ্যে এমন গুণী জন্মান নাই। কবি হিসাবেও তানসেন অতিশয় মাননীয়। তাঁহার গানে হিন্দুব্রাহ্মণোচিত ভক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। ধ্রুপদ-ভৈরবে তাঁহার গানে শিবের অপূর্ব সব বন্দনা দেখিতে পাই।

মহাদেব মহাকাল ধূরজটী শূলী পঞ্চবদন প্রসন্ন নেত্র।
পরমেশ্বর পরাৎপর মহাযোগী মহেশ্বর পরমপুরুষ প্রেমময়
ভিন্ন ভিন্ন পথ যৈসে আরত, সিন্ধুরা পাত্র রহত মগন
তানসেন ঐ হৈ—তৈসে ভিন্ন ভিন্ন মুরতি উপাসত ঐ মহীসমূহ আরত।

সরস্বতী বিষয়েও মিঞা তানসেনের একটি ধ্রুপদ উদ্ধৃত করা যাউক।

সরস্বতী মাতা হো বরদাঈ
ব্রহ্মা বিষ্ণুকী তো হৈ দুহাঈ···
বীচ সভা কে রহো সহাঈ
দেত তোহে অব রাম দুহাঈ। সরস্বতী···

দরবারী শোভাযাত্রায় তানসেন

শিল্পী মনোহর। আনুমানিক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ
মূল চিত্র রামপুর সরকারী গ্রন্থাগারে রক্ষিত

চিত্রের উত্তরার্দ্ধের দক্ষিণ দিকে বাদ্যযন্ত্র হস্তে তানসেন।
রাজপতাকায় তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের একাংশ অদৃশ্য।

দীপাবলীর উৎসবে মিঞা তানসেনের বংশীয়েরা স্বহস্তে গৃহপ্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত করিয়া সরস্বতী-পূজায় বসিয়া এই ধ্রুপদটিই গান করেন।

আবার মুসলমানী ভাবের পদেও তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখা যায়। সেইরূপ গানও উদ্ধৃত করা যাউক।

তু অব যাদ কর যে বন্দে
আপনে অল্লাহ কো,
জো কুছ ভলা হো তেরো
লা ইলাহ ইল্লিল্লাহ, মুহম্মদ রসুলিল্লাহ,
নবীজীকা কলাম জবাঁ পর ধর লে বন্দে।

তানসেনের গানেই দেখা যায় চারি প্রকারের ধ্রুপদ ছিল। তাহার মধ্যে রাজা হইল "গৌড়হার," সেনাপতি হইল "খংডার," মন্ত্রী হইল "ডাগুর," বকসী হইল "নরহার"।

বাণী চারোঁকে ব্যোহার
সুন লীজে হো গুণীজন তব পারে বিদ্যাসার।
রাজা গোররহার, ফৌজদার খংডার, দীরান ডাগুর, বকসী নররহার।
অচল সুর পঞ্চম, চল সুর রেখব, মধ্যম ধৈবত নিখাদ গংধার,
সপ্তক তীন, ইকীস মুরছনা, বাঈস শ্রুতি, উনংচাস কুটতান, তানসেন আধার। (ধ্রুপদ ভূপালী)

ইহার মধ্যে তানসেনের রীতি হইল গৌড়হার। তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ বংশীয়। ইহা ধীরস্থির বলিয়া রাজা। মিশ্রীসিংহের রীতি ক্ষত্রিয়ের ওজস্বী রীতি, তাহাই সেনাপতি। ঠাকুর হরিদাসই ডাগুর (ঠাকুর), তাঁহার রীতি দীরান বা মন্ত্রী।

মিশ্রীসিংহের বীণাতে ক্ষত্রিয়কুলোচিত বীরত্ব ছিল। তাই তাহা ছিল খড়্গবৎ তীক্ষ্ণ। সেই বাণীর নাম খড়্গবাণী বা খাণ্ডার-বাণী। মিশ্রীসিংহ তানসেনকে প্রভূত সম্মান করিতেন। কারণ তানসেন ছিলেন মিশ্রীসিংহের পিতার গুরুভাই। তানসেনের অনুরোধে মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে বীণা শিখাইতেন। এভাবে উভয়ে প্রেম হয়। মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মিশ্রী খাঁ হন। পারসীতে 'নবাত' অর্থে মিশ্রী। তাই নবাত খাঁ নামেও তিনি পরিচিত। মিশ্রী বংশে তানসেনের যে দৌহিত্রধারা চলে তাহাতে ন্যামত খাঁ, সদারং, অদারং প্রভৃতি বহু গুণীর জন্ম হইয়াছে। তানসেনের পুত্রগত ও কন্যাগত বংশের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইবে। ইঁহারাই সারা উত্তর-ভারতের সংগীতবিদ্যাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

তানসেনের ধারায় চিরদিন বীণাযন্ত্রেরই সমাদর। বীণাকে ইঁহারাও সর্বকলাযুক্ত, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। তানসেনের পুত্র ও কন্যার বংশ ছাড়াও দুইএকটি প্রখ্যাত বীণকার-ঘরানা উত্তর-ভারতে আছেন। সেইরূপ এক বংশের শেষ গুণী সাদিক অলী খাঁ রামপুর দরবারে উজীর খাঁর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহাদের আদিপুরুষ মাধব নামে ব্রাহ্মণ নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের বীণকার ছিলেন। 'মাধবানল কন্দলা' গ্রন্থ ঐ মাধবেরই কথা। এই বংশেরই শিষ্য হরিদাস ও বৈজু বাওয়া। সাধক গুণী বৈজু কোনোদিন কোনো দরবারে ধরা দেন নাই। আকবর তাঁহাকে বহু চেষ্টায়ও বাঁধিতে পারেন নাই।

সাদিক অলী খাঁর পিতা মুশর্‌রফ খাঁও অপূর্ব গুণী ছিলেন। তাঁহার গুরু বন্দে অলী খাঁর সমতুল্য গায়ক-বাদক নাকি কেহ দেখেন নাই। তাঁহারা সবাই সাধক-বৈজুবাওয়ার ধারার শিক্ষা পাইয়াছেন।

এই সব গুণী অতিশয় উদার ও মুক্তপ্রাণ, সাম্প্রদায়িক কোনো সঙ্কীর্ণতার ধার ইঁহারা ধারিতেন না। ইঁহারা যেমন মুক্তপ্রাণ তেমনি মুক্তহস্ত। অনেকের আয়ও বেশি ছিল না। তাই ইঁহারা প্রায়ই ঋণ করিতে বাধ্য হইতেন। ঋণ করিতে গেলে যদি কিছু বাঁধা রাখিতে হয়; তবে বাঁধা রাখিবার মত ইঁহাদের ছিলই বা কী? বিত্তের মধ্যে তো এক রাগরাগিণী। তখনকার দিনে বানিয়ারা কোন্ কোন্ রাজা-বাদশার প্রিয় কোন্ কোন্ রাগ, তাহার খবর রাখিতেন, এবং সেইসব রাগ বাঁধা রাখিয়া গুণীদের কর্জ দিতেন। দরবারে সেই রাগের ফরমাইস হইল, কিন্তু গুণী বাজাইতে অক্ষম। এমন অবস্থায় দরবারের লোক আসিয়া নগদ টাকা দিয়া রাগরাগিণী ঋণমুক্ত করিলে গুণী তাহা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ঘটনা তখনকার দিনের বিবরণে পাওয়া যায়।

যে সব গুণীদের কথা বলা হইতেছে ইঁহারা উত্তর ভারতের। দক্ষিণ ভারতের গুণী ও বীণকারদের ধারা স্বতন্ত্র। ত্যাগরাজ প্রভৃতিদের প্রভাব সেই দেশে। সেখানকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতির বীণাও অপূর্ব বস্তু। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁহার বীণাতে যেন অন্তরাত্মা কথা বলিত।

তানসেনের বংশের কথা বলিতে গেলে তাঁহার পুত্রদের ধারা এবং কন্যা সরস্বতীর ধারা বলিতে হয়। দুই ধারাই সংগীতে সমান সিদ্ধহস্ত। তানসেনের পুত্রগত ধারা প্রধানত রবাবে ও বীণায় প্রবীণ। তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম বা মকরন্দ পাণ্ডে। তানসেনের নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে। স্ত্রীর নাম প্রেমকুমারী। তাঁহাদের চারি পুত্র ও এক কন্যা সরস্বতী। মিশ্রীসিংহের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ হয়। তানসেনের চারি পুত্রের নাম সুরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাস সেন। সুরত সেনের পুত্র মোহসেন বা মহাসেন, তাহার পুত্র সুধীন সেন বা সুহীল সেন। মতান্তরে সুরত সেনের পুত্র সুহীল সেন ও সুধীন সেন। দ্বিতীয় পুত্র শরৎ সেন নিঃসন্তান। তৃতীয় তরঙ্গ সেন বা তানতরঙ্গের নামই আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়। চতুর্থ পুত্র বিলাস খাঁয়ের ধারাই বহুদিন চলিয়াছে। তাঁহার পুত্র উদয় সেন ও দয়াল সেন। উদয় সেনের পুত্র করীম সেন। করীমের পুত্র সুঘর খাঁ ও রাগরস খাঁ। কনিষ্ঠ রাগরসের পুত্র মসীত খাঁ সেতারের "মসীত খানী" ঢঙের প্রবর্তক। এখন এই ঢঙই সর্ব-গুণিজন-মান্য ও অতুলনীয়। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁর সন্তানের কথা জানা নাই। করীমের বড় পুত্র সুঘর খাঁর পুত্র হসন খাঁ।

হসনের পুত্র গুলাব খাঁ। গুলাব খাঁ (তানসেনের কন্যাবংশজ) বিখ্যাত সদারঙ্গের বন্ধু ছিলেন। গুলাবের তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। তৃতীয় পুত্র জীবন খাঁর দুই পুত্র বাহাদুর খাঁ ও হয়দর খাঁ। বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের রাজার আশ্রয় লন ও বাংলা দেশে সংগীতধারা বিস্তৃত করেন। হয়দর খাঁ ফকীর হইয়া যান। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে ফকীরী সাধক এক বংশ কানপুরের কাছে কালপীতে এখনও আছেন। লক্ষ্ণৌর নবাব অলী এই বংশের বড়ই ভক্ত। গুলাব খাঁর দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান খাঁর বংশ নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছজ্জু খাঁর দিগ্বিজয়ী তিন গুণী পুত্র, জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসিত খাঁ। ছজ্জু খাঁর ছোট এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ নিঃসন্তান। ছজ্জু খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহাগুণী প্যার খাঁও

নিঃসন্তান। তৃতীয় পুত্র বাসিত খাঁর তিন পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম আলী খাঁরও এক কন্যা। বীণকার অমীর খাঁর সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসিত খাঁ তিনজনেই অসাধারণ গুণী। ধ্রুপদে আলাপে যন্ত্রবাদ্যে ইঁহাদের তুলনা নাই। জাফর ও প্যার খাঁ পিতা ছজ্জু খাঁর শিষ্য। বাসিত খাঁ ছিলেন নিঃসন্তান কাকা জ্ঞান খাঁর পালিত পুত্র ও সাকরেদ। জ্ঞান খাঁ বাসিতকে যন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে যোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন। এই তিন ভাই রবাবে ও বীণায় সমান ওস্তাদ। তানসেনের কন্যাবংশীয় বিখ্যাত গুণী নির্মল শাহের ভাই-পো উমরাও এই তিনভাইয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। এই চারিজনের শিক্ষা-দীক্ষা-আনন্দ একত্রে চলিত। কাশীর মহারাজার কাছে সকলে সমবেত হইতেন। নির্মল শাহের ঘরানার অনেক গুপ্তবিদ্যা এই তিন ভাই নির্মল শাহের কাছে লাভ করেন।

এখন তানসেনের যে ধারা কন্যা সরস্বতীর সন্তানের মধ্যে দিয়া বিস্তৃত, তাহার কথা বলা যাউক। পরম গুণী অতুলনীয় বীণাবাদক রাজা সমুখন সিংহের পুত্র অদ্বিতীয় বীণকার মিশ্রীসিংহ কলাগুরু তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন ও তখন ইঁহার নাম হয় নবাত খাঁ। ইঁহাদের বংশে বড় বড় গুণী বীণকার জন্মিলেন। ইঁহাদের অষ্টম পুরুষে অপরূপ কলাবিৎ ন্যামত খাঁর জন্ম। ইঁহারই চলিত নাম সদারং। সদারং ছিলেন বাদশাহ মহম্মদ শাহ রংগেলীর দরবারে বীণকার। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে তখন তানসেনের পুত্রবংশীয় গুলাব রায় ছিলেন গায়ক। গুলাব রায় হইলেন তানসেনপুত্র বিলাস খাঁর পঞ্চম পুরুষ, দরবারে বীণকার বলিয়া ন্যামত খাঁর স্থান ছিল গায়ক গুলাব রায়ের পশ্চাতে। তখন কলাবিদ্যায় ন্যামতের তুলনা নাই। এই দুঃখে ন্যামত খাঁ দরবার হইতে কিছুকালের জন্য বিদায় লইয়া কয়েকটি ভিখারী ছেলে বাছিয়া লইয়া তাহাদের দুই বৎসর অক্লান্ত সাধনায় গান শিখাইলেন। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে সেই ছেলেদের গান শুনাইলে সকলে মুগ্ধ হইলেন। ন্যামত খাঁ ধ্রুপদের বদলে সহজতর খেয়াল ছেলেদের শিখাইয়াছিলেন। এতদিন খেয়ালের কদর দরবারে ছিল না। লোকগীত হিসাবেই তাহা চলিত। এইবার নূতন রীতির এই গান ধ্রুপদ হইতেও বেশি পছন্দ হওয়ায় খেয়ালের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। আর দুই বৎসরে গায়ক রচনা করায় ন্যামতের স্থানও গায়ক গুলাব রায়ের সমান হইল। ন্যামত খাঁকে সদারং নাম উপাধিরূপে দেওয়া হইল। ইহার পরে সব গানে ন্যামত নিজের নাম সদারঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদারঙ্গের ধারায় ক্রমে শত শত নূতন নূতন খেয়াল রচিত হইতে লাগিল। ধ্রুপদের একাধিপত্য আর রহিল না। তাহার সঙ্গে এই নবাগত রীতি খেয়ালের স্থানও স্বীকৃত হইল।

সদারঙ্গের পুত্র ফিরোজ খাঁ বা অদারঙ্গ এবং ভূপতি খাঁ বা মনরঙ্গ।

সদারঙ্গের পৌত্র জীবনশাহ এবং প্যার খাঁ। এই দুইজনেই সংগীতসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। এই প্যার খাঁ "উংগল কট" বা আঙুল-কাটা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে গাড়ীচাপা পড়িয়া তাঁহার ডান হাতের তর্জনীটি কাটা যায়। বীণা বাজাইতে এই আঙুলেরই প্রয়োজন। তাই প্যার খাঁকে গায়কী গানই শিক্ষা দেওয়া হয়। গায়কী বলিতে ধ্রুপদ ধামারের কলাবতী অংশ বুঝায়। ইঁহার দাদা জীবনশাহ বীণায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। অথচ ইনি বীণা বাজাইতে অক্ষম, তাই ইঁহার মনে এমন দুঃখ হইল যে ইনি মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা মনরঙ্গ ও জ্যাঠা অদারঙ্গের বড় দুশ্চিন্তা হইল। তাঁহারা কাঠের আঙুল প্যার খাঁর হাতে পরাইয়া তাহাতে মের্জাব চড়াইলেন। গানের জন্য রাগ-পরিচয় তো ইঁহার পূর্বেই ছিল।

এখন বীণায় ইনি অপূর্ব শক্তি লাভ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহী দরবারে এই আঙুল-কাটা প্যার খাঁ-ই বীণকার হইলেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সেই প্যার খাঁ পরলোকগত হইলেন। তাহার পরে জীবনশাহ্ হইলেন দরবারী বীণকার।

জীবন খাঁ শুধু কলাবিৎ ছিলেন না, তিনি যোগ প্রভৃতি সাধনাতেও অগ্রসর ছিলেন। তাই তিনি 'শাহ' নামে খ্যাত হন।

বাদশা রংগেলীর পরে দিল্লীর বাদশাহীর দুরবস্থা বাড়িতে লাগিল। গুণীদের আর আশ্রয় রহিল না। তাঁহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। শাহ্ আলম বাদশার পূর্বে তানসেনবংশীয় ছজ্জু খাঁ ছিলেন রবাবী, এবং ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন তাঁহার ভাই জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। ইঁহাদের বংশকে "দঢ়িয়ালী" পরিবার বলে। তখন বীণকার ছিলেন আঙুল-কাটা প্যার খাঁ; জীবনশাহ্। বড় বড় এত গুণীর সমাবেশ আর কখনো কোথাও দেখা যায় নাই।

দিল্লীর বাদশাহীর দুরবস্থা ঘটিলে তানসেনপরিবারের কেহ কেহ গেলেন রাজপুতানায় হিন্দু রাজাদের দরবারে, কেহ গেলেন কাশীরাজের আশ্রয়ে। উদয়পুরে ধ্রুপদীরা এবং গোয়ালিয়রে ও রেওয়াতে খেয়ালীরা আদৃত হইলেন। কাশীতে গেলেন রবাবীরা, সেতারীরা গেলেন জয়পুরে, বীণকারেরা গেলেন রামপুরের নবাবের আশ্রয়ে। কাশী, অযোধ্যা, গয়া, বেতিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গায়কেরা ছড়াইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের "পুরবিয়া" বলে। রাজপুতানা, রামপুর, গোয়ালিয়রের তানসেনী পরিবারকে "পশ্চিমা" বলে।

জীবনশাহের দুই পুত্র, রসবীন খাঁ ও নির্মলশাহ্। নির্মলশাহ্ ছিলেন অতিশয় উচ্চদরের গুণী। রসবীন বাল্যকালে নাকি বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পরে অনুতাপে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হন। গুরুজনদের তিনি বলিলেন, 'এই জীবনে কাজ কী?' পরে গুরুজনদের আশ্বাসে বীণার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও অচিরে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইঁহাকে মিশ্রীসিংহের অবতার বলিয়া ছোট নবাত খাঁ বলা হইত।

নির্মলশাহের বিষয়ে পরে আরও বলা হইবে। তাঁহার দুই পুত্র, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁ। অমীরের পুত্র রজীব খাঁ ও ফৈজ আলী খাঁ। রজীব খাঁর বিষয়েও কিছু ভালো করিয়া বলা দরকার। রজীব খাঁর পুত্র নজীর খাঁ, রসীর খাঁ, সগীর খাঁ। নজীর খাঁর পুত্র ঝম্মন খাঁ, দবীর খাঁ ও দিলদার খাঁ। দবীর খাঁ এখনও জীবিত এবং কলিকাতায় তানসেনী সংগীতের বড় গুণী। রেডিওর মারফতে ইঁহার পরিচয় এখন অনেকে পান।

সুরসিংগার-গুণী বাহাদুর সেন খাঁর সন্তান ছিল না। তাই তিনি রামপুরে থাকিতে আপন সকল বিদ্যা রজীব খাঁকে দিয়া যান। রজীব খাঁ সংগীত ছাড়াও শ্রদ্ধার সহিত যোগশাস্ত্র পুরাণাদি, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাছে শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত যেসব গীতিনাট্য (opera) আছে তাহা অভিনয় করাইয়া দেখিলে লোকে ইঁহার গীতশক্তি বুঝিতে পারিবেন। ইনি ভক্তদের কাছে বৈষ্ণবসাহিত্য শিখিয়া ব্রজভাষায় ভালো কাব্যও রচনা করেন।

হয়দর অলী ছিলেন ভিলসার জমিদার। তিনি রজীব খাঁকে পুত্রবৎ স্নেহে রাখেন। কিছুকাল পরে রজীব খাঁ কাশীতে আসিয়া সাদিক অলী ও নিসার অলীর কাছে আরও কিছু কলারহস্য শিখিয়া

লইলেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সম্ভ্রান্ত মুন্সীজীর কাছে রহিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তারাপ্রসাদ ঘোষ, রাজা তুনী শীল, যাদবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সঙ্গেও রজীর খাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিল। রজীর খাঁ আট বৎসর এ দেশে থাকিয়া বাংলা বলিতে পারিতেন। পেশাদারী কলাবতদের সহজে তিনি কিছু দিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে অহংকারী বলিত। বড় বড় বৈঠকে তিনি স্বরসিংগার বা বীণা বাজাইতেন। একবার গোবরডাঙায় জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায়ের বৈঠকে এক আসনে ছয় ঘণ্টা চাঁদনী-কেদারা রাগ তিনি শুনাইয়াছিলেন। যিনি সেই কলা-আলাপ শুনিয়াছেন তিনি কখনও তাহা ভুলিবেন না।

রজীর খাঁ কর্ণাটী বা দক্ষিণী বীণরীতিও জানিতেন। তারাপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তিনি রুদ্রবীণা শেখান। তাহার পর রামপুর হইতে ডাক আসিলে ইনি সেখানে যান। নবাব হামিদ অলী ইঁহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন।

মৈহরের বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন ও গোয়ালিয়রের দরবারী ওস্তাদ হফীজ অলী খাঁ স্বরোদীয়া রজীর খাঁর শিষ্য। আলাউদ্দীনের বাড়ী পূর্ববঙ্গ ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট শিবপুর গ্রামে। ইঁহারা জাতিতে "নট" অর্থাৎ বাদ্যকর। নটেরা নামে মাত্র মুসলমান। আসলে ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু আচার-বিচারই বেশি। ইঁহাদের মধ্যে গুলমহম্মদ, আফ্‌তাবউদ্দীন প্রভৃতিরা বাউল ভাবের সাধক।

আফ্‌তাবুদ্দীনের ছোট ভাইই হইলেন এই আলাউদ্দীন। ইনি ছিলেন অতি গরীব। কলিকাতায় আসিয়া অতি কষ্টে সংগীত শিক্ষা করিতেছিলেন। রজীর খাঁ কিছুতেই এই দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। তাই আলাউদ্দীন বছরের পর বছর রজীর খাঁর দরবারে ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে যখন রজীর খাঁ রায়পুর গেলেন আলাউদ্দীনও পিছে পিছে গেলেন। সেই অচেনা অজানা স্থানে আলাউদ্দীনের দুঃখের অন্ত ছিল না। বহুকাল পরে রজীর খাঁ প্রসন্ন হইয়া আলাউদ্দীনকে গ্রহণ করিলেন ও আঠার বৎসর তালিম দিলেন। এখন রজীর খাঁর বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধিকারী আলাউদ্দীন। তিনি এখন সর্ববাদ্যবিশারদ। ইঁহার সঙ্গে রজীর খাঁর শিষ্য আর একজনের মাত্র নাম মনে আসে। তিনি বিখ্যাত স্বরোদীয়া হফীজ অলী।

রজীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, রাজা নবাব অলী, রবাবী মহম্মদ অলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ছয় ভাগের ধ্রুপদ স্বরলিপির বহু বস্তুই রজীর খাঁর কাছে পাওয়া। প্রথমে রজীর খাঁ ভাতখণ্ডেকে এইসব স্বরলিপি কিছুতেই দিতে চান নাই। পরে ভাতখণ্ডের সাধনা ও প্রতিভার মহত্ত্ব দেখিয়া রজীর খাঁ প্রসন্ন হইলেন ও অজস্র সম্পদ দিলেন।

ভাতখণ্ডে শোনামাত্রই স্বরলিপি করিতে পারিতেন। এই গুণ তাঁহারই শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরতন-জনকরেরও আছে। একবার লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বৃদ্ধ গুণী খুর্শেদ অলীকে সংগীত-বিদ্যার-মহাপীঠ মরিস কলেজে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয়। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল একশত বৎসর। তিনি আলী শাহের দরবারী। স্বরলিপিতে যে ভাল ভাল সংগীতবস্তু ধরা পড়ে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। খুর্শেদ আলী গাহিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর গোপনে তখনই স্বরলিপি করিয়া চলিয়াছেন। খুর্শেদ অলীর গান শেষ হইতেই তাঁহাকে স্বরলিপি হইতে সেই গান শোনানো হইল। তিনি স্বরলিপির গান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

ধ্রুপদাদি গানের স্থির অংশকে বলে নায়কী। তাহার উপর কলাবিৎ যে আপন কলায় স্বচ্ছন্দ লীলা দেখান তাহা গায়কী। এই গায়কীও যে স্বরলিপিতে বাঁধা যায় তাহা দেখিয়া খুর্শেদ অলী বলিলেন, "একী ভূতের কাণ্ড! এরা মানুষ না ভূত!"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চতুর্থ ভাগে যাঁহাদের কাছে তাঁহারা সব বস্তু পাইয়াছেন এমন বহু ওস্তাদের নাম করিয়াছেন (পৃ ৬)। তাঁহাদের মধ্যে তানসেনের পুত্রধারার শেষ গুণী মহম্মদ অলী খাঁ (বাসিত খাঁর পুত্র) এবং কন্যাধারার এই রজীব অলীকে আপন গুরু বলিয়াই ভাতখণ্ডে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও বহু মুসলমান গুণীদের নাম এই গ্রন্থে আছে। যথা— রামপুর পতি হামিদ অলী খাঁ, সাহেবজাদা সআদত অলী খাঁ, খাঁ সাহেব মুহম্মদ অলী, বাসিত খাঁ রায়পুরী, উজীর খাঁ রায়পুরী, অমীর খাঁ রায়পুরী, মনরংগ পরিবারের মুহম্মদ অলী খাঁ (কবি রালী, জয়পুরী), বৈরাম খাঁর শিষ্য হায়দর আলী খাঁ, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, রংগেলী পরিবারের বরোদার অমীর খাঁ (জলতরঙ্গী)। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়রের পীর বক্স, নথন খাঁ, বোম্বাইয়ের আবদুল্লা খাঁ, মিরাজ প্রভৃতি স্থানের বহু হিন্দু ওস্তাদের নামও আছে। মুসলমানদের পক্ষে যদিও সংগীতসেবা নিষিদ্ধ তবু সংগীতের বড় বড় সাধক প্রায় সবই মুসলমান।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও রাজা নবাব অলীর গুরু এবং তানসেন-বিলাসখাঁর বংশধর মহম্মদ অলী খাঁ বিশ বৎসর পূর্বেও জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের বংশে সবাই রবাবে প্রবীণ।

জাফর খাঁর সুরসিংগারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব যন্ত্রের শেষ মহাগুণী ছিলেন ছম্মন সাহেব, রায়পুরের নবাব সয়াদত অলী খাঁ। এখনকার দিনে বাংলায় শুধু আলাউদ্দীন ও বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এই আসল সুরসিংগার শুনিয়াছেন এবং আপন জীবনে তাহা রাখিয়াছেন।

ন্যামত খাঁ ও বাদশা মহম্মদ শাহ রংগীলীর রচিত বহু খেয়ালের স্বরলিপিই ভাতখণ্ডের গ্রন্থে মেলে। কিন্তু তাঁহাদের রচিত বহু ধ্রুপদ ধামার ঘরানার বাহিরে এখনও যায় নাই। ন্যামত খাঁ আপন সন্তানদের ধ্রুপদ ও আলাপচারী শিখাইলেও তাহা তাঁহাদের দরবারে গাহিতে দিতেন না। সেই বংশীয় মহম্মদ দবীর খাঁর কাছেও এই সব খবর পাওয়া যায়।

তানসেনী ঘরানার কলাবতদের অর্থ ও স্নেহের বিষয়ে উদারতার সীমা নাই। কিন্তু সংগীতের বিষয়ে তাঁহাদের কৃপণ মনোবৃত্তির প্রশংসা করা যায় না। তবে তাঁহাদের মধ্যেও তানসেনের কন্যাবংশীয় নির্মলশাহের উদারতা বিস্ময়কর। ইঁহার পূর্বে ঘরানার কোনো "খাস" বস্তু বাহিরে যাইতে পারে নাই। ইঁহার ধ্রুপদী শিষ্যধারাতে ছিলেন মহনীয়কীর্তি মুসরুরফ খাঁ। এই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ধ্রুপদী উদয়পুরের আলাবংদে খাঁ ও তাঁহার পুত্র নসীরুদ্দীনও নির্মলশাহের শিষ্যধারাতে। ১৯২৪ সালের লক্ষ্ণৌর সংগীত-মহাসম্মেলনে বাপ-বেটা দুইই উপস্থিত হন। ইঁহারা আলাপে সকলকে দুই প্রহর পর্যন্ত স্তব্ধ রাখিয়াছিলেন। ছম্মন সাহেব, ভাতখণ্ডে ও রাজা নবাব অলীর উদ্যোগেই এই মহাসম্মেলন হয়। খেয়ালী শকর মসকিন খাঁও নির্মলশাহের শিষ্য। গত শতাব্দীর বীণাগুরু বন্দেআলী খাঁ ও স্বরোদীয়া মুরাদ খাঁ এবং হফীজ অলী নির্মলশাহেরই খেয়ালীশিষ্য পরম্পরায়। সেতারী ইমদাদ ও তাঁহার পুত্র ইনায়ত খাঁও এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত। হয়তো নির্মলশাহ পুত্রহীন ছিলেন, বলিয়াই এতটা উদার ছিলেন।

নির্মলশাহের ভাইপো উমরাও খাঁও বহু যোগ্য যোগ্য শিষ্য করিয়াছিলেন। উজীর কুতবুদ্দৌলা এবং গোলাম মহম্মদ খাঁর নাম বহুখ্যাত। খুব বড় একপ্রকার সেতারেই নির্মলশাহ কুতুবুদ্দৌলাকে বীণার আলাপ শেখান। তাহাই পরে সুরবাহার নামে খ্যাত হয়। সুরবাহারে সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, ইমদাদ খাঁ, ইনায়েত খাঁ একেবারে চূড়ান্ত কীর্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ বহুদিন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে ছিলেন।

উমরাও খাঁর দুই পুত্র, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁ। অমীর খাঁর শিষ্য কাশীর মিঠাইলাল ও মির্জাপুরের পণ্ডিত জোখুরাম। আমরা বাল্যকালে কাশীতে বড় বড় মজলিসে মিঠাইলালের বাদ্য শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোককে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়াছি। বড়কু মিঞা বা আলী মহম্মদও মিঠাইলালের বীণাগুরু ছিলেন। আমীর খাঁর পুত্র রজীব খাঁ আরও খ্যাতি লাভ করেন। ইহার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। রজীব খাঁর শিষ্য রায়পুরের নবাব ও রাজা নবাবালী। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে— যিনি সর্বভারতে ভারতীয় সংগীতকে বিস্তৃত করিলেন তিনিও রজীয় খাঁর শিষ্য।

জাফর খাঁ বহুদিন রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে ছিলেন। মহারাজা ছিলেন জাফর খাঁর শিষ্য। জাফরের ভাই প্যার খাঁ রেওয়াতে মাঝে মাঝে থাকিলেও বেশি থাকিতেন বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরজীর কাছে। ইনি বহু নূতন ধ্রুপদ রচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কথক গায়ক ভক্তাবরজী, শিব নারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি ধ্রুপদগায়কদের অগ্রগণ্য। কলিকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারায়ণ মিশ্রেরই শিষ্য। রাধিকা গোঁসাই ছিলেন গুরুপ্রসাদের শিষ্য। প্যার খাঁ বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরকে আপন ধ্রুপদবিদ্যার সকল সম্পদ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন।

গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদীজী তাঁহার 'রবাবী খানদান' প্রবন্ধে লেখেন, "আমাদের চৈতী, কজলী, লাবণী, ঝুমর, ফাগ প্রভৃতি রাগ শুনিলেই হৃদয়মন তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়। এই সব রাগে আমাদের সমস্ত হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরিয়া ওঠে ও সমগ্র আত্মা উদাস হইয়া রসবন্যায় বহিয়া যায়। দেশের ভূমি এবং দেশীয় প্রকৃতির উপরই এই সব রাগ প্রতিষ্ঠিত। গুণীদের মস্তিষ্ক হইতে ইহাদের উদ্ভব নহে। ইহারা দেশের মাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ শাস্ত্র এইসব দেশজাত বস্তুদের দেশি বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।"[১] তিনি আরও বলেন, ভৈরব, শ্রী, মালকোষ, বসন্ত প্রভৃতি সাত আটটি বুনিয়াদী রাগরাগিণীর যোগবিয়োগেই বাকি সব রাগরাগিণীর উৎপত্তি, বিশেষত মুসলমান যুগের রাগরাগিণীদের। কাফী, পিলু, জিল্‌ফ্‌ সাজগিরী, তিলককামোদ, জংলা, জয়জয়ন্তী, গারা, ঝিঁঝোটী, বিহারী, সিংদূরা প্রভৃতি রাগের এই রূপেই উদ্ভব হইয়াছে।[২]

কাফী রাগের ধুনের সঙ্গে দেশি হোলির ধুন হুবহু মেলে। আমীর খুসরুই ইহাকে রাগের রূপ দিলেন। মহম্মদ শাহ রংগীলীর সময় তাহা বড় বড় রাগের সমান মান্য হইয়া উঠিল। খুসরুর সৃষ্ট ইমন রাগে আজ বীণকরেরা মুগ্ধ, কত ধ্রুপদ ইমনে রচিত। এমন করিয়াই জয়জয়ন্তী ও জিল্‌ফ্‌ কত উচ্চেই না উঠিল। এখন জয়জয়ন্তী কানাড়ার পাশে এবং জিল্‌ফ্‌ তোড়ি বা আশাবরীর পংক্তিতে আসন লইয়াছে।[৩]

---

১ নয়া হিন্দী জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ ৫২। ২ ঐ ৩ ঐ, পৃ ৫৩

দেশি ধুনের বুনিয়াদেই আমাদের অধিকাংশ রাগের সৃষ্টি। প্যার খাঁ, উমরাও খাঁ, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁর আমলে এই বিদ্যা তানসেনের পরিবারের বাহিরেও ছড়াইতে লাগিল।[৪]

তিলককামোদ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের এক বিখ্যাত ও অতিসুন্দর রাগ। ইহা কোন পুরাতন শাস্ত্রীয় রাগ নহে। রবাবী ওস্তাদ প্যার খাঁ এই রাগের প্রবর্তক। তানসেনের পরিবারের রক্তের মধ্যে সাধনার জন্য একটা ব্যাকুলতা ও তাপসজনোচিত ভাব আছে। প্যার খাঁ শেষরাত্রিতে উঠিয়া নির্জনে আপন ধ্যানের জন্য অরণ্য ও গ্রামের দিকে চলিয়া যাইতেন। একদিন পর্বতের তলদেশে এক আভীর-পল্লীর পাশ দিয়া প্যার খাঁ চলিয়াছেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, গ্রামকন্যারা জাঁতা পিশিতে পিশিতে গান করিতেছে।

জাঁতা পেশাকারিণীদের গানের সুর প্যার খাঁকে মুগ্ধ করিল। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এই গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন ঐ গ্রাম্যগানে বেহাগ, কামোদ এবং সোরট বা দেশের মত তিনটি পুরাতন শাস্ত্রীয় রাগের অপূর্ব সংমিশ্রণ— "ইস দেহাতী ধুনমেঁ বিহাগ কামোদ ঔর সোরট য়া দেশ ঐসে তীন পুরাণে শাস্ত্রী রাগোঁকা বড়ী সুন্দর মিলাবট হৈ"।

তিনি সুরটি গুন গুন করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন এবং কয়দিনের সাধনায় সুরটিকে আপন যন্ত্রে তুলিয়া দরবারে শুনাইলেন। সকলেরই যৎপরোনাস্তি ভাল লাগিল। সকলে এই নয়া রাগের নাম জানিতে চাহিলে ইনি সারা কাহিনীটি শুনাইয়া দিলেন। এই সুরের নাম তখন রাখা হইল তিলককামোদ। সংগীতের জগতে ইহা অমর হইয়া রহিল। প্যার খাঁ ইহাতে বিস্তর ধ্রুপদ করিয়াছেন। পরে অবশ্য ইহাতে খেয়াল ঠুমরীও অনেক রচিত হইয়াছে।[৫]

জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর ছোটভাই বাসিত খাঁ আরও নামকরা গুণী। ইঁহার মত সংগীত-শাস্ত্রজ্ঞ খুব কমই হইয়াছেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেরই কাছাকাছি বাসিত খাঁর জন্ম। ইঁহার পিতা ছজ্জু খাঁ, পিতৃব্য জ্ঞান খাঁ; জ্ঞান খাঁ ছিলেন নিঃসন্তান। জ্ঞান খাঁ বাসিতকেই পুত্রবৎ পালন করেন। জ্ঞান খাঁ ছিলেন যোগাচারী ফকীর। তিনি তাঁহার সর্বশক্তিতে বাসিতকে ফুটাইয়া তুলিলেন। সংযমী বাসিত খাঁ যোগ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া একশত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। জ্ঞান খাঁ ইঁহাকে বার বৎসর পর্যন্ত শুধু সপ্তস্বরসাধনা করান। বাসিত অধীর হইলে জ্ঞান খাঁ কহিলেন, "হায় হায়! দাদা, ধৈর্য হারাইলে! আর কিছু সবুর করিলে বৈজু বাওরা প্রভৃতির মত নায়ক বনিতে পারিতে। তবু তোমার যাহা ভিত্তি হইয়াছে ইহার উপরে সাধনা করিলে এই যুগেও তোমার স্থান অতুলনীয় হইবে।" বাসিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিখিয়া হিন্দু ও মুসলমানী শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। রবাবে ইঁহার সমতুল্য কেহ আর তখন ছিলেন না।

একবার লখনউ নবাবের দরবারে এক পাখোয়াজী সাধু আসিয়া সব গুণীদের সঙ্গে বাদ্যে পাল্লা দিতে বসিলেন। ফলমূলমাত্রাহারী সাধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরাসনে বসিয়া বাদ্যে একে একে সকলকে হারাইলেন। কিন্তু যোগনিষ্ঠ বাসিত খাঁ তাঁহার রবাবে এমন এক কলাকৌশল করিলেন যে সাধু হারিয়া গেলেন। সাধু কী একটা অভিচার করিয়া কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। বাসিত খাঁর বাজাইবার ডান হাতখানি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গেল। সাধুকে কোথাও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পরে বাসিত খাঁ আর রবাব বাজাইতে পারিতেন না, শুধু রবাবের শিক্ষা দিতেন।

৪ নয়া হিন্দ, জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ ৫৩-৫৪ ৫ ঐ, পৃ ৫০-৫২

লখনউর নবাব ওয়াজেদ অলী খাঁ বাসিতের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। একবার বাসিতের 'দেশ' রাগ শুনিয়া তিনি আপন রত্নহার বাসিতকে দান করেন। নবাব ওয়াজেদ অলী কলিকাতায় নির্বাসিত হইলে ইংরাজের অনুমতিক্রমে বাসিতকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

বাসিত খাঁ বছর-দুই কলিকাতায় ছিলেন। তাহার মধ্যেই তিনি স্বরোদীয়া নিয়ামত উল্লা খাঁ ও তাঁহার পুত্র করামত উল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁকে অত্যল্প কালের মধ্যে প্রবীণ বানাইয়া তুলিলেন। হরকুমার ঠাকুরকেও বাসিত খাঁ রীতিমত শিক্ষা দেন। বাসিত খাঁ ছয়মাস হরকুমার ঠাকুরকে স্বরসাধনা করাইলে হরকুমার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসিত খাঁ বলিলেন, 'বাবা, ছয়মাসেই ধৈর্যচ্যুত হইলে? আমি বার বছর শুধু স্বরসাধনাই করিয়াছি।' কিন্তু আরো ছয়মাসেই তিনি হরকুমার ঠাকুরকে বাছাবাছা সব রাগে শিক্ষা দিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, মৈহরের আলাউদ্দীন বার বৎসর এবং ফৈয়াজ খাঁ চৌদ্দ বৎসর শুধু স্বর-সাধনাই করেন।

দুই বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া বাসিত খাঁ গয়ার নিকটে টিকারীর রাজার আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। রাজাকে তিনি কলাবৎ করিয়া তুলিলেন। গয়ার অনেক পাণ্ডাও বাসিতের সাকরেদ হইলেন। সকলে তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মনে করিত। একবার অনাবৃষ্টি হইলে বাসিত খাঁ সাতদিন ধ্যান করিয়া মিঞা-মল্লার গাহিয়া নাকি বৃষ্টি করান। বাসিত খাঁ বড় একটা দরবারের ধার ধারিতেন না। ভক্তিতে ও ভাবাবেশে তিনি নানা মন্দিরে বসিয়া ভজন গাহিতেন। গয়ার বিখ্যাত এসরাজী হনুমানদাস, ঢেঁড়ীজী, সোমীজী প্রভৃতি বাসিতেরই চেলা। পিণ্ডদান কালে পাণ্ডারা যাত্রীদের দানের একটা অংশ তখন হইতে কলাবিদ্যার জন্য রাখিতেন। তাহার নাম 'তানসেনী ভাগ'। বাসিত খাঁকে এই দানের অংশ লইতে হইত। দশ-বারো বছর আগেও এই নিয়ম চলিত ছিল, এখনকার কথা বলিতে পারি না। ১৮৮৭ সালে শত বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বাসিত খাঁ যোগযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহার অন্তিম সৎকারের কাজে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ও ব্রাহ্মণই বেশি ছিলেন।

জাফর খাঁ ও বাসিত খাঁর ভাই জ্ঞান খাঁ আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি আপন ভাগিনেয় বাহাদুর সেনকে আপন সকল বিদ্যা দিয়া যান।

জাফর খাঁর চারি পুত্র। কাজম অলী খাঁ, সাদিক অলী খাঁ, অহমেদ অলী খাঁ এবং নিসার অলী খাঁ। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র পূর্বপুরুষদের নাম রীতিমত রক্ষা করেন। সাদিক অলী সংস্কৃতে এমন কৃতী ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিত। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ ও গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হইতেন।

বাহাদুর সেনের হাতে অদ্ভুত মিষ্টতা ছিল। তিনি যে ভাবে যে রাগ বাজাইতেন, তাহাই মধুর হইত। সাদিক ছিলেন সংগীতশাস্ত্রের সর্বকলার ধ্যানী গুরু। কাজম অলী শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে চলিতেন। বাহাদুর সেন নব নব পথে আপন মনীষার দ্বারা চালিত হইতেন ও সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

একবার এক সভায় কাজম অলী রবাব বাজাইতেছেন, বাহাদুর স্বরশৃঙ্গার বাজাইতেছেন। তখন কাজম বেহাগের স্থায়ী ও অন্তরা পূর্ণ করিয়া সঞ্চারীতে প্রবেশ করিবার সময় এক অপরূপ নূতন পথে চলিলেন। মনে হইল সারা সভায় একটা নূতন আলোকের অমৃত বর্ষণ হইল। সকলে ধন্য ধন্য করিল।

সাদিক অলী খাঁ কোথাও চাকুরী করিতে পারিতেন না। যথার্থ কলাবিতের মত তিনি আপন

ভাবে চলিতেন। তাই তিনি দীর্ঘকাল কোথাও টিকিতে পারেন নাই। তিনি যে-কোনো রাগ বাজাইতে বাজাইতে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানা রাগের অংশ যুক্ত করিয়া আবার আপন আদিরাগে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। একবার তিনি জয়পুর দরবারে বহু গুণীর মধ্যে দরবারী কানাড়ায় কোমল রেখাব লাগাইয়া বাজাইলেন। সকল গুণী বিস্মিত হইলেন। এমন অপূর্ব এই বাজনা শুনা গেল যে সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাগরাগিণীর উপর এমন দখল ক্বচিৎই দেখা যায়।

বাহাদুর সেন যে সব গৎ ও তেলানা (তরানা) বাজাইয়া গিয়াছেন, এখন সারা ভারতে কলারসিকেরা তাহা সেতারে ও স্বরোদে বাজান। ঘরানা-গত ও সুকৌশল সব খানদানী তেলেনার অধিকাংশই বাহাদুর সেনের রচিত। তোড়ী রাগে ইনি এক নূতন পথ প্রবর্তন করেন। তাহা বাহাদুরী তোড়ী নামে কলাবৎদের কাছে খ্যাত।

তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁও তোড়ির এক অভিনব পন্থা প্রবর্তন করেন। তাহারই নাম পরে হইল বিলাসখানী তোড়ী। ইহাতে ভৈরবীরই সব স্বর লাগে, কিন্তু গান্ধার ও ধৈবতের এমন একটু লীলা আছে যাহাতে ঠিক তোড়ীর রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। ভৈরবীর সকল স্বর সত্ত্বেও ইহাতেও মূলগত বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। বিলাস খাঁ সাধনাতেও সাধু ছিলেন। তাঁর রাগিণীতে শান্তি ও করুণার রস ভরিয়া ওঠে। তানসেনের ঘরানাতে বিলাস খানের এই প্রভাব চিরদিন সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

তানসেনের ঘরানাতে প্যার খাঁর তিলককামোদের কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই সব শুনিয়া কি এই কথা বলা চলে যে কলাবতেরা শাস্ত্রের অচলায়তনেরই উপাসক? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ প্রতিভাশালী তাঁহারা যুগে যুগে আপন আপন প্রতিভানুযায়ী নূতন নূতন অপূর্ব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত কলায় মুসলমান সাধকদের দানের তুলনা হয় না। তাঁহারা দারুণ দুর্দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সঙ্গীতবিদ্যাকে শুধু বাঁচাইয়া রাখেন নাই, ইহাকে দিন-দিন নব-নব ঐশ্বর্যে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। আলাউদ্দীন খিলজী, আকবর, জৌনপুরের সুলতান তুর্কী, মুহম্মদ শাহ রংগীলী, নবাব কল্‌বে অলী, নবাব রজিদ অলী প্রভৃতি বাদশা নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না। গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা মানতোমর ও রেওয়ার রাজা রাজারামের কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

মানতোমর ও আকবরের উৎসাহে যেমন লোকগীত হইতে ধ্রুপদ মার্গ সংগীতের পদ লাভ করিল, তেমনি সুলতান শর্কী ও মহম্মদ শাহের উৎসাহে লোকগীত হইতে খেয়ালের স্থানও মার্গসংগীতের মধ্যে উন্নীত হইল। সুলতান শর্কী নূতন নূতন রাগও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নূতন সৃষ্ট 'জৌনপুরী' এখন সকল গায়কদেরই বন্দনীয়। যদিও আশাবরী হইতেই ইহার সৃষ্টি তবু আশাবরী আজ ইহার কাছে এমন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে যে, এখন অনেকে পুরানো আশাবরীকে ভুলিয়া গিয়া জৌনপুরীকেই আশাবরী মনে করেন। পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও জৌনপুরীকেই আশাবরী বলিয়া মানিয়াছেন। সুলতান শর্কীর নূতন সৃষ্ট জৌনপুরীর প্রভাবে আসল আশাবরীর কথা এখন সকলেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন।

একাধিক রাগ মিলাইয়া নবরাগ সৃষ্টির কাজে যে শুধু মুসলমান ওস্তাদেরাই হাত দিয়াছেন তাহা নহে, হিন্দু ঘরানাতেও এই কৃতিত্ব দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কাশীতে একবার মহারাষ্ট্রীয় কথক রামচন্দ্র বুৱার গান শুনি। তাহাতে মালগুঞ্জি নামে একটি অপূর্ব রাগ শোনা গেল। কাশীর সেনিয়া

ঘরানার ওস্তাদেরা সেই রাগটির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, বুৱা পরিবারে এই রাগটি প্রায় একশ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। বাগেশ্রী ও জয়জয়ন্তীর যোগে ইহার সৃষ্টি। বালকৃষ্ণ বুৱার অপূর্ব কণ্ঠে এই রাগটি প্রচারিত হয়। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ বিষ্ণু দিগম্বরের গুরু।

উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের গায়কের মধ্যে একটি মহা ব্যবধান পড়িয়া আছে। এই ব্যবধানটি সরাইয়া নূতন পথ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ওস্তাদ আবদুল করীম খাঁ। এখনও তাঁহার শিষ্যা হীরাবাঈ ও রোশনারা বেগমের গানে তার কিছু পরিচয় মিলে। কোল্হাপুরের আল্লাদিয়া খাঁ প্রথমে ছিলেন ধ্রুপদী, পরে হন খেয়ালী। তাই তিনি খেয়ালের মধ্যেও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আলাদিয়া খাঁর সঙ্গে সঙ্গে নাথন খাঁ ও ফৈজ মহম্মদ খাঁর কথা মনে আসে। এই তিনের উপরে কিছুদিন পূর্বে মহাগুরু ছিলেন আগরা দরবারে— গোলাম আব্বাস খাঁ। আলাদিয়ার নাম ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার শিষ্যা কেশর বাঈ।

য়ুরোপীয় মধ্যযুগের শেষভাগে যেমন গ্রীক পণ্ডিতেরা ঘর ছাড়া হইয়া সারা য়ুরোপে নবযুগের উদয় করান তেমনি দিল্লীর বাদশাহী ভাঙিয়া গেলে তানসেনী-ঘরানার ওস্তাদেরা যে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরে তাঁহারা যে সব রাজ-রাজড়ার আশ্রয় পাইলেন তাঁহারা বিলাতী শিক্ষার মোহে এমন অভিভূত হইলেন যে, রাজাদের আশ্রয়েও এই সব গুণী আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এখন নাকি রাজ-রাজড়ার যুগের অবসান হইয়া গণযুগ বা ডেমোক্রেসির যুগের আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইয়া থাকিলে গণমণ্ডলীরই উপর এই সব পুরাতন মহনীয় কলা-সংরক্ষকের দায়িত্ব আসিয়া বর্তিয়াছে। বীণাগুণী সাদিক অলী বর্তমানকালে রামপুরের দরবারে বীণকার। কিন্তু তিনি কি সেখানে সুখে আছেন? মনে হয় যে-কোনো গুণগ্রাহী মণ্ডলী ডাক দিলে তিনি আনন্দে সেখানে যান।

এইসব ওস্তাদ ভারতের কোথায় না সঙ্গীতবিদ্যাকে ছড়াইয়াছেন? তানসেনী পুত্রধারায় বাসিত খাঁর পুত্র অলী মুহম্মদ খাঁ বা বড় মিঞা নেপালে গিয়া সেখানে সকল গুণীর গুরু হইয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহার পূর্বেও নেপাল দরবারে অনেক গুণী ছিলেন। সেতারে এবং খেয়াল গানে ছিলেন রামসেবক মিশ্র, ধ্রুপদ গানে ছিলেন তাজ খাঁ, স্বরোদ বাদ্যে ছিলেন ন্যামত উল্লা খাঁ ও মুরাদ অলী খাঁ। রামসেবক মিশ্রেরই পুত্র পশুপতি ছিলেন বীণকার, শিব ছিলেন ধ্রুপদী ও খেয়ালী। তালে ও লয়ে শিব-পশুপতির দোসর সারা দেশে ছিল না। ন্যামতউল্লা বড়কু মিঞার চেলা বনিলেন। তাঁহার পুত্র করামতউল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ স্বরোদ যন্ত্রে অতুলনীয় গুণী হইয়া উঠিলেন। নেপালের গুণী মুরাদ অলী খাঁর স্বরোদ যন্ত্রে বীণারও কিছু অঙ্গ ছিল। তাহার হেতু ছিল এই যে, তিনি সুরবাহারে গুলাব মহম্মদের কাছে, বীণায় ওয়াজীর খাঁর কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্রবাদক হফীজ অলী খাঁ এই মুরাদ অলী খাঁর শিষ্য। শিব-পশুপতির শিক্ষা প্রথমে তাঁহার পিতারই কাছে, সেই পিতাও সেতার বাদ্যে বড়কু মিঞারই চেলা। মুরাদ অলীর চেলা আবদুল্লা খাঁ ও তাঁহার পুত্র অমীর খাঁ স্বরোদীয়া কলিকাতার বহু গুণীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বৃদ্ধকালে শরীর অশক্ত হইয়া পড়িলে বড়কু মিঞা নেপাল ছাড়িয়া কাশীতে আসিলেন। সেখানে তাঁহার ছোট ভাই (জ্যাঠতুত) নিস্‌সার অলী খাঁ কাশীর দরবারে গুণী ছিলেন। তখন কাশীতে বহু গুণীর সমাবেশ। সেখানে ধ্রুপদী ছিলেন অল্লাবখ্‌শ্। অল্লাবখ্‌শেরই শিষ্য অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কাশীতে তখন ধ্রুপদী রসুল বখ্‌শ ও দৌলত খাঁ বিদ্যমান, মহেশবাবু বীণকার, চিন্তামণি বাপুলী ভৈরব বাজপেয়ী প্রভৃতি সব গুণী ছিলেন। মিঠাইলালের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

জলন্ধরের সৈয়দ মীর সাহেবও বড়কু মিঞার কাছে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। বাংলা দেশের শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তারাপ্রসাদ ঘোষও বড়কু মিঞার শিষ্য। তারাপ্রসাদ রজীর খাঁর কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছেন সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তারাপ্রসাদের পিতামহ বিখ্যাত কাশীপ্রসাদ ঘোষ। ইঁহাদের এখানেই সেতারী ইমদাদ খাঁ ও খেয়ালী কালে খাঁ ও ধ্রুপদী দৌলত খাঁ ছিলেন। কালে খাঁর পুত্রই গুণী গুলাব অলী। বড়কু মিঞা বড়ই উদার মানুষ ছিলেন। সেজন্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন। অর্থ ও বিদ্যা দুই তিনি সমান ভাবে সকলকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হিন্দুমুসলমান বলিয়া কোনো ভেদবুদ্ধি ছিল না। বড়কু মিঞা বা অলী মুহম্মদ খাঁর পরে তাঁহার ছোট ভাই মুহম্মদ অলী খাঁই প্রধান হইলেন। ইঁহার জেঠা জাফর খাঁর পুত্র কাজিম অলী রবাবী-বংশে জন্মিলেও বীণেরও বড় গুণী ছিলেন। তাই তাঁহার পুত্র কাসিম অলী বীণ-রবাব দুই যন্ত্রেই সমান গুণী ছিলেন। অদ্বিতীয় বীণকার রজীর অলী ইঁহারই ভাগিনেয়। কাসিম অলী পাখোয়াজেও প্রবীণ ছিলেন।

গত শতাব্দীর বিখ্যাত বীণকার বন্দেআলী খাঁ ও মুশর্‌রফ খাঁ তানসেন পরিবারের না হইলেও তাঁহাদের নাম একটুও কম নহে। তাঁহারা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় উমরাও খাঁর শিষ্য। রামপুরের বর্তমান ওস্তাদ শাদক অলী মুশর্‌রফেরই পুত্র। ইঁহাদের আদিপুরুষ নাকি হরিদাস স্বামী।

লক্ষ্ণৌর নবাব রাজেদ অলী খাঁর দরবার নষ্ট হইলে বাসিত খাঁ গেলেন গয়ায়, কাসিম অলী খাঁ গেলেন ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে। তাঁহার দরবারে পূর্বেও অপূর্ব কলাবিৎ যদু-ভট্ট ছিলেন। যদুভট্ট বৃদ্ধ বলিয়া কাসিম তাঁহাকে রবাব শেখান নাই। কিন্তু যদুভট্ট তাহা শুনিয়াই শিখিয়া ফেলেন। ত্রিপুরা ছাড়িয়া কাসিম অলী খাঁ ভাওয়ালের রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে যান। ঢাকাতেও কাসিম অলী কিছুকাল ছিলেন। ঢাকায় তবলাবাদক প্রসন্নবাবুর বাজনা শুনিয়া কাসিম অলী খাঁ বিশেষ প্রশংসা করেন।

তানসেনী ধারার সঙ্গে পরে বহু গায়কীয় ধারার মিলন ঘটিয়াছে। বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁর পূর্ব-পুরুষ ছিলেন হিন্দু। অলখদাস ও মলখদাস এই ধারার হিন্দু গায়ক। পরে এই ধারায় এক গুরু [তা]নসেনী ধারা শিক্ষা করেন ও তানসেনী বংশের কন্যা বিবাহ করেন। মহম্মদ শাহ রংগীলীর দরবারে এই বংশীয়দেরও প্রতিষ্ঠা ছিল।

পাতিয়ালার ফতে অলী খাঁই একটি গায়কধারার প্রবর্তন করেন। সেই ধারাতে দেখা যায় ওস্তাদ গোলাম অলী খাঁকে। গোলাম অলীর গুরু ছিলেন তাহার পিতৃব্য কালে খাঁ। এই সঙ্গে মনে আসে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নাম। তাঁহার গানে ভারতীয় ধর্ম ও তপস্যা যেন মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তানসেনী ঘরানার বিষয় আরও অনেক কথা বলিবার আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় বলিয়া এইখানেই ইহা সমাপ্ত করি। পরে সুযোগ হইলে আরও ভাল করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। এই সঙ্গে তানসেনী একটি কুর্শীনামা বা বংশাবলী দেওয়া যাউক।

তানসেন-পুত্রধারা

(তুলনীয় 'নয়া হিন্দ' II, 1947, পৃ ৫৫০-৫৫১)

মুকুন্দরাম বা মকরন্দ পাঁড়ে

রামতনু বা তানসেন—স্ত্রী (প্রেমকুমারী)

সুরত সেন | শরত সেন | তরংগ সেন (তানতরংগ খাঁ) | বিলাস খাঁ | সরস্বতী + মিশ্রী সিং

উদয় সেন | দয়াল সেন

করীম সেন

সুঘর খাঁ | রাগরস খাঁ

হসন খাঁ (সফেদ দের) | মসীত খাঁ—(মসীতখানী বাদ্য-গুরু)

গুলাব খাঁ (সদারঙ্গ-সাগী) | বহাদুর খাঁ

(দটীয়ালীবংশ) ছজ্জু খাঁ | জ্ঞান খাঁ | জীবন খাঁ

জফর খাঁ | প্যাব খাঁ | বাসিত খাঁ | (কন্যা) | বাকর খাঁ | হৈদর খাঁ | বহাদুর খাঁ (বিষ্ণুপুরী)

কাজিম অলী খাঁ | সাদিক অলী খাঁ | অহম্মদ অলী খাঁ | নিসার অলী খাঁ

কাসিম অলী খাঁ | কন্যা (অমীর খাঁ বীণকার পত্নী)

অলী মুহম্মদ খাঁ (বড়কু মিঞা) | মহম্মদ অলী খাঁ | রিয়াসত অলী খাঁ
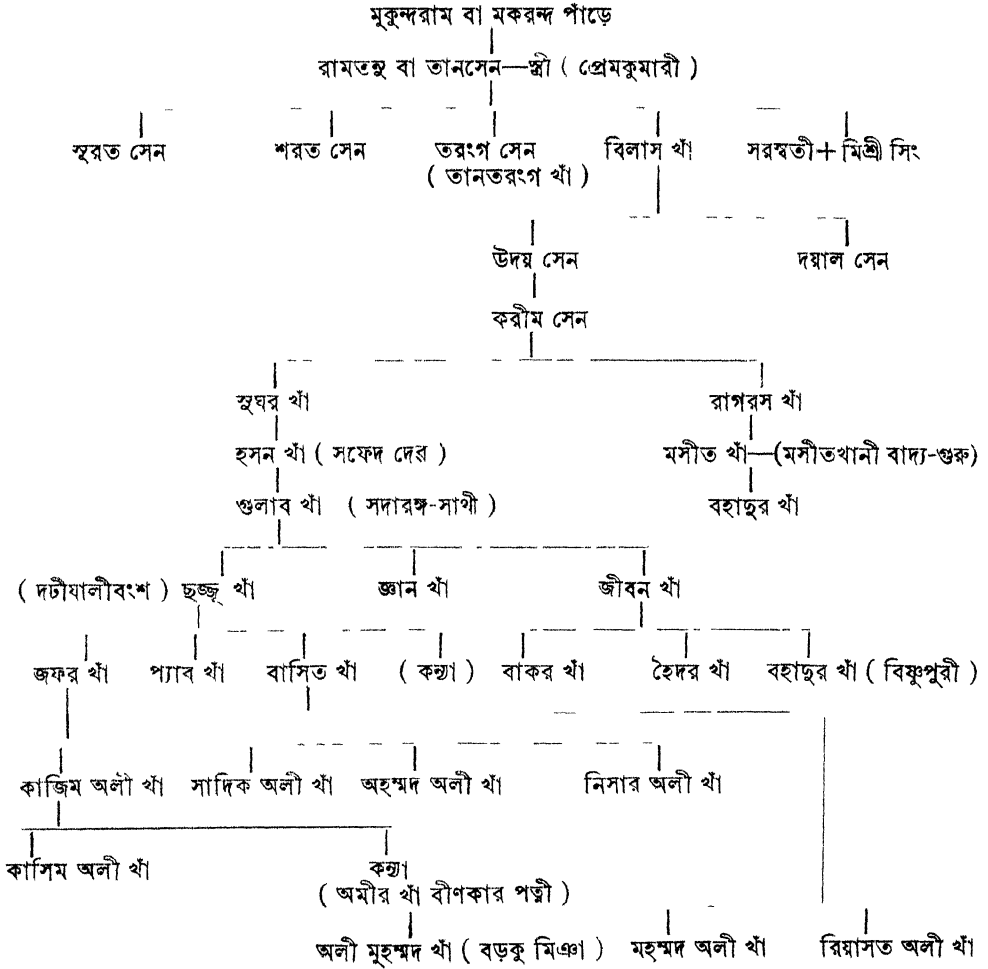
কন্যাধারা

(তুলনীয় 'নয়া হিন্দ'—I, 1949 , পৃ ৫৫৭-৫৫৯)
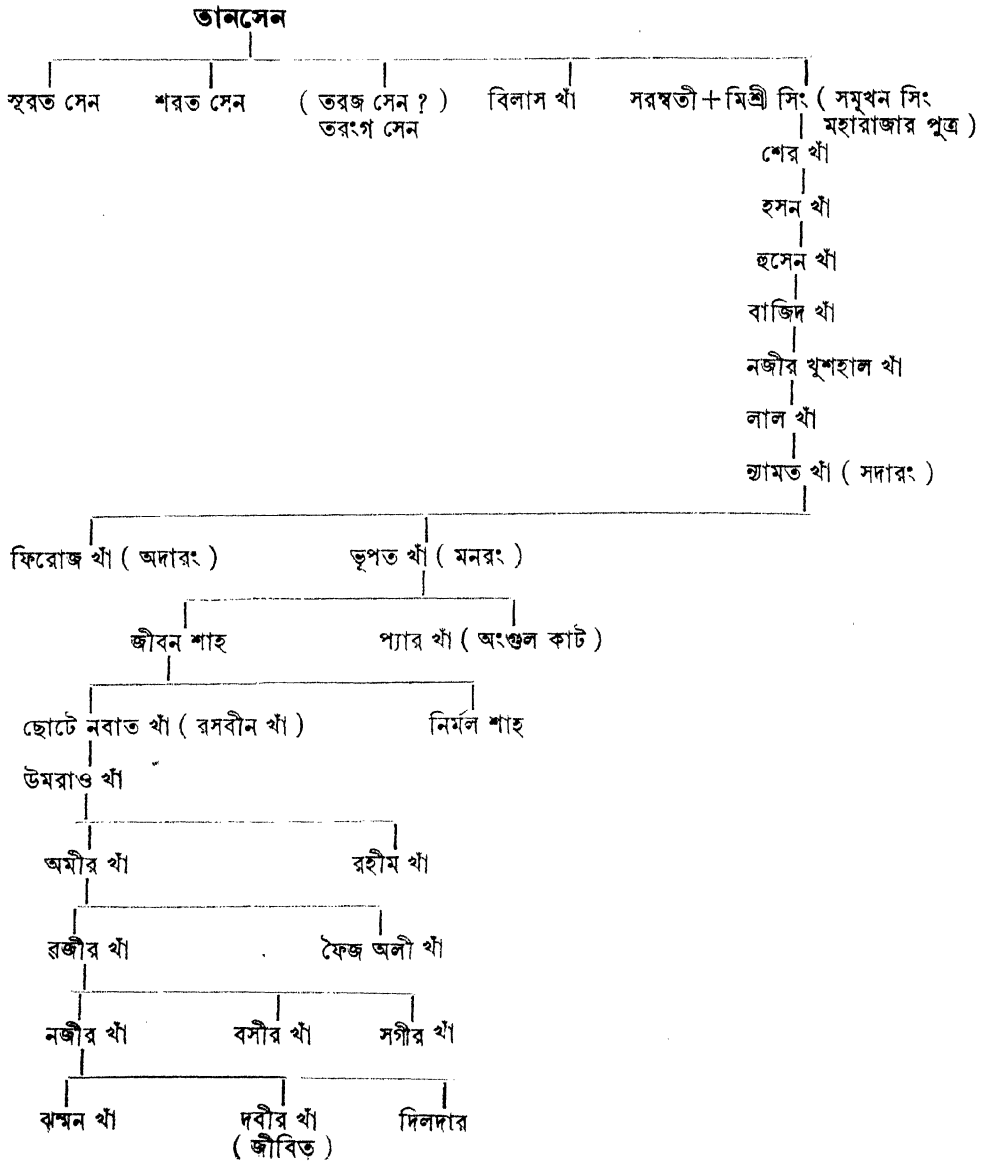
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-সাহিত্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাংলা গদ্যের ও পদ্যের প্রকৃতিতে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। বাংলা পদ্যের মূল এই দেশের মাটিতেই নিহিত ছিল, বাংলা গদ্যের মূলে বিলাতি মাটি। রবীন্দ্রনাথের পদ্যের সহিত হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব কিনা জানি না, তবে এ কথা ঠিক যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের জ্ঞাতিসম্বন্ধ খুব দূরস্থ নয়। চার-পাঁচ শো বছরে বংশধারায় যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার বেশি নয়। আবার আনুকোরা সাহেব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর খুব নূতন জিনিস বটে, ঐ আমরা যাহাকে বলিয়াছি বিলাতি মাটি, কিন্তু সেই বিলাতি মাটিরও বনিয়াদ বাংলা-দেশের মাটি। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের পয়ার সেই দেশি মাটি। ইহাদের পয়ার না পাইলে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশজ কবিত্বপ্রবাহের ধারাকে তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া বলশালী হইয়াছেন, আবার সেই ধারাকেও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা কাব্যপ্রতিভায় কোথাও একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে নাই।

কিন্তু বাংলা গদ্যের ধারা একেবারে স্বয়ম্ভু, হঠাৎ তাহার উদ্ভব, বিলাতি মাটি ভেদ করিয়া তাহার প্রকাশ, সেই কারণেই বোধ করি এখনো বাংলা গদ্য বাঙালির ধাতস্থ হয় নাই। সাধু ভাষা বনাম কথ্য ভাষার যে তর্কটা মাঝে মাঝে এখনো শোনা যায় তার মূলে আছে বিলাতি মাটি ও দেশি মাটির দ্বন্দ্ব। লোকের মুখের ভাষা অর্থাৎ লোকভাষার উপরে বাংলা গদ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ তর্ক এ আকারে দেখা দিত না। বাংলা গদ্য পণ্ডিতের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সংস্কৃত ভাষার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, খাস বিলাতি গদ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন বস্তু যে আদৌ টিকিয়া আছে, পরিত্যক্ত বিলাতি হ্যাট-কোট-নেকটাইয়ের মতো আবর্জনার স্তূপকে বাড়ায় নাই, ইহাই তো বিস্ময়ের। বিলাতি মাটিতে বাঁধানো বেদীর উপরে দেশী ঘাস ও গাছগাছড়া গজাইয়াছে—উপর হইতে বিদেশী বলিয়া ধরা পড়ে না, কিন্তু একটু সতর্কভাবে পা ফেলিলেই শক্ত শান পায়ে বাধে। অনেক সময়ে বাংলা গদ্য বুঝিতে না পারিলে মনে মনে তাহাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লইবা মাত্র সহজবোধ্য হইয়া পড়ে।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংলা গদ্য ইংরাজি গদ্যের অনুকরণে গড়িয়া না উঠিয়া যদি লোকভাষার উপরে গড়িয়া উঠিত, তবে তাহার কি আকার হইত। মনে করা যাক, উইলিয়াম কেরি এ দেশে আসিল না, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল না, বিদ্যাসাগর জজপণ্ডিতি করিতে ত্রিপুরায় চলিয়া গেলেন, তাহা হইলেও কি বর্তমান গদ্যধারা গড়িয়া উঠিত? মনে হয়, না; অন্তত বর্তমান আকারে নয় যে, তাহা তো বটেই। অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিরাট কর্মবহুল সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, কাজের তাগিদে ছোট ছোট গদ্যের ঝরনা বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হইলে সে গদ্য অনেক পরিমাণে দেশের প্রকৃতিস্থ হইত। একটা আশঙ্কা এই ছিল যে, ~~বাংলা~~

গদ্যের বিবর্তনে আমরা আজ যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতাম। এখনো হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে পড়িয়া থাকিতাম, অবশ্য সে বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের পরিজ্ঞাত বঙ্কিমচন্দ্র নন।

গদ্য কর্মবহুল সমাজের ভাষা। বাঙালির সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কর্মবহুল হইয়া উঠিবার আগেই বাংলা গদ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, যদিচ সে গদ্যের মূলেও ছিল কর্মের তাগিদ। কেরির বাইবেল অনুবাদ করিবার আগ্রহ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যগ্রন্থের চাহিদা, রামমোহনের বাদানুবাদের প্রবৃত্তি—এই সব কারণ, বিশেষ ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপকতা, সমাজের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিত যে অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া প্রতিভাবানের কলম যথার্থ দেশজ গদ্যধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু ইহাতেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দেশজ গদ্যের কি মূর্তি হইত? অনেকে বলিবেন, কেন, লোকের কথিত ভাষার উপরে গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা যাহাকে কথ্য ভাষা বলিয়া জানি তাহারই উদ্ভব হইত, কিংবা একমাত্র কথ্য ভাষাই ঘরনী হইত, সপত্নী সাধুভাষাকে লইয়া ঘর করিতে গিয়া অনবরত কলহের সৃষ্টি করিতে হইত না।

কিন্তু কথ্য ভাষা বলিতে কি বুঝি? আলালী ভাষা, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র ভাষা, না বীরবলী ভাষা? এইগুলিই সাহিত্যিক কথ্যভাষার নমুনা রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আলালের ভাষা আজ অপ্রচলিত এবং দুরূহ, তুলনায় সীতার বনবাস অনেক বেশি আধুনিক ও সুবোধ্য। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া কথ্যভাষার আর কোনো লক্ষণ 'ঘরে বাইরে'র ভাষায় ও বীরবলী ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত যে গদ্য কখনো গড়িয়াই উঠে নাই তাহার আদর্শ পাওয়া যাইবে কি করিয়া। তবু তাহার একটা আভাস পাওয়া কঠিন নয়। আমার ধারণা বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির রেঢ়ো টানবিশিষ্ট বাঁকা বাংলায়, অবনীন্দ্রনাথের খেয়ালী রচনায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায় যে গদ্য হইতে পারিত অথচ হয় নাই, তাহারই একটা ছায়া পাওয়া যায়। পাছে কেহ ভুল বোঝেন, তাই বলিয়া রাখি, গদ্যলেখক হিসাবে কাহাকেও ছোট বা বড় করিবার বা কাহারও স্থাননির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একথা বলিতেছি না।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার স্বকীয়তা তাঁহার বেনের মেয়ে উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে সবচেয়ে পরিস্ফুট। তাঁহার কাঞ্চনমালা ও বাল্মীকির জয় প্রথমদিকের রচনা, দুখানিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাল্মীকির জয় ১২৮৭ সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ সালে। দুখানি গ্রন্থের ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনী-বিন্যাসে তো আছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেকনিকে কাটাইয়া উঠিতে তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। বেনের মেয়ে ১৩২৫-২৬ সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যদিচ কাহিনী-বিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রীয় টেকনিক দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল দুইয়ের কথা বলা হইল—বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি হইতে তাঁহার স্বকীয় রীতির বিবর্তনের ইঙ্গিতও দেওয়া হইল, তৎসত্ত্বেও এক জায়গায়, একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়া দুই জনের ভাষায় ঐক্য আছে। দুইজনেরই ভাষা মূলত যুক্তিসিদ্ধ মনের

ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে প্রচুরপরিমাণে কবিত্বরস আছে, তৎসত্ত্বেও তাঁহার মন মূলত নৈয়ায়িকের মন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার চরম উৎকর্ষ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নয়, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় তাঁহার নৈয়ায়িক মন স্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ায়িক মন, যদিচ বাল্মীকির জয় এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদ্বয়ে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মন মূলত কল্পনাপন্থী। প্রচুর কল্পনার জোগান না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক স্টাইল পদচারী পথিক, তাহাকে অনুসরণ কঠিন নহে। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহাকে অনায়াসে অনুসরণ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তায় পৌঁছিয়াছেন, অক্ষয় সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয় নাই। কল্পনার সম্বল না লইয়া যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের কয়জনের সম্বন্ধে এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

এখানে আর একটা জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িল, নৈয়ায়িকের মন আর কল্পনাপন্থীর মন। বাঙালি-সমাজের সমষ্টিগত মনে এই দুইটি উপাদানই আছে, বাঙালি নৈয়ায়িকও বটে, আবার কল্পনাপ্রবণও বটে, যে বাঙালি নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙালিই বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছে, বাংলাদেশের মানসচিত্রে ভট্টপল্লী ও নানুর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কাঁঠালপাড়া হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব সম্ভব নৈয়ায়িক-বংশের সন্তান।

আগে বাংলা-সাহিত্যের মুখ্য ভাষা সম্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর একটা জল্পনার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দেশের রাজা ইংরেজ না হইয়া ফরাসি হইতে পারিত, এক সময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংলা সাহিত্য কী আকার লাভ করিত। ইংরেজি সাহিত্য কল্পনাপ্রবণ, তাহাতে কাব্যটাই প্রবল, ইংরেজি গদ্য কল্পনা-প্রবণের গদ্য, সে গদ্য মূলত কাব্যধর্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালি-মনের কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পাইয়াছে, বাঙালির কাব্য যেমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, গদ্য তেমন হইতে পায় নাই; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম বাংলা গদ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায় নাই। ফরাসী জাতি এদেশের রাজা হইলে, ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়াটা হইত মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ফরাসী সাহিত্য যুক্তিপন্থী, তাহার গৌরব গদ্য। ফরাসী কাব্য গদ্যধর্মী, অর্থাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্ণেই ও রাসিনের নাটক নৈয়ায়িক মনের কাব্য। ব্যাপকভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাঙালির নৈয়ায়িক মন সমর্থন পাইত, কাব্যাংশে বাংলা সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হইত কিনা জানি না, তবে একথা নিশ্চয় যে, বাংলা গদ্য একপ্রকার স্বচ্ছতা, সরলতা, ঋজুগতি ও দীপ্তি লাভ করিত, বর্তমান বাংলা গদ্যে যাহার একান্ত অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে যে গদ্য বাহির হইয়াছে, যে গদ্যকে বাংলা গদ্যের নিয়[illegible]

নিয়মের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজপথ হইয়া উঠিত। এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলে সেটা বড় সড়কের উপরে হইতে পারিত। ডুপ্লের কূটনীতি জয় হইলে ভট্টপল্লী বাঙালি মনের রাজধানী হইতে পারিত। কিন্তু এ-সব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক; হয়তো এইটুকু অর্থ ইহাতে আছে যে, বাঙালি-মনের গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বকীয় স্টাইলের নমুনারূপে বেনের মেয়ে হইতে দুইটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি জলাশয়ে মাছ ধরার বর্ণনা।

"ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রঙ করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রূপার মাছ বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত শাদা, মাজা রূপার মত চকচকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চকচকে রূপার রঙের উপর সূর্যের সোনালি রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামিশিতে এক অপূর্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হ'য়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব।"

দ্বিতীয় বর্ণনাটি গাজনের শোভাযাত্রার। হাতীর উপরে রাজগুরু ও গুরুপুত্র চাপিয়াছেন, তাহাদেরও দেখিতে পাইব।

"তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সর্বাঙ্গে শিঙ্গার করা, বড় বড় রাঙা রাঙা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটা ছেলে, তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র; মাথাটি মুড়ান, বোধহয়, প্রায়ই

খেউরি করা হয়, গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রঙটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল, গাল দুটি বেশ গোল গাল, দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, কপালখানি ছোট কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে।"

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথম লক্ষণীয়, ইহার ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা খেয়ালের ডাণ্ডা মারিয়া ক্রিয়াপদগুলির হাড় গোড় ভাঙিয়া দিলেই সাধু ভাষা কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবু ইহা মুখ্য ভাষা, যেহেতু ইহার বিন্যাস এমন যে সাধারণ কথাবার্তা বলিতে যেটুকু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জোর দরকার— ইহাতে ততোধিক জোরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রম্ভালাপের সময়, কথা বলিতেছি এ চৈতন্য সব সময় হয় না— এই গদ্য পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশি শব্দ কেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, থাপে থাপে, খোপে খোপে কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত রস-সাহিত্য বলিতে বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা এবং বেনের মেয়ে এই গ্রন্থ তিনখানিকে বুঝি। তাঁহার প্রবন্ধাদির বিশেষ মূল্য থাকিলেও সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির অন্তর্গত নয়।

বাল্মীকির প্রতিভার স্ফুরণ এবং সেই প্রতিভার প্রভাবে বিশ্বে ভ্রাতৃভাবের উদয়— বাল্মীকির জয় গ্রন্থের বিষয়। আদিকবিকে অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিবার ইচ্ছা লেখক মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে আদিকবিকে কেন্দ্র করিয়া দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা ও হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয়। দুখানি গ্রন্থই প্রায় সমকালে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসে; বাল্মীকির জয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে, তৎপূর্বে ১২৮৭ সালের পৌষ, মাঘ, চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ইহা আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমকালে ভূমিষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কে কাহার কাছে ঋণী বলা সহজ নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বাল্মীকির জয়ের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে—"যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকিপ্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।" হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিলেও বাল্মীকির জয়ে তাঁহার কল্পনার বিশেষ স্ফূর্তি হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডসঞ্চারী কল্পনার গতি বাল্মীকির জয়ে সমধিক বলিয়াই মনে হয়।

বাল্মীকির জয় আলোচনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহার শ্রেণী নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? ইহা উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কাব্য নয়, জীবনী নয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও বলা যায় না, এমনকি ইহাকে পুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় গ্রন্থের যদি শ্রেণীনির্ণয় করিতেই হয়, তবে বাল্মীকির জয়কে এক অভিনব পুরাণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। পুরাণ একপ্রকার ইতিহাস। একপ্রকার এই কারণে যে বর্তমানে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝি পুরাণ সে শ্রেণীর ইতিহাস নয়। বর্তমান ইতিহাস "পাথুরে প্রমাণ" ছাড়া কিছু স্বীকার করে না, পুরাণকারগণ যাবতীয় তথ্যকেই গ্রন্থভুক্ত করিতেন। এই বিচারে থুকিডাইটিস্ ঐতিহাসিক আর হেরোডোটাসের গ্রন্থ পুরাণ। বাল্মীকির জয় শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ।

গ্রন্থের বক্তব্য কি? আবার বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতে হইল। তিনি বলিতেছেন— "ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন—'The Three Forces—Physical, Intellectual and Moral.' ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force ত দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি।"

গ্রন্থকার ও সমালোচক দুজনের কথাই সত্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল একটি কাহিনী ও তিনটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনটি Force-এর লীলা বর্ণনা করিবেন, কিন্তু কার্যত সেই লীলা প্রদর্শন কতদূর সত্য হইয়াছে জানি না, মূর্তি তিনটি একান্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, ভালই হইয়াছে, যাহা নীরস প্রবন্ধ হইবার কথা, তাহা সরস আলেখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থকার বলিতে চান যে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি তিন জনে বিশ্বে সমতা ও ভ্রাতৃভাব আনিতে চাহিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সহায় জ্ঞান, বিশ্বামিত্রের সহায় বাহুবল, আর বাল্মীকির সহায় প্রীতি। জ্ঞানে মানুষকে এক করিতে পারে না, স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, বাহুবলে মনের সঙ্গে মনের জোড় বাঁধিতে পারে না, পরাধীন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিয়া রাখিতে পারে— তাহা মনের মিলন নয়, বরঞ্চ বিজিত ও বিজেতার মধ্যে গোপন বিদ্বেষের সৃষ্টিকারক, কেবল প্রীতিই মানুষের সঙ্গে মানুষকে মনের মিলনে গাঁথিয়া এক করিয়া তুলিতে পারে। মানুষে মানুষে মিলন ঘটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিবার ফলেই বাল্মীকির জয় আর বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের ব্যর্থতা।

কিন্তু এই নীতি বিশ্লেষণে বাল্মীকির জয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিব। তিনি এই বইখানি সম্বন্ধে বলিতেছেন— "যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাংলাকে উৎকৃষ্ট বাংলা বলি।...গ্রন্থখানি অতিক্ষুদ্র কিন্তু গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাংলা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। তবে যে বাল্মীকির জয় অধুনা উপেক্ষিত তার কারণ সাময়িকভাবে বাঙালির সাহিত্যিক রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছে। এই রুচিবিকারের অবসানে বাল্মীকির জয় তাহার যথার্থ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

৫

কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে উপন্যাস। পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ যে এক সময়ে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এ কথা আধুনিক যুগ ভুলিতে বসিয়াছে। কাঞ্চনমালা লিখিত হয় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, ১২৮৭ সালে। আর বেনের মেয়ে ১৩২৫ সালের কার্তিক হইতে ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত নারায়ণ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাকে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের শেষাংশের রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ের মধ্যে তিনি রস-সাহিত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভারতবিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, তবু বেনের মেয়ের রচনা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পাথুরে প্রমাণের আঘাতে তাঁহার সাহিত্যের কলম ভোঁতা হইয়া যায় নাই, বরঞ্চ আরও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, উপন্যাস রচনায় পুরাতত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার সহায় হইয়াছে, পাথরের চাপে মাটির শ্যামল তৃণদল শুকাইয়া মরিয়া যায় নাই।

কাঞ্চনমালা মহারাজা অশোকের পুত্র কুণালের পত্নী। কাঞ্চনমালা উপন্যাস তিষ্যরক্ষিতা কর্তৃক নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী। কাহিনীর স্থল সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা। ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহিত বৌদ্ধ শক্তির সংঘাত এবং শেষোক্ত শক্তির জয়— এই কাহিনীর বৃহত্তর বিষয়, যেমন বাল্মীকির জয় তন্নামখ্যাত গ্রন্থের বিষয়, যেমন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণের জয় বেনের মেয়ে উপন্যাসের বৃহত্তর বিষয়। এই রকম কোনো একটা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সূত্র অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে হরপ্রসাদ যেন ভালোবাসিতেন, খুব সম্ভব তাঁহার অসাধারণ পুরাতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান ও প্রতিভা যেন একটা আশ্রয় পাইত। যে কারণেই হোক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থেই এই একই পন্থা দেখিতে পাই।

কাঞ্চনমালা কাঁচা গ্রন্থ। ইহার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের, ইহার কাহিনী-বিন্যাসের রীতিও বঙ্কিমচন্দ্রীয়, আবার বাল্মীকির জয়ে যে চিন্তার স্বকীয়তা আছে এখানে তাহারও অভাব। তার উপরে সমসাময়িক যে তথ্যজ্ঞান বেনের মেয়েকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে, কাঞ্চনমালায় তাহাও পাই না। তবে বিষয়-নির্বাচনে লেখকের দৃষ্টির বাহাদুরি দেখিতে পাই। কুণালের তথা বৌদ্ধশক্তির জয় বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন—"এই দিবস যে কার্য হইল তাহার বলে একহাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সশস্ত্র এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।" এই দৃষ্টি জন্ম-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। যাঁহারা হরপ্রসাদকে সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদেরও সাহস নাই যে তাঁহাকে ঐতিহাসিক না বলেন। তবে "পাথুরে প্রমাণে" তাঁহার তত আস্থা ছিল না। ভাগ্যে ছিল না, তাই পাথর কুঁদিয়া তিনি বেনের মেয়ের সাক্ষীগোপাল সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আরও করিয়াছেন। হাজার বছরের পুরানো বাংলাসমাজের নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। বেনের মেয়ে হাজার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাজিক উপন্যাস। তখন রূপা বাগ্দী 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্যারক পরম সৌগত শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল প্রতাপে সাতগাঁ শাসন

সপ্তগ্রাম ভুক্তি- শাসন করিতেছেন।' সে সহজযানভুক্ত বৌদ্ধ। সপ্তগ্রামে বৌদ্ধ রাজ্য। গাজনের উৎসব উপলক্ষে রাজগুরু সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। এই লুইপাদের রচিত দোঁহা আছে— সেগুলিও হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে, তবে তাহাদের প্রতাপ নাই। প্রতাপ আছে বেনেদের। বেনেদের বড় দব্‌দবা। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া নিজেদের অর্ণবপোতে দেশবিদেশে যায়, বিদেশের লক্ষ্মীকে ঘরে আনে। এই বেনে-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিহারী দত্ত। তাহার মেয়েই এই কাহিনীর নায়িকা। বেনেরা বৌদ্ধ নয়, কিন্তু তাহাদের ঐশ্বর্যের খাতিরে বৌদ্ধ রাজা তাহাদের ভয় করিয়া চলে। এই কাহিনী সম্বন্ধে লেখক মুখপাতে বলিতেছেন—"বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজ্‌কালকার 'বিজ্ঞানসংগত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। বেনের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গালীর সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।"

লেখক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম। তবে ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলিতে ক্ষতি দেখি না। তবে এক হিসাবে ইহা ইতিহাসেরও বাড়া, যেহেতু হাজার বছরের পুরানো বাঙালিসমাজের যে চিত্র ইহাতে আছে তাহা কোনো ইতিহাসে বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে নাই। সে যুগটা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ সময়। এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইব বেনেদের ষড়যন্ত্রে বা সাহায্যে বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বেনেরা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল। যাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাব স্বীকার করিল তাহারা 'জল-চল' জাতি হইল, যাহারা স্বীকার করিল না তাহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিল। হরপ্রসাদ এই যুগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, বেনের মেয়ে উপন্যাসে সে সব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলিকে অলীক মনে করা উচিত হইবে না, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাই সংগত। সেকালের যুদ্ধের বর্ণনায় এক জায়গায় তিনি বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন, হাজার বছর আগে বারুদের ব্যবহার ছিল কিনা জানি না— কিন্তু এই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোথাও অসংগতি চোখে পড়ে নাই।

রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের রাজপথ। বড় বড় বীর, রাজপুরুষ, ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেখানে ভিড়। বেনের মেয়ে ইতিহাসের গলিঘুঁজি, হরপ্রসাদ আর সকলের অজ্ঞাত গলিপথে সেকালে অখ্যাতদের রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের হাঁড়ির খবর একালের গোচর করিয়া ছাড়িয়াছেন। সেই বিস্মৃত কালের সামাজিক আব্‌হাওয়া সৃষ্টিতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস 'ডঙ্কানিশান' হিসাবে না আনিলে, এ বিষয়ে 'বেনের মেয়ে'র জুড়ি নাই; আর জুড়ি না থাকিলে অনেক সময়ে যেমন হয় তাহাই হইয়াছে, এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অনাদৃত। গ্রন্থাবলী সিরিজে ইহা দুর্লভ হইয়া আছে, এ সংবাদ বাঙালি রসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। গ্রন্থাকারে সুলভ হইয়া বাঙালির ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিবার যোগ্য, স্কুল-কলেজে ইহা পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা একাধারে ইতিহাস ও রস-সাহিত্য। আর আজকার দিনে যাঁহারা সাহিত্যে সমাজচৈতন্য চান,

তাঁহারা ইহাতে পেট পুরিয়া সমাজচৈতন্য পাইবেন। দেখিতে পাইবেন যথার্থ সমাজচৈতন্য কি বস্তু এবং কেমনভাবে তাহাকে সরস করিয়া তুলিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। একটা ছেলেভুলানো ছড়া বাংলাদেশের সবাই জানে—

'আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামন পাড়া।

এই প্রাচীন ছড়াটির অর্থ কেহ জানে কি? সকলেই নিরর্থক মনে করিয়া বকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সেকালের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবাদের চিহ্ন যে বর্তমান, ইহা যে জীবন্ত 'সমাজচৈতন্য', হরপ্রসাদের বেনের মেয়ে পড়িবার আগে জানিতাম না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যুদ্ধ আসন্ন। "রাজা হুকুম দিলেন 'সব বাগ্‌দী সাজো।' বাগ্‌দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সোয়ারও ডোম, দশ হাজার বাগ্‌দী সাজিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচহাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল। ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

'আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে'—ইত্যাদি।

ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।"

এবার ছেলেভুলানো ছড়াটির অর্থ কি স্পষ্ট হইয়া উঠিল না? এখন আর ইহাকে নিরর্থক ছড়া মনে হইবে না, ইতিহাসের নজির মনে হইবে। ইহাই সমাজচৈতন্যের যথার্থ সাহিত্যিক রূপ। কতকগুলা ঘটনার বিবরণ সমাজচৈতন্য নয়, তাহার জন্য সংবাদপত্র আছে।

বৌদ্ধরাজ্য নাশ হইল এবং হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হরিবর্মা স্থির করিলেন গোটা ভারতবর্ষের গুণীজ্ঞানীদের ডাকিয়া এক সভা করিবেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিবেন। হরিবর্মার দূত ভারতবর্ষের গুণিসমাজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। তাঁহার দূত মুঙ্গের, পাটনা, নালন্দা, রাজগির, ওদন্তপুরী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পার হইয়া কাশী হইয়া কনৌজ পর্যন্ত পৌছিল। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল যে, মুসলমানে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সবাই আসন্ন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত; সভা করিতে কাহারো মন হইবে না, রাজদূত বুঝিতে পারিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া রাজদূত ফিরিয়া আসিল। কয়েকটি পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা ঐতিহাসিকের বর্ণনা নয়, কারণ ঐতিহাসিক দেখে দূর হইতে একাল হইতে সেকালকে। এ বর্ণনা সেই শিল্পীর মানস-উদ্ভূত, ইতিহাসের জাহ্নবীকে যিনি গণ্ডূষে পান করিয়াছেন। এ দেখা ভিতর হইতে দেখা, কাছে হইতে দেখা, সেই কালে গিয়া সেকালকে দেখা। এই পরিচ্ছেদ কয়েকটিকে ইতিহাসের মেঘদূত বলা উচিত। এগুলি পড়িবার সময়ে লেখকের জ্ঞান ও বর্ণনাশক্তি মুগ্ধ করিয়া দেয়, মনে হয় হরিবর্মার দূতের তল্পী বহিয়া আমরাও সঙ্গে চলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এদেশে যাহারা লেখে তাহারা পড়ে না, আবার যাহারা পড়ে তাহারা লেখে না।

হরপ্রসাদ তাহার ব্যতিক্রম। কাঞ্চনমালায় সে ব্যতিক্রম তেমন স্পষ্ট নয়। বেনের মেয়ে পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতেন।

৭

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? নিছক আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি হইতে তাহার উদ্ভব মনে হয় না। এই দেশকে, এই দেশের ঐতিহ্যকে তিনি নিগূঢ়ভাবে ভালো বাসিতেন। এই দেশের প্রাচীনকালের জটিল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান সেই ভালোবাসাকে একটা বাস্তব ভিত্তি দিয়াছিল। এই ভিত্তির উপরে তাঁহার রস-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালোবাসার বন্ধনে তাহা সুবিন্যস্ত বলিয়া মনে হয়। স্যর ওয়াল্টার স্কট রাজনৈতিক মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুগভীর স্বদেশপ্রেম তৎকালীন কোনো অনলবর্ষী বিপ্লবী বা উদারনীতিকের চেয়ে কম ছিল না, বরঞ্চ অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া যে ঐতিহাসিক কাল রহিয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। হরপ্রসাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি না, জানিবার প্রয়োজনও অনুভব করি না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল তাঁহার রস-সাহিত্যের সাক্ষ্যের বলেই বলিতে পারি যে, দেশের প্রতি, কেবল রাজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অসীম আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার রস-সাহিত্য সেই গৌরবকে প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাঞ্চনমালায় ভারতের গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, বেনের মেয়েতে বাংলার গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, আর বাল্মীকির জয়ে গৌরবময়ী পুরাণী প্রজ্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরন্তনী মনে করিতেন, দেখাইয়াছেন।

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্যে ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমন কি দেশের সমস্যাকে তাঁহারা যেন বিদেশি চশমা দিয়াই দেখেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তাঁহাদের রচনায় যে মর্মরশব্দটুকু শ্রুত হয়, তাহা দেশের চিত্তকন্দর হইতে উত্থিত নয়, নিতান্তই সংবাদপত্র ও দলীয় বুলেটিনের আওয়াজ মাত্র। যথার্থ শিল্পধর্মচ্যুত এইসব রচনাকে 'সমাজচৈতন্য' নামের টীকা দিয়া পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শিল্পধর্ম ও সমাজচৈতন্য তো পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোষক। দুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব সৃষ্টি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের মেয়ে উপন্যাস। আধুনিকতম বিদেশী উপন্যাস যাঁহারা আগ্রহে লুফিয়া লন, তাঁহারা একটু সময় করিয়া এই বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। হরপ্রসাদের মতো লিখিবার শক্তি সর্বজনলভ্য নয়, কিন্তু তাঁহার মতো দেশকে ভালোবাসিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সেই চেষ্টার সহায় হইবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত
শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত তৈলচিত্রের
শ্রীপরিমল গোস্বামী গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা রচনাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম— ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ ; মৃত্যু— ১৭ নবেম্বর ১৯৩১। ছাত্রজীবন হইতেই— বয়স যখন ২১-২২ বৎসর— তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র 'On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers' একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই ? তাহার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত এক রকম স্কলারসিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ. মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ., আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক, তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া

তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি স্টেসনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন।...রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বি-আনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত-কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বতকন্দর' আছে", বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের* ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিলাম।......

এক দিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে! তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি † মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন, "ওঃ! তাই-বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন "নিশ্চয়ই"। আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।" বলিতে কি, সেদিন আমি ভারী খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।...

বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন।...বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন

---

* নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু (তর্করত্ন)—শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; জীবনী—মৎরচিত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

† শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬৭ সনের ১২ই আগস্ট মাসিক ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের "লেকচারার" নিযুক্ত হন। "আমার জীবনের কথা" প্রবন্ধে ('প্রবাসী', মাঘ ১৩৩৪) তিনি লিখিয়া গিয়াছেন: "আমার সময়ের সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন— উমেশচন্দ্র বটব্যাল (বড়াল),—শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী,— হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী,...। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় সংস্কৃত-ভরা বাঙলা (Sanskritised Bengali) রচনার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মে। সার্ জর্জ ক্যাম্বেলের Sanskritised Bengali and Persianized Urdur বিরুদ্ধ Minutes ১৮৭২ সালে প্রকাশ হইলে আমি বড় খুসী হই, আর 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে আমি Sanskritised Bengalir উপর এক প্রবন্ধ (Bengali Spoken and Written) ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করি।"

করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেইজন্য এখন সেইসকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পর প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি।...লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন।...এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি"—অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিন জন কবি বাইরন্, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।" ("বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়": 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২)

হরপ্রসাদ আমরণ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী-বাংলা বহু রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহার অতি অল্প মাত্রই তাঁহার জীবিতকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধাবলীর সুদীর্ঘ তালিকা সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়; কৌতূহলী পাঠক *Indian Historical Quarterly* (vol. IX, 1933) পত্রে প্রকাশিত ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার "Mm. Dr. Haraprasad Sastri" প্রবন্ধে উহার সন্ধান পাইবেন। আমরা এখানে কেবল তাঁহার বাংলা রচনাগুলির কথাই আলোচনা করিব।

রচিত পুস্তক-পুস্তিকা: হরপ্রসাদের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত:

১. ভারতমহিলা। কাঁটালপাড়া ১২৮৭ (২০ জুন ১৮৮১)। পৃ. ৯৬।

"মহারাজা হোলকারদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত।" ১২৮২, মাঘ-চৈত্র 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

২. বাল্মীকির জয়। ১২৮৮ সাল (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ. ৯৭।

১২৮৭, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আংশিক প্রকাশিত। ১৯০৯ সনে R. R. Sen, B. L. চট্টগ্রাম হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ *The Triumph of Valmiki* নামে প্রকাশ করেন।

৩, সচিত্র রামায়ণ। ইং ১৮৮২।

বাল্মীকি রামায়ণের সরল অনুবাদ। ইহা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ৪র্থ—১১শ খণ্ডের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮৮২) উল্লেখ আছে। অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক ছিলেন।

৪. মেঘদূত ব্যাখ্যা। ১৩০৯ সাল; ২৫ জুন ১৯০২। পৃ. ৮৮।

৫. কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২২ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৫৮।

১২৮৯, আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত।

৬. বেণের মেয়ে (উপন্যাস)। ১৩২৬ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ২২৮।
১৩২৫ কার্তিক—১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত।

৭. কলিকাতা মহানগরীতে আহূত ভারত-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনে [২১ মাঘ ১৩২৯], সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন। ইং ১৯২৩।

মৃত্যুর পরে

৮. প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—নং ৫৪)। আশ্বিন ১৩৫৩(১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। পৃ. ৬৪।
ইহা বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত ৮ম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের(চৈত্র ১৩২১) মূল সভাপতির অভিভাষণ।

৯. বৌদ্ধধর্ম। আষাঢ় ১৩৫৫ (২৩ জুলাই ১৯৪৮)। পৃ. ১৪৭।
১৩২১-২৪ সালের 'নারায়ণে' প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সমষ্টি।

পাঠ্য পুস্তক : হরপ্রসাদ কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন ; উহা—

১. বাঙ্গালা প্রথম ব্যাকরণ। (৫ই এপ্রিল ১৮৮২)। পৃ. ৩৮।

২. ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইং ১৮৯৫ (১৪ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৩৬৬।
"প্রাচীন আর্য্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্য্যন্ত।"

৩. প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইং ১৯১২। পৃ. ১৮৮।
ইহাই পরিবর্ত্তিত আকারে ১৯২২ সনে 'প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস' (পৃ. ২০০) নামে প্রকাশিত হয়।

৪. প্রসাদ-পাঠ, ১ম ও ২য় ভাগ।

সম্পাদিত গ্রন্থ : হরপ্রসাদের সম্পাদিত গ্রন্থগুলির তালিকা—

১. বা ং লা : 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' : মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮)। ১৩১২ সাল।

২. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা' (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৫৫)। শ্রাবণ ১৩২৩ (ইং ১৯১৬)।

৩. 'মহাভারত (আদিপর্ব্ব)' : কাশীরাম দাস (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৭৫)। ১৩৩৫ সাল (২৫ জুলাই ১৯২৮)

মৈ থি লী : 'কীর্ত্তিলতা' : মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সমেত)। ১৩৩১ সাল (১০ জানুয়ারি ১৯২৫)।

ভূমিকা : হরপ্রসাদ অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি—

১. 'জয়দেব চরিত্র' : কবি বনমালী দাস-বিরচিত। ১৩১২ সাল (পরিষৎ)।

২. 'পাখীর কথা' : শ্রীসত্যচরণ লাহা, আষাঢ় ১৩২৮।

৩. 'সৌন্দরনন্দ কাব্য' : শ্রীবিমলাচরণ লাহা-অনূদিত। আষাঢ় ১৩২৯।

৪. 'কালিকা-পুরাণীয়-দুর্গাপূজাপদ্ধতি' : শ্রীগণপতি সরকার ও আশুতোষ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত। ১৩৩০ সাল, ইং ১৯২৩।

৫. 'বীরভূম-বিবরণ', ৩য় খণ্ড : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৩৪ (জুলাই ১৯২৭)।
৬. 'পরিমল' (কবিতা) : পরিমল দেবী। ১৩৩৪ সাল।
৭. 'মেঘদূত' ঃ শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ। ভাদ্র ১৩৪১। হরপ্রসাদ-লিখিত পূর্ব্বাভাষের তারিখ—জানুয়ারি ১৯৩০।
৮. 'গোগৃহ' (কাব্য) : শ্রীবিধুভূষণ সরকার। বৈশাখ ১৩৩৭।
৯. 'কালিকামঙ্গল' : বলরাম কবিশেখর-বিরচিত। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। চৈত্র ১৩৩৭।
১০. 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩৩৮।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : হরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি প্রধানতঃ বঙ্কিম-সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন : "তিনি আমাকে লিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সেজন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল—হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুশী করিব" ('নারায়ণ', আষাঢ় ১৩২৫)। মাত্র একটি প্রবন্ধ ছাড়া, 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত আর কোন রচনায় হরপ্রসাদের নাম ছিল না। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আজিকার দিনে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দুরূহ। 'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।" যে-সময়ে তিনি এই কথাগুলি লেখেন তাহার পর-বৎসরে (ইং ১৯১৬) হেয়ার প্রেস হইতে *Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, M.A., C.I.E., F.A.S.B.* নামে ২০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধগুলির তালিকাও আছে। বাংলা প্রবন্ধের তালিকায় 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'নারায়ণ' ও 'বিভা'য় মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির নামের ইংরেজী অনুবাদ আছে। পুস্তিকাখানি আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণের জন্যই মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহা যে হরপ্রসাদেরই রচনা, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ইহারই প্রসাদে আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির নাম জানিতে পারিতেছি।

আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হরপ্রসাদের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনাগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

১২৮৪	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	* আমাদের গৌরবের দুই সময়
	জ্যৈষ্ঠ	'আর্য্যদর্শন'	যৌবনে সন্ন্যাসী
	শ্রাবণ	ঐ	প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ ["শ্রীশরৎ" স্বাক্ষরিত]
	শ্রাবণ	'বঙ্গদর্শন'	* ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ
	আশ্বিন	ঐ	* শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?
	পৌষ	ঐ	* বেদ ও বেদব্যাখ্যা

পৌষ	'আর্য্যদর্শন'	ইক্ষু ["একজন চাসা" স্বাক্ষরিত] †
১২৮৫ বৈশাখ	'বঙ্গদর্শন'	* কালিদাস ও সেক্ষপীয়র
আষাঢ়	ঐ	একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব
	ঐ	* সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ ?
পৌষ	ঐ	* বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
ফাল্গুন	ঐ	* মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য
চৈত্র	ঐ	একৃসচেঞ্জ
	ঐ	* তৈল
১২৮৭ বৈশাখ	ঐ	স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর
জ্যৈষ্ঠ	ঐ	খাজনা কেন দিই ?
আষাঢ়	ঐ	* শিক্ষা
শ্রাবণ	ঐ	হৃদয়-উদাস
ভাদ্র	ঐ	* কালেজী শিক্ষা
কার্ত্তিক	ঐ	নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউর মত
অগ্রহায়ণ	ঐ	*ভট্টাচার্য্য-বিদায় প্রণালী
পৌষ	ঐ	যার কাজ সেই করুক ‡
ফাল্গুন	ঐ	* বাঙ্গালা সাহিত্য (বর্ত্তমান শতাব্দীর)। (ইহা যে হরপ্রসাদ কর্ত্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত তাহার উল্লেখ আছে)
?	'কল্পনা'	* মোহিনী (খণ্ডকাব্য)
?	ঐ	* স্ত্রী-বিপ্লব
১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	* নূতন কথা গড়া
আষাঢ়	ঐ	* সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন করা"
শ্রাবণ	ঐ	* বাঙ্গালা ভাষা
১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন	ঐ	মেঘদূত (সমালোচনা) ¶

† ১৯১৬ সনে মুদ্রিত ইংরেজী পুস্তিকায় এই রচনার উল্লেখ নাই।

‡ পূর্বোল্লিখিত ইংরেজী পুস্তিকায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত Self Government নামে হরপ্রসাদের একটি রচনার উল্লেখ আছে। ইহা যে "যার কাজ সেই করুক" নামে প্রবন্ধ সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। প্রবন্ধের শেষ কয় পংক্তি এইরূপ ঃ—"অতএব যেখানে যেখানে স্থানীয় মিউনিসিপাল শাসন আছে, নিজে মেম্বরনির্ব্বাচন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক, নহিলে কমিটী তোমাদের অর্থশোষণ করিবে, তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তোমাদের কাছে বড় হইয়া, কর্ত্তার কাছে হাতযোড় থাকিবে। আর তোমাদের কোন কাজ হইবে না। তাই বলি যার কাজ সেই করুক। তোমাদের কমিশনর তোমরাই নির্ব্বাচন কর এ বিষয়ের আইনও আছে।" ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮৮০) হরপ্রসাদ নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

¶ ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' পুস্তকের প্রারম্ভে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্ব্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।"

১২৯০ কার্ত্তিক	'নব্য ভারত'	* কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে
" কার্ত্তিক, পৌষ	'বঙ্গদর্শন'	রঘুবংশ
১২৯৪ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ	'বিভা'	কুশীনগর
ফাল্গুন	ঐ	* মুসলমানী বাঙ্গালা (শুজ্জু উজাল বিবীর কেচ্ছা)
১২৯৫ আষাঢ়	ঐ	* ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার (বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা)
মাঘ, ফাল্গুন	ঐ	মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চ্চা
১৩০০ জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	* কবি কৃষ্ণরাম
১৩০৪ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ত্রৈমাসিক)	রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল
৪র্থ সংখ্যা	ঐ	কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক
১৩০৫ ৩য় সংখ্যা	ঐ	ধোয়ী কবির পবনদূত
১৩০৭	'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী'*	বিদ্যাপতির পদাবলী (অসম্পূর্ণ)
১৩০৮ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বাঙ্গালা ব্যাকরণ
১৩১৭ ২য় সংখ্যা	ঐ	বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট
১৩২১ বৈশাখ, আষাঢ়	'মানসী'	কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ
৪র্থ সংখ্যা	ঐ	সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন (৮ম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বৰ্দ্ধমান)
	ঐ	হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা
১৩২২ বৈশাখ	'নারায়ণ'	বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়
	ঐ	বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত
ভাদ্র	ঐ	কালিদাসের মেয়ে দেখান
আশ্বিন	ঐ	সীতার স্বপ্ন
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির]
কার্ত্তিক	'নারায়ণ'	দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা
অগ্রহায়ণ, বৈশাখ ১৩২৩	ঐ	রাধামাধবোদয়
ফাল্গুন	ঐ	কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা

* ইহা ১৩০৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির Bibliotheca Indicaর আদর্শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি দ্বৈমাসিক পত্রিকা। ইহাতে প্রাচীন গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইত। ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত হরপ্রসাদ ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ	'নারায়ণ'	ইরাবতী
আষাঢ়	ঐ	পার্ব্বতীর প্রণয়
ভাদ্র, আশ্বিন	ঐ	তীর্থ-ভ্রমণ (সমালোচনা)
আশ্বিন	'নারায়ণ'	দুর্গাপূজা
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির]
ফাল্গুন	'নারায়ণ'	উর্ব্বশী-বিদায়
১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	বিরহে পাগল
আষাঢ়	ঐ	কোমলে কঠোর
	'উদ্বোধন'	বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম
শ্রাবণ	'নারায়ণ'	কণ্বের কোমল মূর্ত্তি
ভাদ্র	ঐ	মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা
আশ্বিন-কার্ত্তিক	ঐ	কণ্বের কঠোর মূর্ত্তি
	ঐ	শকুন্তলার মা
অগ্রহায়ণ	ঐ	দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য
পৌষ	ঐ	দুর্ব্বাসার শাপ
মাঘ	ঐ	শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী
ফাল্গুন	ঐ	এক এক রাজার তিন তিন রাণী
১৩২৫ বৈশাখ	'নারায়ণ'	অগ্নিমিত্রের ভাঁড়
জ্যৈষ্ঠ	ঐ	কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ
আষাঢ়	ঐ	বঙ্কিমচন্দ্র
শ্রাবণ	ঐ	রঘুবংশের গাঁথুনি
ভাদ্র	ঐ	রঘুতে নারায়ণ
আশ্বিন	ঐ	রঘু আগে কি কুমার আগে ?
কার্ত্তিক	ঐ	অজবিলাপ ও রতিবিলাপ
অগ্রহায়ণ	ঐ	রঘুকাব্য বড় কিসে ?
পৌষ	ঐ	রঘুবংশে বাল্যলীলা
ফাল্গুন	ঐ	রামের ছেলেবেলা
চৈত্র	ঐ	রঘুবংশে প্রেম
১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	রঘুবংশে প্রেম—বিরহ
ভাদ্র	'সাহিত্য'	রামেন্দ্রবাবু
পূজা-বার্ষিকী	'আগমনী'	বামুনের দুর্গোৎসব
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	চণ্ডীদাস

১৩২৭ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর
শ্রাবণ	'প্রবাসী'	লাইব্রেরী
কার্ত্তিক	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	অর্দ্ধেন্দু-কথা
১৩২৮ ৩য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	'ব্রহ্ম' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা
	ঐ	মহাদেব
১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ	'মাসিক বসুমতী'	নাট্যকলা
১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ
শ্রাবণ, ভাদ্র	'মাসিক বসুমতী'	বঙ্কিমচন্দ্র
ভাদ্র	'প্রবাসী'	কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা)
	'ভারতী'	স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	চণ্ডীদাস
১৩৩০ শ্রাবণ	'প্রাচী'	ডাক ও খনা
ভাদ্র	ঐ	বিদ্যাপতি
কার্ত্তিক	'প্রবর্ত্তক'	পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা
অগ্রহায়ণ	'প্রাচী'	ব্রাত্য
১৩৩১ বৈশাখ	'সুবর্ণবণিক্ সমাচার'	৺দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কথা (পৃ. ২৩০-৩১)
৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ আষাঢ়	'নাচঘর' (সাপ্তাহিক)	অর্দ্ধেন্দুশেখর
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ
কার্ত্তিক	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	খানাকুল-কৃষ্ণনগর (রাধানগর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ)
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	৺প্যারীচাঁদ মিত্র
১৩৩২ শ্রাবণ	'মাসিক বসুমতী'	বাঙ্গালা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন
২০ চৈত্র	'নবযুগ' (সাপ্তাহিক)	কয়টী তারিখ (নৈহাটি সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	আমাদের ইতিহাস
১৩৩৩ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রাবণ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোক-সভা
	'ভারতবর্ষ'	শ্রীকৃষ্ণ (সমালোচনা)
পূজা-বার্ষিকী	'বার্ষিক বসুমতী'	পাঁচ ছেলের গল্প
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?
অগ্রহায়ণ	'ভারতবর্ষ'	ঋষির মেয়ে (সমালোচনা)
	'প্রবাসী'	বৃহত্তর ভারত-পরিষদে আশীর্ব্বাদ-পত্র
অগ্রহায়ণ-পৌষ	'মাসিক বসুমতী'	গুরুদাস-স্মৃতি
১৩৩৪ পূজা-বার্ষিকী	'বার্ষিক বসুমতী'	ব্যনোগী টিব্বা

১৩৩৪ কার্ত্তিক	'মাসিক বসুমতী'	ঝিল্লী
অগ্রহায়ণ	'সুবর্ণবণিক্ সমাচার'	৺ অধরলাল সেন
১৩৩৫ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ—ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত?
১৩৩৬ আষাঢ়	'পঞ্চপুষ্প'	ভরতের নাট্যশাস্ত্র
১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ—বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ
মাঘ	'মাসিক বসুমতী'	কামন্দকীয় নীতিসার
	'প্রবাসী'	কালিদাসের অভিধান
১৩৩৭ ভাদ্র	'পঞ্চপুষ্প'	ভরত মল্লিক
আশ্বিন	'প্রবাসী'	অভিধান (সমালোচনা)
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ
৩য় সংখ্যা	ঐ	চিরঞ্জীব শর্ম্মা
৪র্থ সংখ্যা	ঐ	কাশীনাথ বিদ্যানিবাস
১৩৩৮ ১ম সংখ্যা	ঐ	রত্নাকরশান্তি
২য় সংখ্যা	ঐ	বৃহস্পতি রায়মুকুট
৩য় সংখ্যা	ঐ	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
পৌষ	'মাসিক বসুমতী'	এস, এস বঁধু এস—আধ আঁচরে ব'স
মাঘ-ফাল্গুন	ঐ	ভবভূতি
চৈত্র	ঐ	মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার
১৩৩৯ ১ম সংখ্যা	ঐ	পুরুষোত্তমদেব
কার্ত্তিক	'পঞ্চপুষ্প'	সিংহল-দ্বীপ
মাঘ	'বঙ্গশ্রী'	ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস
১৩৪০ মাঘ	ঐ	পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড

তারকা-চিহ্নিত রচনাগুলি ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'তে (৫ খানি বাংলা গ্রন্থের সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত "বাঙ্গালা ভাষা" নামে একটি প্রবন্ধও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধটির উল্লেখ কিন্তু ইংরেজী পুস্তিকায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-তালিকায় নাই। থাকিবার কথাও নহে; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ সনে তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগে' ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলীর সঙ্কলনকর্ত্তা যিনিই হউন, ইহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বগামীর অনবধানতাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দই এই মারাত্মক ভুলের স্রষ্টা ('পঞ্চপুষ্প,' কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ. ৯০৮ দ্রষ্টব্য)। ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও (*Indian Hist. Quarterly*, ix. 380) ইহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই।

অকার বনাম হস্‌চিহ্ন

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বাংলা লিপি ও বাংলা বানান সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা * ক'রে দেখা গেল, একটি অকার-চিহ্ন গ্রহণ করলে এই দুদিক্‌কারই অনেক সমস্যা আমাদের মেটে।

অকার-চিহ্ন গ্রহণের বিপক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উপস্থাপিত হয়ে থাকে, এবারে একটি একটি ক'রে সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে তাদের কোন্‌টার কতখানি মূল্য।

বাংলা সংস্কৃত-গোষ্ঠীর ভাষা। তার বর্ণমালার ধ্বনিসংস্থান সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে নেওয়া। সংস্কৃত বর্ণমালাতে অকার-চিহ্ন ব'লে কিছু নেই; সুতরাং বাংলা বর্ণমালাতে অকার-চিহ্নের আগম হলে সংস্কৃতের সঙ্গে তার সমগোত্রীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে, বাংলাভাষা জাতিচ্যুত হবে, অকারচিহ্ন-বিরোধীদের মধ্যে এই হল একদলের বক্তব্য।

এঁরা ভুলে যান যে, ধ্বনিচিহ্নগুলি চিহ্ন মাত্রই; ধ্বনিটা আসল, চিহ্নটা গৌণ। আসল জায়গায় আমাদের যখন চ্যুতি ঘটছে না; সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব, তার সন্ধি-সমাসের নিয়ম, তার ষত্ববিধি, ণত্ববিধি প্রভৃতিকে আমরা এখন যতটা মান্য করছি পরেও যখন ততটাই মান্য করব, তখন বাইরেকার পোষাক একটা বেশী নিচ্ছি ব'লে আমাদের জাত যাওয়া উচিত নয়। যে বাপ কোনোওকালে রুমালে মুখ মোছেননি, তাঁর নিষ্ঠাবান্‌ ছেলেটির হঠাৎ যদি একটা রুমাল কিনবার খেয়ালই হয় ত সেজন্যে অত্যন্ত গোঁড়া সমাজেও কেউ তার ধোপানাপিত বন্ধ করে না। একটি অকার-চিহ্ন গ্রহণ করলে আমাদেরও ধোপানাপিত যে বন্ধ হবে না সেটা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে, কারণ, সংস্কৃত যে আমাদের প্রমাতামহী তা নিয়ে কোনোও সংশয় জন্মাবে না এর থেকে।

যদি নজির চান ত চন্দ্রবিন্দুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করব। ঐ ধ্বনিচিহ্নটি সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই, বাংলায় আছে। জাত বাঁচাবার খাতিরে সেটিকে বর্জ্জন করবার পরামর্শ আজ অবধি ত কেউ দেননি? ড়, ঢ়, য়, ৎ, এইগুলিও বাংলার নিজস্ব অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন।

চিহ্নহীন ব্যঞ্জন মাত্রেই উচ্চারণে অকারান্ত, এই যে নিয়ম আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের মুনিঋষিরা ক'রে রেখে গিয়েছেন, এ তাঁদের প্রতিভাপ্রসূত এক অতি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা, তাঁদের এই বর্ণ-বিন্যাসরীতি আজ যদি আমরা পরিত্যাগ করি ত ভারতীয় আর্য্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে একটি বড় যোগসূত্র আমাদের ছিন্ন হয়ে যাবে, এই হল আর-এক দলের বক্তব্য।

কিন্তু আসলে এর উল্টো কথাটাই ঠিক। ভারতীয় আর্য্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সত্যিকারের একটি বড় যোগসূত্র আমাদের ছিন্ন হয়ে যাবে, যদি আজকের দিনের নূতনতর পরিবেশের মধ্যে বাংলার জন্যে অকার-চিহ্ন একটি আমরা গ্রহণ না করি। কেননা, ভারতীয় সংস্কৃতির যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা বহু পরিশ্রমে

---

* দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১, "বাংলা লিপির সংস্কার"; কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪, "বাংলা বানানে অ এবং অকার"; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, "নূতন বাংলার বর্ণমালা"।

তাঁদের লিপিকে ধ্বনি-অনুসারী ক'রে গড়েছিলেন, এবং একটি অকার-চিহ্নের অভাব বাংলালিপির ধ্বনি-অনুসারী হবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

তাঁরা দেখেছিলেন যে, অকারের জন্যে একটি আলাদা ধ্বনি-চিহ্ন না থাকলেও তাঁদের চলে, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলি সর্ব্বত্র সব অবস্থাতেই অকারান্ত উচ্চারিত হবে এই নিয়মটিকে যদি তাঁরা গ্রহণ করেন; এবং তাই ক'রে লিপিতে একটি ধ্বনি-চিহ্ন তাঁরা কমিয়েছিলেন। চিহ্নহীন ব্যঞ্জনমাত্রেই ইকারান্ত উচ্চারিত হবে এইটে স্থির ক'রে তাঁরা যদি ইকার বাদ দিয়ে অকার-চিহ্ন গ্রহণ করতেন, ফল একই দাঁড়াত। তাঁদের মত, আজ আমরাও যদি চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলিকে সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে অকারান্তই উচ্চারণ করব স্থির করতে পারতাম, ত অকার-চিহ্ন গ্রহণের কথা উঠতেই পারত না। সংস্কৃত বর্ণমালায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলির চিহ্নবিহীনতাটাই ছিল অকার। আকার যেমন সর্ব্বত্রই আকার, স্থানবিশেষে উকার নয়; ইকার যেমন সর্ব্বত্রই ইকার, স্থানবিশেষে ঔকার নয়, তেমনিই চিহ্ন-বিহীনতাটা সর্ব্বত্রই ছিল অকার, কোথাও হসন্তবৎ ছিল না। তাঁদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের দুরকম উচ্চারণ করবেন, এ যদি তখন তাঁরা জানতেন, একটি অকার-চিহ্নের ব্যবস্থা নিশ্চয় ক'রে রেখে যেতেন। বর্ণ-মালাকে নিখুঁৎ ক'রে গড়তে এত দিকে এত মেহনত তাঁদের করতে হয়েছিল যে, ঐটুকু করতে তাঁরা কখনোই পেছপা হতেন না।

অকার-চিহ্ন ছাড়াই ত আমাদের দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, এই হল অকার-চিহ্ন-বিরোধী তৃতীয় একদলের যুক্তি। এটা হল অলসের যুক্তি, প্রগতিবিমুখতার যুক্তি। চ'লে যে যাচ্ছে না, বাংলালিপির সংস্কার যে অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন, এবং একটি অকার-চিহ্ন গ্রহণ ভিন্ন তা যে হওয়া সম্ভব নয়, সে-সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র একাধিকবার করেছি।

বিরোধীদলের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ব'লে যেটাকে মান্য করতে হয়, সেটা হচ্ছে, হস্‌চিহ্নের ব্যাপকতর ব্যবহারের যুক্তি। এঁরা বলেন, সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসের যেটা রীতি সেটাকে রক্ষা ক'রে, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলিকে সেই রীতি অনুযায়ী সর্ব্বত্র অকারান্তই উচ্চারণ করব, কোথাও তার অন্যথা করব না স্থির ক'রে, মূলতঃ অকারান্ত বর্ণের হসন্তবৎ উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করলেই ত চলে, অকার-চিহ্ন কেন আবার একটা অকারণ?

কিন্তু হসন্ত ও হসন্তবৎ, এ দুটোকে কিছুতেই মিশিয়ে ফেলা চলতে পারে না।

বাংলা উচ্চারণের যা ধারা তার স্রোতের টানে প'ড়ে, মূলতঃ অকারান্ত অনেক বর্ণ, সংক্ষিপ্ত হতে হতে কোথাও কোথাও হসন্তবৎ হয়ে গিয়েছে। হয়ত এটা আমার ভুল, তবু বলব যে, হসন্ত এবং হসন্তবৎ এ দুটোর উচ্চারণেও অনেক ক্ষেত্রে তফাৎ একটু রয়েছে। জামবন-বন্‌বন্‌, ঠক-ঠক্‌ঠক্‌, কূট-কুট্‌, বসত-অসৎ, বাত-দৈবাৎ, দূত-বিদ্যুৎ, দান-বিদ্বান্‌, এই শব্দগুলির অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ তুলনা ক'রে পাঠক দেখতে পারেন। পদান্তে হসন্ত উচ্চারণের পর জিহ্বা ও ওষ্ঠের সংস্থান এক অবস্থায় এসে যতক্ষণ থাকে, হসন্তবৎ উচ্চারণের পর ততক্ষণ থাকে না, অর্থাৎ ধ্বনিটি ঠিক সমাপ্তি লাভ না ক'রে মোটের উপর একটু বিলম্বিত হয়।* পদমধ্যবর্ত্তী হসন্ত ও হসন্তবৎ উচ্চারণের এই তফাৎ তত স্পষ্ট নয়।

* স্বরান্তের আর এক নাম open এবং ব্যঞ্জনান্তের আর এক নাম closed।

উচ্চারণের তফাৎ কিছু থাক্ বা নাই থাক্, হসন্ত এবং হসন্তবৎ এই দুয়েতেই হস্‌চিহ্ন দিতে যাবার বিপদ্ অনেক। •

হস্‌চিহ্ন একটানে লেখা যায় না, এই কথা ব'লে স্থরু করা যেতে পারত; কিন্তু অপরপক্ষ চিহ্নটাকে বদ্‌লে নিতে রাজী হ'তে পারেন। স্থতরাং হস্‌চিহ্নের বিরুদ্ধ-যুক্তি হিসাবে কথাটাকে তুলবই না মোটে।

তবে এটা ঠিক যে, অকারান্তের হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করলে বাংলা লিপি বেশ কিছুকাল ধ'রে আমাদের চোখকে অত্যন্ত বেশী পীড়া দেবে। হস্‌চিহ্নটা দৃষ্টি-স্থখকর নয় ব'লে নয়, একটা পরিচিত জিনিষকে হঠাৎ অপরিচিত কাজে ব্যাপৃত হ'তে দেখলে একটু খাপছাড়া লাগাই স্বাভাবিক। অপরিচিতকে দিয়ে অপরিচিত কাজ করিয়ে নেবার এই অস্থবিধাটা নেই ব'লে, অকার হিসাবে নূতন যে ধ্বনিচিহ্নই আমরা গ্রহণ করব, সেটা চোখের এতখানি পীড়াদায়ক হবে না।

কিন্তু এটাও খুব বড় কথা নয়। কালক্রমে হস্‌চিহ্নকে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে দেখা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ব্যাপারটাকে আর খাপছাড়া মনে হবে না।

হসন্তবৎ অকারকে হস্‌চিহ্নিত করবার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল, হসন্ত নয় ব'লে যাকে নিশ্চয় ক'রে জানি, তাকে হসন্ত ক'রে কেন লিখব? বাড়ীতে ঘটি এবং ফুলদানি এ দুয়েরই প্রয়োজন রয়েছে; ফুলদানির কাজ কালেভদ্রে ঘটি দিয়েও চলতে পারে ব'লে বাড়ীর সব ক'টা ঘটিতে সারাক্ষণ ফুল সাজিয়ে রেখে দিলে কাজের খুবই অস্থবিধা ঘটে না কি?

হসন্তবৎএর আচরণ সন্ধি-সমাসে হসন্তের মত নয়, অকারেরই মত। যদি বলি, বাংলায় অকার উচ্চারণের বিচারে অকার-চিহ্নিত এবং চিহ্নহীন এই দুরকম ক'রে লেখা হয়ে থাকে, ত সন্ধিসমাসে অকার-সম্পর্কিত নিয়মগুলিকে মান্য ক'রে চলতে কোনোও অস্থবিধায় পড়তে হয় না। বনজ্যোৎস্না লিখতে ন-এ অকার দেব, পারুলবনের ন হবে চিহ্নহীন; কিন্তু দুটো ন-ই আসলে অকারান্ত একথাটা শিক্ষার্থীর জানা থাকবে ব'লে, সন্ধিস্থত্রগুলিকে আয়ত্ত করবার পর বন+অন্ত যে বনান্ত, বন+ওষধি যে বনৌষধি সে বিষয়ে তার কোনোও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু যদি বলি, অকার উচ্চারণের বিচারে চিহ্নহীন এবং হস্‌চিহ্নিত এই দুরকম ক'রে লেখা হয়, বিপদের আর শেষ থাকবে না। কারণ, হসন্ত শব্দগুলির আচরণ এবং হসন্তবৎ উচ্চারণের অকারান্ত শব্দগুলির আচরণ সন্ধিসমাসে এক নয়। মূলতঃ অকারান্ত এমন অনেক শব্দ বাংলায় আছে, যারা উচ্চারণে সর্ব্বত্র সব অবস্থাতেই হসন্তবৎ। সর্ব্বত্র সব অবস্থাতেই হস্ চিহ্নিত হয়ে লেখা হলে, সেগুলিকে মূলতঃ অকারান্ত ব'লে চিনে রাখতে শিক্ষার্থীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবে। যেমন ধরুন, উপায়; কথাটা এরপর সর্ব্বত্রই যদি উপায়্ হয় তাহলে উপায়ান্তরে পৌছবার আর কোনোও উপায় থাকবে কি? উদার যদি উদার্ হয়ে যান ত তাঁর কাছ থেকে উদারতা কোন্ সূত্রে আদায় করব? নীচ নীচ্ হলে তার কাছ থেকে নীচতা পাওয়াও শক্ত হবে। যে-সব শব্দ স্থানবিশেষে অকারান্ত উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে চিনে রাখাও শিক্ষার্থীর পক্ষে খুব সহজ হবে না, যেজন্যে বন্+অন্ত থেকে বনান্তে পৌছতে তার অনেক দিন সময় লাগবে।

আপদ্ (উৎপাত) আপদ (পা পর্য্যন্ত), পরভৃৎ (কাক) পরভৃত (কোকিল), বিরাট্ (সর্ব্বব্যাপী) বিরাট (মৎস্যদেশ), এই কথাগুলিতে পার্থক্য করবার আর কোনোও উপায় থাকবে না।

যদি বলি, অকার উচ্চারণ বোঝাতে অকার দেব, মূলে অকারান্ত কিন্তু অঞ্চল-বিশেষে উচ্চারণ অল্পবিস্তর-ওকার ঘেঁষা এমন সমস্ত স্থলেও অকার দেব, মূলতঃ হসন্ত এবং অন্য যে-ক'টি মুষ্টিমেয় শব্দকেও হস্‌চিহ্ন দিয়ে বানান করা উচিত * সেগুলিতে হস্‌চিহ্ন দেব, বাকী সর্ব্বত্র হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহার করব, এই হবে বিধি, ত এসমস্ত অসুবিধার একটিও আমাদের ভোগ করতে হয় না। হস্‌চিহ্ন ব্যবহার ক'রে যে কাজ দায়সারা ভাবে চলে, এলোমেলো ভাবে চলে, এবং অসংখ্য নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হয়, একটি অকারচিহ্ন গ্রহণ করলে সেই কাজ বেশ সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে চলতে পারে।

কথা উঠতে পারে, আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে একই শব্দকে স্থানবিশেষে দুরকম ক'রে আমাদের লিখতে হবে ; একবিংশের ক হবে অকারান্ত, একবারের ক হবে চিহ্নহীন ; জলধরের ল হবে অকারান্ত, জলপানের ল হবে চিহ্নহীন ; বনজ্যোৎস্নার ন হবে অকারান্ত, বনবাদাড়ের ন হবে চিহ্নহীন ; এটা খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা হবে না কি ? আমি বলব, না। একই শব্দকে দুরকম ক'রে উচ্চারণ করার ব্যবস্থাটা যদি অদ্ভুত না হয়, উচ্চারণের বিচারে দুরকম ক'রে বানান করবার ব্যবস্থাটা অদ্ভুত হবে না মোটেই। তাছাড়া একই কথাকে দুরকম ক'রে লেখা আমাদের ধাতস্থই আছে। সংগোপন-সঙ্গোপন, উদ্‌বিড়াল-উদ্বিড়াল, উদ্যোগ-উদ্‌যোগ, উল্টা-উলটা, কর্তা-কর্ত্তা একটি-একটী, বাঙালী-বাঙ্গালী, রং-রঙ, খৈ-খই, বৌ-বউ, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিকল্প-বিধান যদি চলে, এবং যে-কোনোও একটা বানান নির্ব্বিচারে লিখে দিলেও যদি ভাষার জাত না যায়, তাহলে উচ্চারণের বিচারে বিধিনির্দ্দিষ্ট-ভাবে অকারান্ত বর্ণগুলিকে দুরকম ক'রে লিখলে ভাষার জাত কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়।

সংস্কৃত ভাষার নজির ছাড়া এক পা চলতে যাঁরা নারাজ, তাঁদের বলব, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অকারান্ত ও হসন্তবৎ এই দুরকম ব্যবহার সংস্কৃতেও আছে বলা চলে। যথা, সাধারণভাবে যদিও ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রেই অকারান্ত (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এই অকার "ব্যঞ্জনবর্ণের গাত্রে লীন হইয়া অদৃশ্যরূপে থাকে"), সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি জুড়লেই তারা হসন্ত হয়ে যায়। আকার 'আ'রই সংক্ষিপ্ত রূপ, ইকার-ঈকার 'ই ঈ'-রই সংক্ষিপ্ত রূপ, তাছাড়া আর কিছু নয়, এ যদি আমরা মানি ত 'কী' বিশ্লেষণ করে আমাদের পাওয়া উচিত ক+ী=ক+ঈ=ক্+অ+ঈ ; 'সু' বিশ্লেষণ ক'রে পাওয়া উচিত স+ু=স+উ= স্+অ+উ ; কিন্তু সবাই জানেন, অদৃশ্য অকারটা বিনা বাক্যব্যয়ে লোপ পায়। সুতরাং মূলতঃ অকারান্ত বর্ণগুলিকে দুরকমে উচ্চারণ করি ব'লে দুরকম ক'রে তাদের লিখলে খুব সৃষ্টিছাড়া কিছু যে একটা করা হবে তা নয়।

তবে এটা স্বীকার করা ভাল যে, আমার প্রস্তাবিত অকারচিহ্ন গ্রহণের অসুবিধাও কিছু আছে।

প্রথম এবং প্রধান অসুবিধা যেটা, সেটা সম্পূর্ণই আকৃতিগত। অকারচিহ্নটিকে আমি যেরকম ক'রে ভেবেছি † সেটা বাংলা লিপির ধাতেরই জিনিষ, বাংলা যে ঋফলাটা কাত হয়ে বসে সেটাই যেন উপরে উঠে স্থিত হয়ে বসবে, টানালেখায় এই অকার কোনোও অসুবিধার সৃষ্টি করবে না

---

* এই ক'টি মুষ্টিমেয় শব্দকে চিনে রাখতে শিক্ষার্থীর তেমন কিছু অসুবিধা নেই, এখনও এগুলিকে চিনে রাখতেই হয়।

† অক্ষরের উপর লাইন টেনে যেখানে আমরা অক্ষরান্তরে চ'লে যাই, সেইখানে ছোট একটি v চিহ্ন···টানালেখায় লাইনটাকে অল্প একটু কাঁপিয়ে দিলেই অকার হয়ে যাবে।

এবং নূতন ধ্বনিচিহ্ন একটা যে ব্যবহার করা হচ্ছে কিছুদিন পরে কারও আর তা মনেই থাকবে না, এটাও ঠিক। কিন্তু চিহ্নটি এতটা বেশী নগণ্য হবে ব'লেই, এবং আমার প্রস্তাবিত লিপিতে কোনোও ধ্বনিচিহ্ন অন্য ধ্বনিচিহ্নের মাথায় চেপে বা পায়ের নীচে থাকতে পারবে না ব'লেই, অক্ষরসংস্থানের মধ্যে খানিকটা ক'রে জায়গা ফাঁকা রেখে এই অকার বসবে। হাতের লেখায় এ ফাঁকা চোখে পড়বে না, অকার এতটাই কম জায়গা জুড়বে। কিন্তু ছাপাতে ং, ঃ, ঁ, যফলা, মফলা এবং সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলি প্রস্থে আনুমানিক ⅓ মাত্রা জুড়বে, পূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলিকে একমাত্রা ধ'রে। সুতরাং প্রস্থে ⅓ মাত্রা আয়তনের খানিকটা জায়গা ফাঁকা প'ড়ে থাকবে অকারচিহ্নের নীচে। আমার প্রস্তাবিত লিপিতে উকার, উকার, ঋকারের উপরে এবং একার, ঐকার, ওকার, ঔকারের নীচে ঠিক এই রকমের খানিকটা ক'রে জায়গা ফাঁকা প'ড়ে থাকবে। ফলে বাংলালিপির এখনকার মত compact বা ঠাসাঠাসি চেহারাটা আর থাকবে না।

অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে, নীচের নমুনাটির থেকে পাঠক তার মোটামুটি একটা আভাস পাবেন।

"বৃষটী পড়এ টাপুর টুপুর
নদএয় অএল বান,
শীবঠাকুরএর বীয়এ হল
তীন কন্যএ দান।"
"অঐ নঔকা চড়এ দাদা
বঔ আনবএ কাল।"

আমার মনে হয়, এবিষয়ে আমার প্রস্তাবিত অকার একলা অপরাধী হবে না ব'লে, ফাঁকগুলি সর্ব্বত্র মোটের উপর সমপরিমাণে ছড়িয়ে থাকবে ব'লে, নূতন লিপির tout ensemble বা সর্ব্বময় চেহারাটা দেখতে কিছুই খারাপ হবে না।

তাছাড়া পাঠক লক্ষ্য করবেন, উপরকার মাত্রাসমাবেশের ব্যাঘাত হয় ব'লে উকার উকার এবং ঋকার ঘটিত উপরদিক্‌কার ফাঁকগুলি যতটা খারাপ লাগে চোখে, অকার, একার, ঐকার, ওকার, ঔকারের ফাঁক ততটা খারাপ লাগে না। রু লিখতে এবং হৃ লিখতে যে উকার ও ঋকার আমরা ব্যবহার করি সে-দুটাকে নিলে অক্ষরসংস্থানের ঘন-বিন্যস্ততার দিক্ থেকে আর একটু ভাল হয়, কিন্তু অপরিচয়ের হাঙ্গামা অনেক বেশী তাতে বাড়ে। উকার, উকার ও ঋকারকে উপরে তুলে নেবার সবচেয়ে বড় অসুবিধাও সেইটেই।

অকারচিহ্ন গ্রহণের দ্বিতীয় অসুবিধাটা আর-একটু জটিলতর।

হসন্তবৎ ব'লে যে বর্ণগুলির জন্যে চিহ্নহীনব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করছি তারা সকলেই যে মূলতঃ অকারান্ত তা নয়। মূলতঃ অকারান্ত নয় এমন হসন্তবৎ শব্দগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আ, ই, উ এবং এ ধ্বনির লোপ হয়ে যে হসন্তবৎ। যেমন, খাজানা-খাজনা, আলিপনা-আলপনা, ফাগু-ফাগ, একেলা-একলা। এদের সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে, এরা মূলতঃ হসন্ত যখন নয়, তখন এদের হস্‌চিহ্নিত ক'রে না লিখলেও দোষ কিছু হয় না। বাংলা উচ্চারণের যে নিয়মে অকার সংক্ষিপ্ত হতে হতে হসন্তবৎ হয়ে যায়, 'আ-ই-উ-এ'ও অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়। সেই বিচারে মূলতঃ অকারান্ত হসন্তবৎ শব্দের সঙ্গে এই জাতীয় হসন্তবৎগুলিও আসন পাবার যোগ্য।

(২) মূলে কি যে ছিল নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, এমন হসন্তবৎ। যেমন, 'আদেখলা', 'যাক'। এই শ্রেণীর কোনোও কোনোও হসন্তবৎএর স্বরান্ত হতে খুব মারাত্মক বাধা কিছু নেই এটা লক্ষ্য করবার মত। যেমন, সামনে কথাটার ম যদিও সর্ব্বত্রই উচ্চারণ হসন্তবৎ, রবীন্দ্রনাথ এর অকারান্ত প্রয়োগ করেছেন :

'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।'

সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিয়ম এই জাতীয় শব্দগুলিতে প্রযোজ্য নয় ব'লে এগুলিকে হস্‌চিহ্নিত ক'রে না লিখলেও কিছুই এসে যায় না।

(৩) মূলতঃ স্বরান্ত নয় ব'লে নিশ্চয় ক'রে জানি, হসন্ত তৎসম শ্রেণীর বাইরেকার এমনতর হসন্তবৎ। যেমন 'মামলা', 'আশমানী,' 'ঝমঝম' (ঝম্‌ঝম্‌)। এদের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে এবং আরও কয়েক জাতীয় শব্দে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করার আমি পক্ষপাতী *। বাকীগুলিতে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহারের বাধা কিছু নেই, কেননা সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিয়ম এদের বেলাতেও খাটে না ব'লে এদের আচরণ কুত্রাপি হসন্তের মত নয়।

তৃতীয় এবং আসল অসুবিধা যেটা, অকার-চিহ্ন গ্রহণের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিতান্তই গৌণ। লিপিকারের অসুবিধা বাড়াতে চাই না ব'লে আমি প্রস্তাব করেছি, অকার গ্রহণের ফলে যুক্তাক্ষর বলতে আমাদের লিপিতে কিছুই প্রায় যখন আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন, যুক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) অক্ষর যদিও মূলতঃ হসন্ত, সেগুলিকে আমরা চিহ্নহীন ব্যঞ্জন দিয়েই লিখব।

ব্যতিক্রম করব কেবল নির্, দুর্, উৎ এবং সম্ এই ক'টি উপসর্গের বেলায়; এগুলি সর্ব্বত্রই হস্‌চিহ্নিত হবে। আর, যে-সমস্ত হসন্ত তৎসম শব্দের বাংলায় স্বতন্ত্র ব্যবহার আছে, যুক্তাক্ষর থেকে বিযুক্ত হয়েও তারা হস্‌চিহ্নিত হবে। যেমন ঋগ্বেদ প্রস্তাবিত লিপিতে হবে ঋগ্‌বেদ, তড়িদ্বেগে হবে তড়িদ্‌বেগে।

কিন্তু এ ছাড়া অন্যত্র যুক্তাক্ষরবদ্ধ যে সমস্ত বর্ণকে হসন্ত ব'লে নিশ্চয় ক'রে জানি, সেগুলিকে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন দিয়ে লিখলে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে সেই হ'ল প্রশ্ন। এটা

---

* দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা,—কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪, "বাংলা বানানে অ এবং অকার", পৃ. ৮৫-৮৬।

ঠিক যে যুক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) বর্ণকে হস্‌চিহ্নিত না ক'রে লেখাটা এক হিসাবে মিথ্যাচারের সামিল হবে। যেমন, ধরুন, 'বন্ধ' কথাটার মধ্যেকার ন। এটা বাস্তবিকই হসন্ত ; বন্ধ্ থেকে বন্ধ এবং বন্ধ্‌কে বিযুক্ত ক'রে লিখতে হলে বন্‌ধ্-ই লেখা উচিত। কিন্তু যেহেতু 'বন্ধ্' বা 'বন্'-এর সঙ্গে আমাদের আলাদা ক'রে কিছু কারবার নেই, তাই 'বন্'কে 'বন' লিখলে সন্ধি-সমাস ইত্যাদি নিয়ে কোনোও গোলযোগে আমাদের পড়তে হয় না। তাছাড়া, পূর্ব্বেই বলেছি, পদমধ্যবর্ত্তী হসন্তের সঙ্গে পদমধ্যবর্ত্তী হসন্তবৎ-এর উচ্চারণগত পার্থক্যও খুবই অল্প।

চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহারের অসুবিধা কিছুই নেই, লিপিকারেরও তাতে অনেকখানি মেহনত বাঁচে, এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। তৎসম যে হসন্ত শব্দগুলি বাংলায় চলে সেগুলি সংখ্যায় খুব বেশী নয়, শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলিকে চিনে নিয়ে মনে রাখা সহজ। অন্য যে-সমস্ত শব্দকে হস্‌চিহ্ন দিয়ে বানান করতে চাই সেগুলিকে চিনে রাখা আরও সহজ। কিন্তু বাংলায় যুক্তাক্ষর-সম্বলিত শব্দ অসংখ্য, সেগুলিকে চিনে রেখে নির্ভুলভাবে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করতে হলে শিক্ষার্থীরা চোখে সরষে ফুল দেখবে।

এইসব নানাদিক্ বিচার ক'রে, আমার প্রস্তাবিত ব্যতিক্রমের স্থলগুলি ভিন্ন অন্যত্র, যুক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) অক্ষরকে বিযুক্ত অবস্থায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জন দিয়ে বানান করাই আমি বিধেয় ব'লে মনে করি। এই একটা বিষয়ে অন্ততঃ বিকল্প-ব্যবস্থাও হয়ত স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে।

হট্টশ্রী

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হট্টশ্রী কথাটি আমারই মনের একটা মোলায়েম প্রচেষ্টা মাত্র।

সাধারণ ব্যবহারে আমরা হাট-বাজারেরই উল্লেখ করে থাকি। আর সে হাট-বাজারে না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়া যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক কদর্যতাকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত করে দেয়। আগেকার দিনে হট্টের মধ্যে যেটুকু শ্রী ছিল, সেটুকু আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু গোল। কেন এই রূপান্তর হয়েছে, সেই কথাটা বলি।

'হাটে-বাজারে' কথাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন ক'রে ফেলেছি যে ওর সঙ্গে ধামা আর ছালা আর থ'লের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ঠ অন্বয়, ভনভনে মাছি এবং পচা ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ। কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে আসে একটা অনৈক্যতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাট্‌খারার মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদরির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তীক্ষ্ণ প্রয়াস— এবং সর্বোপরি মাছের আঁসটে জল, ডাবের খোলা এবং কলার খোসার স্তূপীকৃত আবর্জনা বাঁচিয়ে কনুই ঠেলে পিছল পথে অগ্রসর হওয়ার করুণ চিত্র। এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী রকমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেই দুঃস্থ মনোভাবকে আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাই। সাহিত্যে তো নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচির, এবং গ্লানিকর।

তাই যে-সব নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য বিড়ম্বনা এবং তারই আনুষঙ্গিক বাস্তব পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁরা আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্মীয়, অভাবে ঠাকুর-চাকরদের হাতে দোকান-বাজারের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজেই মনোনিবেশ করেন। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে তাঁরা গঞ্জনা শোনেন মাত্র, কিন্তু সংসারের ক্লান্তিকর ঝামেলা থেকে তাঁরা একরকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর সংসারের যাবতীয় কাজ ঘাড়ে আপনি এসে চেপে বসবে। তাই মেরুদণ্ডহীন হয়েও মেরুদণ্ড সোজা রাখা একটা বিশিষ্ট শিল্প। আমি এই শিল্পসাধনা করে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর আমাকে এখন কোনো কাজ করতে অনুরোধ জানায় না, পাছে সব ভণ্ডুল করে দিই। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি হলেই হয় না, চক্ষুর স্তিমিত এবং মুদ্রিত ব্যবহার আত্মশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। তা ছাড়া প্রত্যেক ঘরেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, নিঃশব্দ পরোপকারের চেয়ে সঘোষ শিক্ষা দানেই যাঁর পারমার্থিক আনন্দ। ভেবে দেখুন, ঘরে যদি ছোটোমামা, সেজকাকা অথবা মেজোপিসেমশাইয়ের অযাচিত অকৃপণ সাহায্য স্থলভ হয়, তা হলে কোন্ ভদ্রসন্তান সকালে দ্বিতীয় দফা চা-পানান্তে বেলা ন'টা পর্যন্ত কিছুই না করে বিশুদ্ধ স্ফূর্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে না ওঠেন? নিদেনপক্ষে, সর্বকর্মপটীয়সী গৃহিণী তো আছেন। তা হলে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আপনি যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রেরিত হয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা নিরুপায়, নিঃসহায় এবং নিরভিভাবক, তাঁদেরই সহ্য করতে হয় হাট-বাজার করার প্রাণান্ত দুর্ভোগ। তাঁদের কাছে হাট-বাজারের অর্থই হল একটা বিশ্রী রকমের দৈনন্দিন দায়িত্ব, যেটা উদরের ইন্ধনস্বরূপ হলেও রসনায় ঠিক রস সঞ্চার করে না। যাঁদের বাজারে বেরবার দরকার করে না অথবা প্রথম দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাঁরা সরকার দরোয়ান নিয়ে মোটরে মার্কেটে গিয়ে আপনারই হাতেগড়া আভিজাত্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখেন তাঁদের দৃষ্টিটা হল স্বতন্ত্র, দুনিয়ার উপর অনুকম্পার দৃষ্টি। আর যাঁরা দুই দলের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ফরমায়েসমতো সৌখিন 'শপিং' করেন আবার প্রয়োজন হলে ঝি-চাকর-পালানোর দুর্দিনে সন্ধ্যায় কাঁচা সবজির বাজার সেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি না কামিয়েই মাছের পাত্রটা হাতে করে বাজারে ছুটতেও তেমন দ্বিধা বোধ করে না, তাঁদের মনোভাবটা হল খাঁটি মধ্যবিত্তের— অর্থাৎ কিছুটা বিব্রত, কিছুটা নির্বিকার, খানিক বিরক্তির, খানিক কৌতুকের। হরেক রকল ঝকমারির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হলেও, এঁদের চোখে থাকে তির্যক্ সহিষ্ণুতা, মনটাও থাকে জাগ্রত। তাই এঁরা দেখেন ও শেখেন বেশি।

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নয়। হাটে-বাজারে নিত্য চলন্ত আর জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্য ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁরা তো এই হট্ট-লব্ধ মানবচরিত্রজ্ঞানকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর যাঁরা রচনাকুশলী, হট্টশ্রীতে আস্থাবান্, তাঁদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তো মিলবে এইখানেই। হট্টমনের বিচিত্র স্পন্দন যাঁরা ঠিকমতো ধরতে পারেন, তাঁরাই তো সত্যিকারের জননায়ক। আর যাঁরা নিখিল হট্টমন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই তো নির্জাতিক যাযাবর, খাঁটি মুসাফির।

বর্তমানে হাটের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের এটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পণ্যই যখন মুখ্য, মানুষ তখন গৌণ। রূঢ় দ্রব্য যখন কারু-পণ্যে পরিবর্তিত হয়, হট্টশ্রী তখন রূপান্তরিত হয় বিপণি-সজ্জায়। তাই হাট-বাজার আর দোকান-পসারের মধ্যে আছে অনেকটা পার্থক্য। প্রথমটায় আছে গতির আভাস, দ্বিতীয়টিতে স্থিতির। একটি হল যাযাবর মানুষের ও মনের প্রতীক, অপরটি হল স্থাণু, নিশ্চিত ও নিরাপদ মনের পরিচয়। একটিতে পাই ধুলো আর মাটি আর খোলা আকাশ; অপরটিতে গদি অথবা কেদারা এবং বিজলি পাখা। শতবার হাটে ঘুরে বেড়ালেও তাকে আমরা বাঁধতে পারি না, আয়ত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে। কিন্তু দোকানকে আঁকড়ে রাখি তালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর 'নিয়ন' লাইট দিয়ে। হাট যখন ভাঙে, গোধূলির আলোয় তার ভাঙা চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বট-পাকুড়ের শাখায় বাদুড়ের কিচিমিচি, জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে শূন্য গুড়ের কলসীগুলোর গড়াগড়ি, আলকাত্‌রা-মাখানো জীর্ণ দু-একটি দরজায় বাতাসের অদ্ভুত আওয়াজ আর ঘনায়মান অন্ধকারে উপুড়-করা কালো কালো মেটে হাঁড়িগুলো এমন একটি অতিনৈসর্গিক রিক্ততার ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহরের নির্জনতম পথে বন্ধ দোকান-পাটের গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু প্রকৃতি-পটভূমির গুণ নয়, দ্রব্যেরই গুণ। হাট যতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোষণা। আবার মৃত্যু যখন নামে, সম্পূর্ণ তার পরিসমাপ্তি— নীরন্ধ্রতার অবলুপ্তির অন্ধকার। দোকান-পাট কিন্তু মরেও মরে না। তাদের চেহারা ভয়াবহ রকমের নিঃস্ব লাগে না। তারা মূর্ছিত মাত্র; নাগরিক জীবনের স্তিমিত

ধারায় তারা ঝিমিয়ে থাকে। একটিতে রয়েছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার জটিল ছাপ।

দু-জায়গাতেই অবশ্য দরাদরি চলে। কিন্তু যে মানুষ হাটে গিয়ে ঝিঙের দর আগুন বলে ফড়েকে হুমকি দেয় কিংবা মেছুনিকে সোনার নিক্তিতে ওজন করতে দেখে ঝাঁ করে দুটো কুচোচিংড়ি থলের মধ্যে পুরে নেয়, সেই ব্যক্তিই দোকানে গিয়ে বাঁধা দরের অতিরিক্ত সেলামি দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আদ্দির থান অথবা বিলিতি সিগ্রেট। রসিদ চাইবার দরকারও বোধ করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম-কষাকষি চলে কিন্তু দু-এক পয়সা নিয়ে অভব্যতা কিংবা হট্টগোলের সৃষ্টি খুব কমই হয়ে থাকে। তা ছাড়া হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচয় মানুষের মুখে আর সবুজের ডালায়,— চাষীদের স্বেদসিক্ত পেশীবহুল দেহে আর নধর আনাজের শ্যামশোভায়। সেখানে ছড়ানো থাকে পসরা, চলে বেসাতী। দোকানে মজুত থাকে মাল। নিখুঁত ভাবে সাজানো থাকে প্রসাধনের ডালি। সেখানে কোলাহল নেই কিন্তু অন্তরঙ্গতার অভাব। হাটে গেলে আমরা হাঁটি, ভদ্র দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিছক ঘুরে বেড়াই। গণতান্ত্রিক বিচরণের ফাঁকে অবসর মতো জিনিস দেখি, দর শুনি, যাচাই করি। তারপর মনের মতন সওদা না পেয়ে হয়তো শুধুহাতেই ঘরে ফিরি। দোকানে কিন্তু জিনিস কিনতে এসে আমরা ভদ্রমাফিক কায়দায় কথা বলি, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাঁচের পাল্লায় দেখি নিজেদেরই লোলুপ প্রতীক্ষমান দৃষ্টি। দরদস্তুর একটু আধটু করি বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আর কিছু না কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি না। তা হলে স্বল্পায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের বিস্তৃত সাদৃশ্যের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই ষোলো আনা।

এ কাজ বরঞ্চ পারেন এবং, দু-একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেয়েরা। দোকানদার হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনো মহিলার সামনে। কিন্তু কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। কাঁচা সেল্স্ম্যান মরিয়া হয়ে এটা পাড়ছে, ওটা দেখাচ্ছে আর মনোরঞ্জনের আশায় অজস্র বাক্য ব্যয় করছে। কিন্তু খদ্দেরের অন্যমনস্ক চোখে কোনো রঙই ধরছে না। অবশেষে স্তূপাকার জিনিস পাড়িয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটা বেছে নিয়ে বললেন: "এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই, নতুন ধরনের? দামটাও শস্তা মনে হচ্ছে যেন— কী জানি, খেলো জিনিষ ব্যবহার করি নি তো কখনো!" হল অ্যাণ্ড্ অ্যাণ্ডার্সনে অ্যাকাউণ্ট্ আছে জেনে আর সেজো ভাইয়ের পিস্শ্বশুর হাইকোর্টের জজ শুনে সেল্স্ম্যান যখন অভিভূতপ্রায়, তখন অনুকম্পার হাসি হেসে হয়তো মহিলাটি বলে ওঠেন: "দিন ঐটেই। কী আর করা যাবে! সরেস জিনিস কিন্তু স্টক করবেন এবার থেকে। নজরের কাছে দামের প্রশ্ন কিসের?"

তারপর ক্যাশ-মেমো যখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগটা সশব্দে বন্ধ করে তিনি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন: "আবার সেল্ ট্যাক্স ধরছেন কেন? এই তো জিনিস আর এই দোকানের ছিরি···!" বলেই অত্যন্ত বিরক্তিভরে বেরিয়ে যান।

কাউন্টারের পেছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন: "তুমিও যেমন ছোকরা! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্যা···"

তরুণ সেল্‌স্‌ম্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো সরিয়ে গুছিয়ে রাখে। পুরুষ খরিদ্দার হলে ব্যাপারটা কী রকম অপ্রীতিকর দাঁড়াত, তাই ভেবে শিহরিত হই আর মহিলাটির নিপুণ দুঃসাহসে চমৎকৃত হই।

পুরুষরাও কিছু বাদ যান না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়ে থাকে। মেয়েদের যেমন নিজস্ব ডিপার্টমেণ্ট্ আছে— শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেখি তাঁদের নিত্য আনাগোনা; পুরুষদেরও তমনি স্বকীয় বিভাগ আছে— যেমন জামাকাপড় জুতো বই সিগ্রেট কিংবা মনোহারী দোকান। সেখানে দেখি তাঁদের দরস্তর করবার ক্ষমতা এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে লম্বা বিলের পাওনা না মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাকিব নৈপুণ্য।

কিন্তু সে কথা যাক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে হাটের হট্টচরিত্র ঘুচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর ঝাঁপলাগানো দোকান রূপান্তরিত হয়েছে কোল্যাপ্‌সিবল্-গেট-দেওয়া ফ্যাশনেব্‌ল্ মার্ট্ বা মার্কেটে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শপিং-এর ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের এলাকা আর পৃথক ভাবে চিহ্নিত নেই। প্রৌঢ়া মহিলারা সন্ধ্যার পর অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন। বেশভূষাটা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভদ্র এবং মার্জিত, এই যা তফাৎ। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মূলো আলু পটল আর লাউকুমড়ো এবং বোঝার ওপর শাকের আঁটি বয়ে বেড়ায়। একটি পয়সাও দস্তুরীবাবদ ট্যাঁকে যেতে পায় না। অবিশ্যি এক হিসেবে এ ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে। কী দিয়েই বা সকালের রান্না, আর কোন্ কোন্ তরকারি বা রাতের বরাদ্দ, পুরুষদের আর মেয়েদের জন্য কী রান্না আলাদা হবে বা হওয়া উচিত, কোন্ অনুপানের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ব্যঞ্জনের উপকরণ নেওয়া যায়, এটা মেয়েরাই তো বেশি বোঝেন। প্ল্যানিং-এর অঙ্গ-স্বরূপ ছকটা তাঁদেরই হাতে। তা ছাড়া, লাউ রান্না হবে আমিষ না নিরামিষ, আমিষ হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা কাঁকড়া-সহযোগে, এ-সব কথা পুরুষরা কী করে জানবেন? তাঁরা জানেন হাটের দর, রাখেন হাটের খবর। কিংবা ছোটো বৌ ট্যাংরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, বড়ো গিন্নী শিম-বেগুন-বড়ি ভাতে খেতে ভালোবাসেন, আর সেজদি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাঁকড়া ছোঁন না— এত গুহ্য ঘরের খবর মনে রাখবেন কী করে?

তা ছাড়া, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি মেয়েরা সত্যিই হাট-বাজার করেন ভালো। বাজে পয়সা নষ্ট না করে, একসঙ্গে অনেক সবজি না কিনে এবং সংসারের সাশ্রয় করে তাঁরা যেমন পরিপাটি বাজার করেন, পুরুষরা তেমন পারেন না। পুরুষ বাজারে যান আসেন যন্ত্রের মতো। একই সজনের ডাঁটা অথবা থোড়-বড়ি কিনে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই। নারী চলেন ধীরে মন্থরে। পাঁচটা জিনিস দেখেন-শোনেন, যে পটলওয়ালা ডাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান, দর করেন, মনে মনে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তো বলেন: "এই পটল বাছাই ক'রে দিলুম। সাত আনার বেশি সের দেব না-- আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্তু। তোলো পাঁচ পো।" 'পাষাণ ঠিক আছে মা,' বলতে গিয়ে পটলওয়ালা গৃহিণী-সুলভ ভ্রূকুটির এমন ধমক খায় যে সেই নির্মম পাষাণদৃষ্টির সামনে নতমুখে পাল্লা ফিরিয়ে ওজন না করে সে পথ পায় না। দাম দেবার সময় দেওয়া হল ন' আনা। বাকি পয়সাটা ফেরৎ না নিয়ে তিনি পাশের ডালাখানির দিকে ইঙ্গিত করবা মাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি

এক মুঠো কাঁচা লঙ্কা তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হয়তো মনঃপূত হল না— যদিও তাতে জন পাঁচেক বলিষ্ঠ পুরুষের পাকস্থলী অনায়াসেই জর্জরিত হয়ে যেতে পারে।

যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাজার করে থাকেন, তাঁরা সবজি কিনতে গিয়ে এক-আধ পয়সা বাঁচানো কিংবা অযথা সময় নষ্ট করা ভালোবাসেন না। তাঁদের নজরটা মাছ-মাংস এবং ফল-মূলের ওপরই যেন বেশি। অনেক বাড়িতেই অবসর প্রাপ্ত কর্তা-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজকালকার ছেলেছোকরাদের সাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর তাঁদের প্রচুর অবজ্ঞা। নিত্য বাজার এঁরা নিজ হাতেই করে থাকেন। সে ভারটি আর কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস করে ছাড়তে পারেন না। পচা ভাদ্দরে বেশি রোদ্দুর লাগলে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে বলে তাঁরই শরীরের খাতিরে দাপট-যুক্তা গৃহিণী যদি বাজারে বেরতে তাঁকে কোনোদিন অনুমতি না দেন, তাহলে সারাটা দিন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে আর সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন।

বাজার করার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তিনি সেই রকম জিনিষ কিনে থাকেন। অর্থাৎ যাঁর অগ্নিমান্দ্যের প্রকোপ এবং বায়ুপ্রধান ধাত, তিনি নিত্যই কাঁচা পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা এবং সরু জিয়ল মাছ কেনেন। আর যাঁর স্বাস্থ্য ভালো, হজমশক্তি অটুট, তিনি পোস্ত এঁচড় ডিম মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতী। কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিয়ে বাজার করেন, অধিকন্তু ফেরবার পথে মোড়ের দোকান থেকে গৃহিণীর জন্য পান আর আচারটুকু নিতে ভোলেন না। কেউ বা আবার একটু বে-হিসাবি, লুকিয়ে পকেট থেকে ডেফিসিট পুষিয়ে দেন। সতেরো সিকের ভোম্বল-মার্কা কাৎলাটাকে হাসি-হাসি মুখে সতেরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে। শস্তায় মাছ কেনার কৃতিত্বে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তাঁর মন তখন খাবি খাচ্ছে। এই কম দামে জিনিস পাওয়া আর আড়ৎ থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভদ্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এরই আকর্ষণে শ্যামপুকুর থেকে বাঁড়ুজ্যে মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়োবাজারের দরে ঝাড়াই মশলা, ডাল, সুপারি আর বাল্‌তি-কড়াই কিন্‌তে। ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাড়ি দেন বেলগেছের খাল-ধারে চূণ আর ভূষি মাল খরিদ করার জন্যে, আর চাঁপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাত-কাটা ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেঁধে ধাওয়া করেন চেৎলার হাটে মশারির থান, বিচুলি, সরু চিঁড়ে আর বঁড়শির শক্ত সুতোর সন্ধানে। বালিগঞ্জ কিংবা রীজেন্ট্‌স্‌ পার্কের মিঃ বাসুকেও কখনও কখনও ছুটতে হয় বৈকি ঘরোয়া তাগিদে হাওড়ার হাটে শস্তায় গামছা এবং তাঁতের রকমারি শাড়ির নতুন নতুন পাড়ের আশায়।

আজকাল দেখতে পাই— মেয়েরা যাচ্ছেন সবজির বাজারে, মাংসের স্টলে, কিংবা জামা-কাপড়ের দোকানে পুরুষদের জন্য শার্ট্‌ ও স্যুটের বায়না দিতে। পুরুষরা যাচ্ছেন শাড়ি গহনা কিংবা ক্রকারি কিনতে। কখনও একলা, কখনও যুগলমূর্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দোকানে গিয়ে একটু বসবার সুযোগ সুবিধা থাকে, দেখবেন নজর ক'রে ঈশ্বরের কী বিচিত্র সৃষ্টি! কত হরেক রকমের 'টাইপ্‌' ও 'ক্যারেক্‌ট্যর' আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের ভিন্নমুখী

প্রকাশ নিত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কত স্বার্থপরতা, লোলুপতা, প্রবঞ্চনা আবার ভদ্রতা ও সততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে হাট-বাজারে, দোকান-পসারে। দোকানে ঢুকে দাঁড়ানো আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই আপনি সেই মানুষটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাজ, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দুর্বলতা অনুমান করতে পারেন। কত পারিবারিক সংবাদ, এমনকি অনেক গোপন তথ্য পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে অনুচ্চ কণ্ঠে দুই খরিদ্দারের আলাপ-সূত্রে। এক কাঠিম সুতো কিনতে গিয়ে বাজারে শুনতে পাবেন অনেক কিছু, চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবেন তারও বেশি। স্থানীয় পাঠাগার ও চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মাতব্বরদের সমালোচনা, রেস এবং ফুটবল খেলা, স্বদেশের মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশের গূঢ় রাজনীতি পর্যন্ত অনেক কিছুই আলোচিত হয়ে থাকে বেশ তারস্বরেই। স্ত্রী পুরুষের কত বিভিন্ন ধরণের হাসি বা চলার ভঙ্গি, কত লাস্যলীলা, কত মূর্খ গাম্ভীর্য, অসহিষ্ণুতা, চতুরতা অথবা চটুলতার নমুনা পাওয়া যায় প্রকাশ্যভাবে। তাই হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো কিছু পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবন-যাত্রার দৃশ্যমান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে না কি, খানিকটা মজার, খানিকটা ভেবে দেখবার ?

হাট কথাটারই মধ্যে রয়েছে এমনি একটা স্থূল বাস্তবের স্পর্শ যে আমরা একে এড়িয়ে যেতে চাই। ওর মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য গুজব আর উড়ো খবর, দাঁও কষা কিংবা লাটে ওঠা— অর্থাৎ বণিক্-বৃত্তির অপ্রীতিকর অংশটা। এক কথায় ওর মধ্য দিয়ে যেন ফুটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের যাবতীয় গ্লানি আর কায়ক্লেশ জীবিকার যত-কিছু জটিলতা এবং অসহায়তা। কিন্তু হাট জিনিসটা কি সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অনুকম্পারই উদ্রেক করে, আর কিছু নয় ? ওর মধ্যে কি কোনো ঐতিহ্যের স্মৃতি নেই ?

এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে দেখুন। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান-আমল পর্যন্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত আমদানি আর রপ্তানি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো গঞ্জ, শহর এবং বন্দরগুলিতে। উজ্জয়িনী, সূর্পারক, ভৃগুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র, মথুরা, বৈশালী, ধারা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে কিসের আদান-প্রদান চলেছিল ? রোম্যান স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কাদের বৈশ্যবৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন করেছিল ? কাদের সঞ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য এবং শিল্পকীর্তি ? মধ্যযুগে আরব বণিক্‌রা পৃথিবীর হাটে ঘুরে ঘুরে কোন্ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল ? আর দিল্লি আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের বিদেশী বণিক্‌দল কী রোমান্সের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত ? য়ুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা যখন বর্ম এঁটে খৃস্টান তীর্থ-ত্রাণে স্থলপথে অভিযান সুরু করতেন, পথে রসদ যোগাত কারা ? য়ুরোপের হাটে-মাঠে-মেলায় কোন্ সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল ? বাণিজ্যকেন্দ্র নগরগুলি কেমন করে বড়ো আর স্বাধীন হয়ে মধ্যযুগের শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারে সহায় হয়েছিল ? মধ্য জার্মনি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে, দক্ষিণ ফ্রান্সের আঙুর-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্য-মেলায় কোন্ কাব্য-নাট্য-সংগীতের উৎস খুলে গিয়েছিল ? আমাদেরও গ্রামের হাটে আর মেলায় যে-সব লোক-শিল্প-সংগীতের নমুনা পাওয়া যেত, সেগুলির পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্য ? ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে একদিন যে বিরাট্ বাণিজ্যের বসতি ছিল, শ্রীহট্ট নামটি কি তারই স্মৃতি বহন করে আজও কমলা-মধু, আনারস.

নানাবিধ আনাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চুণ, সুগন্ধ মশলা-পাতি এবং বড়ো বড়ো সুপারির ছালা সুরমা নদী দিয়ে রপ্তানির কারবার চালায়? কৈশোরে একবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে বড়োদলের হাট দেখেছিলুম। নোনা গাঙের মধ্যে জলে-ভাসা দ্বীপের মতন ঘিঞ্জি জায়গায় সেই বিপুল হাটের দৃশ্য-স্মৃতি আমার মনে আজও যেমন অম্লান, রাজরোপ্পার পথে ছোট্ট একটু ঢালু জমিতে আদিবাসীদের অকিঞ্চিৎকর হাটের চঞ্চল আয়োজনটুকু বড়ো বয়সেও তেমনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

হাটের অর্থই হল বাহুল্য— যে বাহুল্য আসে তার অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে। কোনো-এক নির্দিষ্ট দিনে অনেক দ্রব্য, অনেক মানুষের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের অথবা কয়েকদিনের জন্য। তারপর হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়। সেই নিঃশেষিত অস্তিত্বের কিছুটা রঙ লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি নৌকার জীর্ণ পালে, ঘরে-ফেরা হাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপে, প্রতীক্ষমান চোখের ম্লান দৃষ্টিতে। তাই মনে হয়, হাট বোধ হয় শুধু মরানদীর একটুখানি চলাচলের স্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্যবৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা আদানপ্রদানের ধূলিমলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার একটুখানি অবকাশ। তা যদি না হত, তা হলে একাধিক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে হট্টশ্রী তার স্থূলতার আবরণ সরিয়ে একটা কিছু সারবস্তুর সন্ধানে তাঁদের এতটা আকৃষ্ট করত না। আর এই বিশাল জগৎ একটি বিপুল হট্টমন্দিরের মতন প্রতিভাত হয়ে তার বিচিত্র পসরা আর বেচা-কেনার বহু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মারফৎ একটি বৃত্তের অখণ্ড সত্যরূপের পরিচয় তাঁদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা হাটকে কোমল হট্টশ্রীতে মণ্ডিত করে যদি না-ও দেখি, তবু তার মধ্যে যে সহজ কৌতুক, রসগ্রহণ, শিল্পবোধ এবং বাস্তবজ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করবার সুযোগ পাওয়া যায়, সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

স্বীকৃতি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'রাজপুত্তুর' চিত্রের ব্লক মাসিক বসুমতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য ও তথ্যপ্রধান আলোচনা
এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে

কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে মানসীই (১৮৯০) তাঁর প্রথম যথার্থ কাব্য। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী কড়ি ও কোমলকেও (১৮৮৬) তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে এই সময়েই তাঁর কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এবং সেখানে শুধু আকাশে মেঘের রং নয়, মাটিতে ফসলও দেখা দিয়েছে। কড়ি ও কোমলের ছন্দ সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তিই প্রযোজ্য। এক জায়গায় কবি বলেছেন, "মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে" (ভূমিকা, রচনাবলী-সংস্করণ)। কিন্তু অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, কড়ি ও কোমলে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরে ওঠবার চেষ্টা করেছে (জীবনস্মৃতি)। বস্তুত ছন্দের নানা খেয়াল রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই তাঁর মনকে অধিকার করেছে। সন্ধ্যাসংগীত, ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যে তার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। কড়ি ও কোমলে ছন্দের এই অবিরত পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছন্দো-বিবর্তনের ইতিহাসে কড়ি ও কোমলের স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

আধুনিক কালে বাংলা ছন্দোরচনায় তিনটি প্রধান রীতি— সরল কলামাত্রিক (বা মাত্রাবৃত্ত), জটিল কলামাত্রিক (বা যৌগিক) এবং দলমাত্রিক (বা লৌকিক)। তার মধ্যে প্রথমটি সম্পূর্ণরূপেই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শব্দের আদি মধ্য ও অন্ত-স্থিত সমস্ত রুদ্ধদল (closed syllable)-কে দুই মাত্রা বলে গণনা করা। এই রীতি সুনিশ্চিতভাবে প্রথম দেখা দেয় মানসীতে। কিন্তু তার সূচনা হয় বহু পূর্বেই। কড়ি ও কোমলে কবির ছন্দশ্রুতিতে কতকটা অব্যবস্থিততা সত্ত্বেও এই রীতি সফলতার খুবই কাছাকাছি এসেছে। এই রীতির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ছয় মাত্রার পর্ব। প্রাক্‌মানসী যুগে ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্য-স্থিত রুদ্ধদলকে দুই মাত্রার মূল্য দেবার রীতি ছিল না। অথচ ছয় মাত্রার পর্বে ও-রকম রুদ্ধদলকে এক মাত্রার স্থান দিয়ে কবির কান প্রসন্ন হত না। তাই কড়ি ও কোমলে ছয় মাত্রার পর্ব ব্যবহারে একটা লক্ষণীয় কুণ্ঠা দেখা যায়। ও কাব্যে ষণ্মাত্রক পর্বের রচনা আছে মাত্র দশটি; তার মধ্যে কেবল একটিতেই (আহ্বানগীত) তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুযায়ী একমাত্রক রুদ্ধদলের অকুণ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তিনটিতে (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ— ম্যুর, বিলাপ[১], আকাঙ্ক্ষা) শব্দের অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদল একেবারেই বর্জিত হয়েছে এবং চারটিতে (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ— রসেটি ১-২, পাখির পালক,

---

১ এই কবিতায় 'তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ' পদের অনুক্ষণ শব্দটি লঘু প্রযত্নে উচ্চার্য, অর্থাৎ এটিতে ধ্বনিসংঘাত বর্জনীয়। মানে এর উচ্চারণরূপ অনুখন, অনুক্‌খন নয়। সুতরাং রুদ্ধদল-স্বীকারের অবকাশ নেই।

বঙ্গবাসীর প্রতি) উক্তপ্রকার রুদ্ধদল একান্তই বিরল। বাকি দুটিতে (বিরহ[১], গান) অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ দেখা দিয়েছে। যথা—

কত শারদ যামিনী | হইবে বিফল |
বসন্ত যাবে | চলিয়া।

—বিরহ

বসন্ত শব্দের সন্ দলটির দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। বস্তুত এই বিরহ কবিতাটিকেই আধুনিক কালের প্রথম সরল কলামাত্রিক রচনার গৌরব দিতে হয়। এই ছন্দোরীতিটি মানসীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বটে, কিন্তু কড়ি ও কোমলের বিরহ কবিতাটিতেই তার প্রথম নিখুঁত নিদর্শন পাওয়া যায়। মানসী-যুগের প্রথম সরল কলামাত্রিক কবিতা 'ভুলভাঙা'র রচনাকাল হচ্ছে বৈশাখ ১২৯৪ (১৮৮৭)। বিরহ তার কয়েক মাস পূর্বেই 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৩ (১৮৮৬) সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্গভূমির প্রতি এবং গান, এ দুটি রচনাও মূলত ষণ্মাত্রপর্বিক। কিন্তু প্রথমটিতে প্রধানত গানের ছন্দের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে বলে কাব্যছন্দের নীতি নানাভাবেই লঙ্ঘিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে সরল কলামাত্রিক রীতি অনুসৃত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু দুই জায়গায় (আমার ঘরে এবং আমার কথা) লৌকিক কায়দায় অন্ত্য রুদ্ধদলের সংকোচন স্বীকৃত হয়েছে। এটা ছন্দের নীতিবিরোধী। তবে গানের সুরে বসানো বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এখানেও বাঁশিস্বর শব্দে ধ্বনিসংঘাত বর্জনীয়।

এই প্রসঙ্গে 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' ইত্যাদি রচনাটিরও বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। এর প্রত্যেক স্তবক উনমাত্রিক পয়ার ও চৌপদীর সমবায়ে গঠিত। এটিতে যে বিশেষ ছন্দোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী কালে 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' ইত্যাদি কবিতাটির দ্বারা তা সুপরিচিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, উনমাত্রিক ছন্দোবন্ধের প্রবণতা হচ্ছে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রতি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সরল কলামাত্রিক রীতিতেই এ-রকম বন্ধ রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহুয়া'র বরযাত্রা কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ছন্দ হচ্ছে সরল চতুষ্কলপর্বিক। কড়ি ও কোমলের যুগে এ ছন্দ উদ্‌ভাবিত হয়নি। তাই 'বিদায় করেছ যারে' কবিতার ছন্দে অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদলকে সরল কলামাত্রিক রীতিতে দুই মাত্রা বলে গণনা করা যায়নি। অথচ ওই রীতির প্রতিই তার প্রবণতা বলে এ ছন্দে উক্তপ্রকার রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে এক মাত্রার মূল্য দিতেও কবির শ্রুতিবোধ পীড়িত হয়েছে। ফলে এই রচনাটিতে ও-রকম রুদ্ধদল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়েছে। কেবল 'মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার' এই ছত্রটিতে 'পূর্ণিমা' শব্দে একটি একমাত্রিক রুদ্ধদল (পূর্) রয়ে গিয়েছে। পরিণতকালে উনমাত্রিক বন্ধের রচনায় ও-রকম রুদ্ধদল অনায়াসেই দ্বিমাত্রিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। যথা—

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।

—বরযাত্রা, মহুয়া

১ 'বাঁশিস্বর তার আসে বার বার' এই পদের বাঁশিস্বর শব্দেও ধ্বনিসংঘাত তথা রুদ্ধদল স্বীকার্য নয়, অর্থাৎ বাঁশিস্‌স্বর উচ্চারণ হবে না।

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে,
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
না জানি কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
—উদাসীন, বীথিকা

জটিল কলামাত্রিক বা যৌগিক রীতির ছন্দ নিয়েও কড়ি ও কোমলে নানারকম পরীক্ষা চলেছে। কিন্তু সে পরীক্ষা সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের মতো ছন্দোবন্ধের প্রচলিত নিয়মকে লঙ্ঘন করে পংক্তিদৈর্ঘ্যের স্বাধীনতা নিয়ে নয়। ছবি ও গানের মতো জটিল রীতির ছন্দেও লৌকিক রীতির ভঙ্গিতে শব্দান্তস্থিত রুদ্ধদলের সংকোচনের কিছু দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা,
ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
'আবার' যদি জেগে ওঠে বাছা,
কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
—শান্তি

তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা ?
কেন চায়, কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে 'পায়' না ভালোবাসা ?
—পাষাণী মা

'আবার' ও 'পায়' শব্দের রুদ্ধদল দুটি সংকুচিত। কিন্তু এ-রকম সংকোচনের পরীক্ষা বেশি নেই।

কড়ি ও কোমলে জটিল রীতির ছন্দে প্রধান পরীক্ষা চলেছে আট ও দশ মাত্রার পদপ্রয়োগ এবং সনেটরচনার বৈচিত্র্য নিয়ে।

যেসব ছন্দোবন্ধের প্রধান অবলম্বন আট মাত্রার পদ তার শেষ পদটিতে আট মাত্রা না থাকাই রীতি, তাতে ছয় মাত্রা বা দশ মাত্রাই সাধারণত দেখা যায়। কড়ি ও কোমলে দুটি দ্বিপদী (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ— সুইনবার্ন, গানরচনা) এবং তিনটি চৌপদী (মথুরায়, বনের ছায়া, বসন্ত-অবসান) বন্ধের রচনায় শেষ পদেও আট মাত্রা স্থাপিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, শেষোক্ত কবিতা-তিনটিতে চৌপদীর সঙ্গে দ্বিপদী বন্ধেরও সমাবেশ ঘটেছে।

দশ মাত্রার পদ সাধারণত পংক্তির প্রান্তেই স্থাপিত হয়, ছন্দোবন্ধের মূল অবলম্বন বলে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু কড়ি ও কোমলের অনেকগুলি রচনাতেই দশ মাত্রার পদ ছন্দোবন্ধের মুখ্য উপাদান রূপেই প্রযুক্ত হয়েছে। একপদী (যেমন : বাকি), দ্বিপদী (যেমন : পাষাণী মা), ত্রিপদী (যেমন : বিদেশী ফুলের গুচ্ছ— ওব্রে ডি ভিয়র) ও চৌপদী (যেমন : ঐ— অগস্টা ওয়েবস্টার ২), সব-রকম বন্ধই দশমাত্রক পদের যোগে গঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাঙালিনী কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, এটিতে দশমাত্রক দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদী এই ত্রিবিধ বন্ধের সমাবেশ ঘটেছে।

কড়ি ও কোমলে সনেটরচনার বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বৈচিত্র্য দ্বিবিধ—পদগঠন ও মিলস্থাপন -গত। বলা বাহুল্য জটিল কলামাত্রিক রীতির সাধারণ দ্বিপদী অর্থাৎ আট-ছয় মাত্রার পয়ার বন্ধই সনেটের প্রধান বাহন। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সব সনেটই উক্তপ্রকার পয়ার-বাহিত। সে সময় থেকেই পয়ারের এই বিশেষ মর্যাদা সর্বস্বীকৃত হয়েছে। তাই স্বভাবতই কড়ি ও কোমলের অধিকাংশ সনেটই আট-ছয় মাত্রার সাধারণ দ্বিপদীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘতর দ্বিপদীমূলক সনেটেরও কয়েকটি নিদর্শন আছে কড়ি ও কোমলে। একটি (গানরচনা) আট-আট মাত্রার, পাঁচটি (চিরদিন ১-৪, রাত্রি) আট-দশ মাত্রার এবং তিনটি (যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, সন্ধ্যার বিদায়) দশ-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীর ভিত্তিতে রচিত।

ইতালীয় সনেটে মিল দেবার একটা নির্দিষ্ট পর্যায় আছে। ইংরেজিতে মিলটনের সনেটে ওই পর্যায়ই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীঅর এবং আরও অনেকেই ইতালীয় ক্রমের অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে নানা পর্যায়ে মিল দিয়ে সনেট রচনা করেছেন। বাংলায় মধুসূদনও অনেক স্থলেই ইতালীয় ক্রমের অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অধিকতর স্বাধীনভাবে বহু বিচিত্র পর্যায়ে মিল দিয়েছেন। মিলের বিন্যাসবৈচিত্র্যে কড়ি ও কোমলের সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতার অধিকারী হয়েছে। এ স্থলে ওই বিন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী, চৈতালি, নৈবেদ্য, উৎসর্গ প্রভৃতি কাব্যে সনেটরচনার অজস্রতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। এই অজস্রতার প্রথম পরিচয় পাই কড়ি ও কোমলে। এটা এই কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সরল ও জটিল কলামাত্রিক রীতির ছন্দ হচ্ছে বাংলার বনেদি ছন্দ, অর্থাৎ সাধুসাহিত্যের ছন্দ। তার পাশে পাশেই বাংলার লোকসাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট ছন্দোরীতি প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ছেলেভুলানো ছড়াগুলিতে। তাই এই রীতির ছন্দকে অনেক সময় ছড়ার ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ ছড়াগুলিকে 'অকৃতবেশা অসংস্কৃতা' এবং তার ছন্দকে 'ভাঙাচোরা' বলে বর্ণনা করেছেন (ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য)। পরবর্তী কালে তিনিই এ ছন্দকে সুসংস্কৃত ও সুগঠিত করে সাধুসাহিত্যের আসরে সাদরে আবাহন করে এনেছেন। কথা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০) ও শিশু (১৯০৩) কাব্যে এ ছন্দ সুগঠিত হয়েছে এবং উৎসর্গ (১৯০৩-০৪) কাব্যে সাধু ছন্দের সঙ্গে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সুসংস্কৃত লোকছন্দের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর পর্বগুলি সাধারণত নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দদল (syllable) নিয়ে গঠিত। সুতরাং একে দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দ বলে অভিহিত করা যায়। এই রীতির ছন্দে প্রতি পর্বে চারটি করে দল থাকাই বহুপ্রচলিত নীতি।

কড়ি ও কোমলে লৌকিক ছন্দের রচনা আছে বারোটি। তার মধ্যে সাতটিই প্রাকৃত ছড়ার ছন্দের মতো অসংস্কৃত ও ভাঙাচোরা। তার কোনো পর্বে আছে পাঁচটি দল, আবার কোনো পর্বে আছে তিনটি বা দুটি। এসব ক্ষেত্রে ঠিক ছড়ার ভঙ্গিতেই কোথাও দ্রুত এবং কোথাও মন্থর ভাবে আবৃত্তি করে পর্বগুলির সমতা রক্ষা করতে হয়। যেমন—

গাছটি কাঁপে | নদীর ধারে | ছায়াটি কাঁপে | জলে,
ফুলগুলি | কেঁদে পড়ে | শিউলি গাছের | তলে।

—সাত ভাই চম্পা

পর্বগুলির অসমতা লক্ষণীয়। ছায়াটি কাঁপে এবং ফুলগুলি, এই দুই পর্বে যথাক্রমে পাঁচ ও তিন দল। এই অসমতা দূর করবার বরাত দেওয়া হয়েছে আবৃত্তিকারকে। ছড়ার ভাঙাচোরা ভঙ্গি সব চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে পুরানো বট এবং খেলা কবিতা-দুটিতে। বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বাঁশি এবং সারাবেলা এই তিনটি রচনায় ভাঙাচোরা খুবই কম। আর, মা-লক্ষ্মী এবং তুমি কবিতা-দুটিতে ছড়াসুলভ ভাঙাচোরা ও অসমতা সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়েছে। সুতরাং এ দুটিকে পরবর্তী কালের সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত দলমাত্রিক ছন্দের পর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য করা যায়।

শুধু তাই নয়, দলমাত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন আয়তনের দ্বিপদী প্রভৃতি বন্ধ রচনার দৃষ্টান্তও আছে কড়ি ও কোমলে। আট-ছয় মাত্রার সাধারণ দ্বিপদী বা পয়ার (যথা— বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর) তো আছেই, আট-আট এবং দশ-দশ মাত্রার (যেমন— মা-লক্ষ্মী এবং আকুল আহ্বান) দীর্ঘতর দ্বিপদীও আছে। অপূর্ণপদ চৌপদীর দৃষ্টান্ত-হিসাবে পুরানো বট এবং পূর্ণপদ চৌপদীর দৃষ্টান্তরূপে সারাবেলা কবিতার উল্লেখ করা যায়। আর, তুমি কবিতাটিতে খণ্ডিত পদ প্রয়োগের ফলে যে বিচিত্রতা দেখা দিয়েছে তা কারও কানকেই এড়াতে পারে না।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ রূপই পরিণত অবস্থায় প্রথম একত্র প্রকাশ পায় কথা কাব্যে (১৯০০) এবং তার পরে উৎসর্গ কাব্যে (১৯০৩-০৪)। কিন্তু তার বহু পূর্বেই কড়ি ও কোমলে (১৮৮৬) তিন রীতির ছন্দেরই (অবশ্য অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থায়) একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এটাও এই কাব্যের ছন্দোগৌরবের পরিচায়ক। এই হিসাবে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্য থেকে কড়ি ও কোমল সমৃদ্ধতর।

রবীন্দ্রছন্দের একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা হচ্ছে অতিপর্ব (Anacrusis) প্রয়োগের দ্বারা কোনো বিশেষ ছন্দের অভ্যস্ত স্পন্দে অভিনবত্ব জাগিয়ে তোলা। কড়ি ও কোমলে সরল কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক এই উভয় পদ্ধতির ছন্দেই অতিপর্ব-প্রয়োগের অতি সুষ্ঠু নিদর্শন আছে। সরল কলামাত্রিক পদ্ধতিতে বিরহ, বিলাপ ও আকাঙ্ক্ষা, এবং দলমাত্রিক পদ্ধতিতে তুমি, এই চারটি রচনায় অতিপর্ব প্রযুক্ত হয়েছে। চতুর্থটিতে অতিপর্ব যে স্পন্দবৈচিত্র্য জাগিয়ে তুলেছে তার রস প্রত্যেকেরই শ্রুতিকে তৃপ্ত না করে পারে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮

প্রবোধচন্দ্র সেন

স্বরলিপি

"আমি শুধু রইনু বাকি"

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　**স্বরলিপি** ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

॥ [-া]

গা II { গমা - পমা - গরা | - সা সা রা | গা -া গা | মা পা মগা } I
আ　মি০ ০০ ০০ ০ শু ধু রই ০ নু বা কি "আ০"

I পা - ধর্সা র্সা | র্সা র্সা -া | পর্সা র্সা -া | না না - র্সনা I
যা ০০ ছি ল তা ০ গে ল ০ চ লে ০০

I ধনা - র্সর্রা র্রা | র্সা - না র্সনা | ধনা পা - ধপা | মধা পা মগা II
র০ ০ই ল যা ০ তা০ কে০ ব ০ল্ ফাঁ০ কি "আ০"

II { পা ধা -া | -া ধা ধা | ধর্সা র্সা -া | না ধনা - ধপা I
আ মা ০ র্ ব লে ছি ল ০ যা রা ০০

I পর্সা -া না | র্সা র্রা -র্গর্রা | র্সনা - ধনর্সা র্সা | র্সা র্সা - নধা } I
আ র্ ত তা রা ০০ দে০ ০০য়্ না সা ড়া ০০

I পা ধা -র্সা | র্সা র্সা -া | র্সর্রা র্সা -া | না না -র্সনা I
কো থা য়্ তা রা ০ কো থা য়্ তা রা ০০

I ধা ধনা -র্সর্রা | -া র্সা না | ধনা - পা -ধপা | মধা পা মগা II
কেঁ দে০ ০ ০ ০ কেঁ দে কা০ রে ০০ ডা০ কি "আ"০

[র্রা]

II -া -া পা | { ধা ধা ধা | ধর্সা র্সা -া | না ধনা - ধপা I
০ ০ বল্ দে খি মা শু ধা ই তো রে ০০

I পর্সা র্সনা - ধনা | র্সা র্রা - র্গর্রা | র্সনা - ধনর্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
আ০ মা০ র্ কি ছু ০০ রা০ ০০গ্ লি নে রে ০

I (- নধা - পা পা) } | { পা ধা - র্সা | র্সা র্সা -া | র্সর্রা র্সা -া | না না - র্সনা I
০০ ০ "বল্" আ মি ০ কে বল্ ০ আ মা য়্ নি য়ে ০০

I ধনা - র্সর্রা র্রা | র্সা - না নর্সনা | ধনা পা - ধপা | (মধা পা -া) } I মধা পা মগা IIII
কো০ ০ন্ প্রা ণে ০ তে০০ বেঁ০ চে ০০ থা০ কি ০ থা০ কি "আ০"
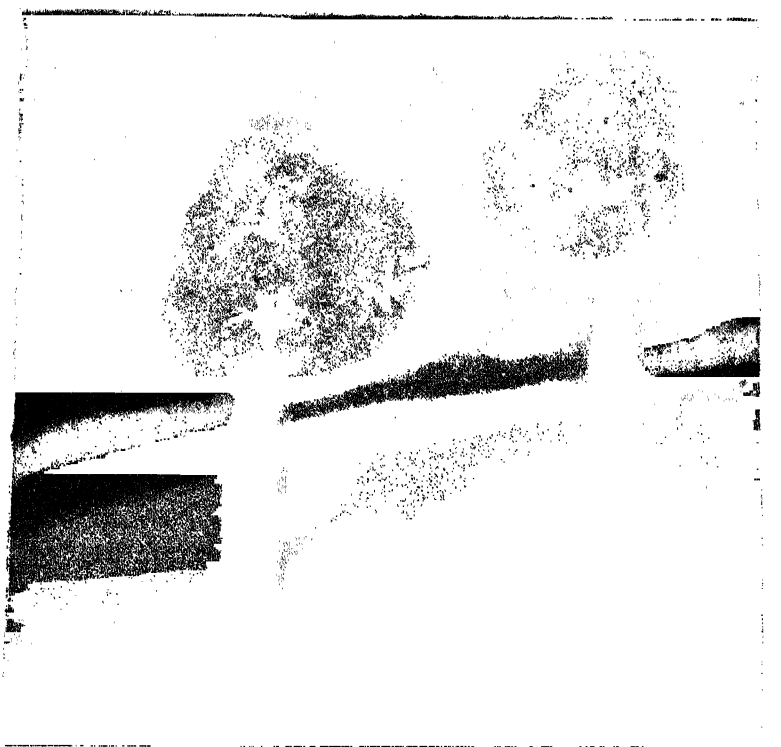
বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ - চৈত্র ১৩৫৫

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বসন্ত, দাও আনি
ফুল জাগাবার বাণী—
তোমার আশায় পাতায় পাতায়
চলিতেছে কানাকানি।

২

চোখ হতে চোখে
খেলে কালো বিদ্যুৎ—
হৃদয় পাঠায়
আপন গোপন দূত।

৩

কোথায় আকাশ
কোথায় ধূলি
সে কথা পরান
গিয়েছে ভুলি।
তাই ফুল খোঁজে
তারার কোণে,
তারা খুঁজে ফিরে
ফুলের বনে।

৪

যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি
পরানের তলে
স্বপন-তিমির-তটে
তারা হয়ে জ্বলে।

The sorrows that I have forgotten
are stars which burn in the dark of my dreams.

৫

লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি
ঐ কি স্মরণ-মুরতি রচিলে ধূলি—
দূর ফাগুনের কোন্ চরণের
সুকোমল অঙ্গুলি!

In the deserted garden grass blossom flowers—
hieroglyphics on dust
speaking of tender footfalls
of some vanished April.

৬

ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে
তপ্ত বারির স্রোতে—
গোপনে লুকানো অশ্রু কী লাগি
বাহিরিল এ আলোতে।

The spring comes out in hot gushes from
the heart of the Earth—
the hidden store of her tears seeks
freedom in the light.

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত[১]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

জ্বরের তাড়নায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে— চিঠি লেখাও দুঃসাধ্য হইয়াছে— অথচ দায়ে পড়িয়া অনেকগুলি চিঠি লিখিতে হয়। তোমাকে যাহা লিখিতেছি দায়ে পড়িয়া নহে— তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি ইহাই জানাইবার জন্য কয়েক লাইন না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মহাভারত হইতে যে গল্পটি নির্ব্বাচন করিয়াছ তাহা মনোরম হইবে। উতঙ্ক শেষ করিয়া সেইটেতেই হাত দিয়ো। আমার ভাঙা মেরুদণ্ড লইয়া কিছুই লিখিবার জো নাই।

ম্হাত্রে একজন বড় আর্টিষ্ট। কিন্তু তাঁহার রচনার কিরূপ সমালোচনা করিবে?[২] আর্ট্ ক্রিটিসিজ্ম্ যাহাকে বলে তাহা আমাদের সাধ্যাতীত। যদি কাব্য হিসাবে সমালোচনা কর তাহা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। কিন্তু গোড়াতেই এরূপ সমালোচনার অসম্পূর্ণতা কবুল করিয়া লওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন আর্ট্ বুঝিবার ও বুঝাইবার ভাষা ও প্রণালী বিভিন্ন।

প্রবাসীতে আমার কবিতায় যেখানে "সুভাষী" ছাপা হইয়াছে সেখানে "স্বভাষী" পড়িয়ো। এই "সু"টুকুর জন্য শৈলেশ দায়ী। ইহা নিতান্ত কু।

প্রবাসীতে যে "সাহিবাগে"র ছবি বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি। নদীতীরের দিকটা ইহাতে দেখানো হয় নাই— শীর্ণ সুবর্ণমতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে— ইহাকেই আমি গল্পে "সুস্তা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি মনে হইতেছে। ছবিটা দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নির্জ্জন মধ্যাহ্নের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাসকল মনে উদয় হইতেছে।

শমী মীরা এখানে আনন্দে আছে— এখানে চারিদিকে অনেক কোণ্‌কানাচ্ ঝোপঝাপ আছে— ছেলেদের কল্পনানীড় রচনা করিবার এমন সকল সুবিধার জায়গা আর নাই।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি রবিবার [১৩০৯]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪) বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে শ্রীলাবণ্যলেখা চক্রবর্তীর নিকট হইতে এইরূপ আর তিনখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সৌজন্যে সেগুলি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

২ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইতিপূর্বেই ভাস্কর গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রের "মন্দিরপথবর্তিনী" মূর্তির আলোচনা করিয়াছিলেন (ভারতী, ১৩০৫ আষাঢ়, পৃ ২৭৪, "প্রসঙ্গ কথা"; প্রদীপ, ১৩০৫ পৌষ, "মন্দিরাভিমুখে")। এই রচনা দুইটি এ যাবৎ কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে রুটীন্ পাঠাইয়াছ তাহাতে তোমাদের পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। এরূপ হইলে পারিয়া উঠিবে না। আর একজন শিক্ষক নিতান্তই চাই। আমি দূরে আছি অতএব তোমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র আপাততঃ না পাওয়া যায় ক্ষতি নাই— আর একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নহিলে তোমাদের সকল দিকেই ক্ষতি হইবে। এ সম্বন্ধে তৎপরতা অবলম্বন করিয়ো। নগেন্দ্রবাবুকে না পাওয়া যায় আর কি কেহ নাই? অন্তত একজন বি, এ হইলেও ক্ষতি নাই। যদি অন্য যোগ্য লোক নিতান্ত না পাও তবে অগত্যা নরেন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু আর কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না। যদি নরেন্দ্রকে রাখা স্থির কর তবে তাঁহাকে ৪০ টাকা বেতন স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যদি রাজি না হন তবে তোমার পরিচিত কোন বি, এ, অথবা বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র কোন ছাত্র কি পাওয়া যাইতে পারিবে না। তোমাকে শুদ্ধমাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। তোমাকে পড়িতে ও লিখিতে ও ভাবিতে হইবে। তুমি ঔদার্য্যের আবেগে নিজের মানসশক্তির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত করিতে বসিয়ো না। আমি এই সময়ে বিদ্যালয়ে থাকিতে পারিতাম ত বড় ভাল হইত। রেণুকা কয়দিন ভাল আছে। যদি এইভাবে অগ্রসর হয় তবে যত শীঘ্র পারি একবার বিদ্যালয়ে যাইবার চেষ্টা করিব।

তোমার দুয়োরাণী বঙ্গদর্শনে পড়িয়া আরো খুসি হইলাম। এই কবিতাটুকুতে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে। ইহার ভাবে ভাষায় ছন্দে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন সুপরিণত কাব্য আমি আশা করি নাই। ইহা পড়িয়া তোমার সম্বন্ধে আমার আশা বাড়িয়া গেছে। আনন্দভিক্ষু কবিতাটি বঙ্গদর্শনে পাঠাইয়া দিয়ো। মুস্কিল আসানও ছাপিতে হইবে।

যে পর্য্যন্ত আর একটি ভাল অধ্যাপক না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাব্রতী কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া আনিতে পার কি? তোমার পরিচিতবর্গের এমন কেহ নাই যিনি দুইএকমাস কাজ চালাইয়া লইতে পারেন? আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিব আশা করি।

মোহিতবাবু হয়ত দুই চারিদিনের মধ্যেই যাইবেন— তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপাতত সমস্ত স্থির করিবে। ইতি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

মাঝে মাঝে এক এক দিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই নিশিকান্তবাবুর চিন্তা আমার মনে উঠে। আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। অজিতের কাছে শুনিয়াছি আত্মীয়দের কাছ হইতে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেছেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অবাধ, তাঁহার উন্নতির পথ অনেকের চেয়ে সহজ— এমন অবস্থায় তিনি সমস্ত

পিছনের সারি ॥ বাম দিক হইতে
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সম্মুখের সারি ॥ বাম দিক হইতে
অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব, কুঞ্জলাল ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীলাবণ্যলেখা চক্রবর্তীর সৌজন্যে

আনুমানিক ১৯০৩ সালে গৃহীত চিত্র

পরিত্যাগ করিয়া আমার বিদ্যালয়ের কাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হওয়াতে আমি প্রায়ই অন্তরের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অনুভব করি। তোমার জন্য আমি ভাবি না— প্রথম হইতেই আপনিই তুমি আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছ— তোমাকে আমি নিরুদ্বেগে অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু নিশিকান্তবাবুকে আমি তেমন করিয়া জানি না— তিনি আমার আদর্শ জানেন না আমিও তাঁহার আদর্শ জানি না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উৎসর্গ করিয়াছ সেজন্য আমি তোমার কাছে ঋণী নহি— কিন্তু তিনি আমাকে যাহা দিবেন তাহা আমার পক্ষে দান প্রতিগ্রহণ। কারণ আমাদের মধ্যে আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই— এবং তিনিও বিদ্যালয়ের মর্ম্মকথা ভাল করিয়া বোঝেন নাই— এইজন্য প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার মন হইতে সঙ্কোচ ঘুচিতেছে না। ভয় হইতেছে পাছে এই কাজের ভার গ্রহণ তাঁহার পক্ষে একটি গুরুতর ভ্রমস্বরূপ হয়। কিছুই ত বলা যায় না। বিদ্যালয়ের শিশু অবস্থা— তাহার নিজের বল কিছুই নাই— তোমরাই তাহাকে আশ্রয় দিবে— তোমাদিগকে সে আশ্রয় দিতে পারিবে না— আমার যৌবনের তেজ ও স্বাস্থ্য নাই— অকালে আমার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে ;— সমস্ত বিঘ্ন ব্যাঘাত অসম্পূর্ণতা দীনতা আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া দেখিতে আমি তোমাদের অনুরোধ করি। মাঝে কোনো কুজ্ঝটিকা জমিতে দিয়ো না— সবলে সানন্দে নিঃসংশয়ে জীবনের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে— আমার বা আর কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়ো না— নিজের অন্তরের দিকে এবং অন্তর্য্যামীর দিকে স্পষ্ট করিয়া চাহিয়া সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়ো। এখনো সময় আছে— নিশিকান্তবাবু এখনো যেন সমস্ত ভাবিয়া দেখেন— আমার উপরে যেন লেশমাত্র নির্ভর না করেন— তাঁহার নিজের কাজ বলিয়াই যাহা অকাতরে গ্রহণ করিতে পারেন তাহারই নিকটে যেন নিজের লাভ ক্ষতি সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্য নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেন— বারম্বার আমার এই অনুরোধ। ঈশ্বরের হস্তে আমি আমার ভার দিতে চাই— এবং তাঁহার হস্ত হইতেই আমার সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করিতে চাই— কোনো ভ্রমজনিত সংশয়াপন্ন ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিব না। বিদ্যালয় সকল হিসাবেই আমার সাধ্যের অতীত হইয়াছে, ইহার ব্যয় নিরতিশয় অধিক— তবু আমি আমার কর্ম্মভার ত্যাগ করি নাই— ঈশ্বর আমার ভার লাঘব করিবেন— কিন্তু নিশিকান্তবাবু যেন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া নিজের জীবনের পথ অবলম্বন করেন। ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত

শ্রীসুকুমার সেন

ভারতক্ষেত্রে মুসলমানশক্তির পদবী পড়েছিল প্রথমে সিন্ধু-পঞ্জাবে, কেননা ইরানের সঙ্গে এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে — অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে। সিন্ধু-পঞ্জাবে মুসলমান-শাসন রূঢ়মূল হওয়ার অনেক দিন পরে তবে এই বিদেশীদের অভিযান ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে পূর্ব দিকে। ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তীরহুত-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া আর্যাবর্তের সবটাই তুর্কী-পাঠানের অধিকারে এসে পড়ল। সিন্ধু-পঞ্জাবে দীর্ঘকাল বসবাস করবার সুযোগ পেয়েই এই স্থানের মুসলমান কবিরা বিদেশীদের মধ্যে সবার আগে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরাই যাঁরা ছিলেন ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী। বাংলা ছাড়া আর কোনো নবীন-আর্য অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় আদি যুগের (একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর) রচনা প্রায় পাওয়াই যায় না। পরবর্তীকালের সংকলনে রক্ষিত হয়ে অল্পবিস্তর রূপান্তর পেয়ে যে দু একটি কবিতা বা গান আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেগুলি প্রধানত মুসলমান কবিরই রচনা। সুতরাং এ অনুমান করলে খুব দোষ হবে না যে সিন্ধু-পঞ্জাবে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রণী ছিলেন মুসলমান কবি-সাধকই।

যে কালে লৌকিক ভাষার উদ্‌গম হয়েছিল তখন আর্যাবর্তে সাহিত্যের বাহন-ভাষা ছিল দুটি — সংস্কৃত ও অপভ্রংশ। সংস্কৃত ছিল সাধু ভাষা — পণ্ডিতি শাস্ত্রের ধারক ও উচ্চ সাহিত্যের বাহক। অপভ্রংশ ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনগণের আদৃত গাথা-গীতির সহজ ভাষা। সংস্কৃতমূলক সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান কবিদের পরিচয় গভীর ও ধারাবাহিক ছিল না, তাই বরাবরই হিন্দু কবিদের তুলনায় তাঁদের জনগণ-সংযোগ নিবিড়তর ছিল, তাই তাঁরা অপভ্রংশ কাব্যপদ্ধতিকে উপেক্ষা করেন নি। মুসলমান কবির লেখা একটি অপভ্রংশ কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুকাল আগে। কাব্যটি "পান্থদূত" গোছের, নাম 'সংনেহয়-রাসয়' (অর্থাৎ সংস্নেহক বা সন্দেশক রাসক)। কবি ছিলেন মূলতানের অধিবাসী, নাম "অদ্দহমান" অর্থাৎ অব্‌দর্ রহ্‌মান, পিতা "মীরসেন" অর্থাৎ মীর্ হসন। কবি নিজের রচনার পরিচয় দিয়েছেন এই কথায়,

অণুরাইয়-রইহরু কামিয়-মণহরু
ময়ণ-মণহ পহ-দীবয়রো
বিরহ-নিরুদ্ধউ সুনহু বিসুদ্ধউ
রসিয়হ রস-সংজীবয়রো।

অই-ণেহিণ ভাসিউ রইমই-বাসিউ
সবণ-সকুলিয়হ অমিয়-সরো
লই লিহই বিয়কখণু অথহ লকখণু
সুরই-সংগি জু বিঅড্‌ঢো নরো॥

ব্রজবুলিতে অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়

অনুরাগিক-রতিধর কামিক-মনোহর
মদন-মনহ পথ-দীপকর
বিরহি-নিরুদ্ধক শুনহু বিশুদ্ধক
রসিকহ রস-সংজীবকর।

অতিস্নেহিক-ভাষিত রতিমতি-বাসিত
শ্রবণ শকুলিকহ অমিয়-সর
লই লীঢ়ই বিচক্ষণ অর্থহ লক্ষণ
সুরতিসঙ্গী যো বিদগ্ধ নর॥

এক পথিক চলেছে মূলতান থেকে খম্ভাইত্ত। সে পড়ল এক কনকাঙ্গী বিরহিণীর দৃষ্টিপথে। পথিকের গন্তব্য স্থানের নাম শুনে বিরহিণীর চোখে এল জল। সে চোখ মুছে বললে, "খম্ভাইত্ত নামে আমার তনু জর্জরিত হচ্ছে, সেখানে আছেন আমার নাথ, বিরহবর্ধনকারী। অনেক কাল হয়ে গেল, নির্দয় আর এল না। পথিক, যদি দয়া কর তবে তুচ্ছ কথায় গাঁথা কিছু বাণী দিই প্রিয়ের উদ্দেশে।" পথিক রাজি হল, বিরহিণীর বাণী গাঁথা হল অনূ্যন দেড়-শ দোহা-চউপই কবিতায়। শেষে কবির ভরতবাক্য,

জেম অচিন্তিউ কজ্জু তসু সিদ্ধু খণহি মহন্তু
তেম পঢ়ন্ত-সুণন্তয়হ জয়উ অণাই অণন্তু ॥

অর্থাৎ, 'যেমন তার মহৎ কার্য অনায়াসে অচিন্তিতভাবে সিদ্ধ হল, তেমনি হবে তার যে এই কাব্য পড়বে ও শুনবে ; জয় হোক অনাদি অনন্তের।'

"চন্দ বলিদ্দ" অর্থাৎ চন্দ বরদাই হিন্দী সাহিত্যের আদিকবি বলে বিখ্যাত। কিন্তু এঁর কাব্য, 'পহুবিরায়-রাসউ' বা 'পৃথ্বীরাজ-রাসক', আসলে লেখা হয়েছিল অপভ্রংশে। পরবর্তীকালে কাব্যটির ভাষা স্থানে স্থানে হিন্দী রূপান্তর পেলেও অপভ্রংশ মূল কখনো একেবারে তলিয়ে যায় নি। কাব্যটির অপভ্রংশ মূলের অল্পস্বল্প অংশও মিলেছে। চন্দ বরদাইয়ের কথা বাদ দিলে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম কবির মর্যাদা পান দিল্লীর আমীর খুসরৌ (১২৫৪-১৩২৫)। আমীর খুসরৌ ছিলেন বহুভাষাবিদ্। ফারসী কাব্যসাহিত্যে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। হিন্দীতেও ইনি অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। অপভ্রংশ কাব্যের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল প্রহেলিকা রচনা। খুসেরৗ প্রহেলিকা কবিতাও কিছু লিখেছিলেন। খুসরৌর নামে প্রচলিত এই ধরণের একটি "মুকরণী" অর্থাৎ অনপেক্ষিতার্থ কবিতা উদ্ধৃত করছি।

বহ আবে তব শাদী হোয় মীঠি লাগে বাকে বোল
উস বিন দূজা অওর ন কোয়। এ সখি সাজন না সখি ঢোল ॥

অর্থাৎ 'ও আসে তবে শাদী হয়, ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই, ওর বোল লাগে মিঠা।' 'সখি, সে কি বল্লভ ?' 'না সখি, ঢোল।'

অপভ্রংশ-রচনার যুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ মিশ্র কবিতার ও ছড়ার প্রচলন ছিল। মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরণের ভাষামিশ্র কবিতা নূতন জীবন পেলে বিদেশী ফারসী তুর্কী ও দেশী লৌকিক ভাষার সংযোগে। বাংলায়ও এই রীতির নূতন করে চল হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের মুসলমান কবিদের রচনায় এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায়।

লৌকিক ভাষায় সাধনগীতি পদ্ধতির অনুশীলনে ব্রতী হলেন স্ফী সাধক-কবিরা। পঞ্জাবের প্রথম কবি শেখ ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ (?-১২৬৭) ছিলেন আমীর খুসরৌর গুরু শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার গুরু। শেখ ফরীদুদ্দীনের লেখা একটি অধ্যাত্মগীতি সংকলিত আছে গুরু অর্জুনের আদি গ্রন্থে। গানটিতে সাধক-কবির বিরহিণী-হৃদয়ের তপ্ত উচ্ছ্বাস যেন উপচিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অনুবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে কবীরের গানে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর সহজ-সাধনার গঙ্গাধারার সঙ্গে সুফী-সাধনার যমুনাধারাকে মিলিয়ে দিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান সাধক-কবিরা। ঢেণ্ডণ-পাদের একটি চর্যাগীতির চার-পাঁচ ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে কবীরের

নামিত একটি গানে। এই গানটি পেয়েছি একটি পুরানো বাংলা পুথিতে মীরার দুটি হিন্দী পদাবলীর ও জ্ঞানদাস-মীরফৈজুল্লা-আলীর কয়েকটি ব্রজবুলি পদাবলীর সঙ্গে।

অব কেয়া করে গান গাঁব-কতুআলা	বলদ বিয়াওয়ে গাভি ভই বাঞ্ঝা
শ্বমাংস পসারি গীধ রাখওআলা। ধ্রু।	বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন সাঞ্ঝা
মূশ কি নাও বিলাই কাড়ারী	নিতি নিতি শৃগালা সিংহ সনে জুঝে
সোএ মেড়ু কনাগ পহারী।	কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে॥

অর্থাৎ 'এখন কি গান করছে গ্রাম-কোতোয়াল ? কুকুরের মাংসের পসার, রাখছে গৃধ্র। ব্যাঙ শুয়েছে, প্রহরী নাগ। বলদ বিয়ালো, গাই হল বাঁঝা ; বাছুর দোহা হচ্ছে দিনে তিন সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে। কবীর কহেন, কম লোকেই বোঝে।'

এই ধারাই সরাসরি চলে এসেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউল-দরবেশি গানে।

২

অপভ্রংশের যুগে রোমান্টিক-কাহিনীকাব্য ও প্রণয়গাথার বেশ চলন ছিল। মুসলমান কবিরা যথাসম্ভব এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাত্ম্য-কাব্যকাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাঁদের তেমন নজর ছিল না। লৌকিক সাহিত্য হিন্দু কবিদের কাছে ধর্মসাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়ে নি। সুতরাং দেবমাহাত্ম্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনীকাব্য রচনায় তাঁরা নিরঙ্কুশ ছিলেন। এইজন্যেই হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনীকাব্যে মুসলমান কবিকেই দেখি অগ্রণী ও একাধিপতি।

এইসব কাব্যের বিষয় রূপকথাসুলভ রোমান্টিক গল্প মাত্র, সুতরাং এগুলির বস্তু সুনির্দিষ্ট দেশকালের পরিধির বাইরে। তবুও মনে হয় এই ধরণের বিশিষ্ট কোনো কোনো গল্প পূর্ব-ভারতেই বিশেষ করে চলিত ছিল। প্রায় সব কাহিনীতেই গোরখপন্থী যোগীর উল্লেখ এই অনুমান সমর্থন করে।

সবচেয়ে পুরানো হিন্দী কাহিনীকাব্য (যদি রচনাকাল ১৫১৬ সংবৎ হয়) বোধ করি কবি দামোর রচনা 'লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতী কথা'। কাব্যের রচনারম্ভকাল জ্যৈষ্ঠ ১৫১৬ (১৪৫৯খ্রী) অথবা ১৫৭০ (১৫১৩খ্রী) সংবৎ। কবির পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কাব্যের পত্তন হয়েছে সরস্বতী-গণেশ-বন্দনায়।

সুনউ কথা রসলীলবিলাস	মূসা-বাহন হাথ ফরেস।
যোগী করণ [রাজ] বনবাস।	লাড়ূ লাবন জস ভরি থাল
পদমাবতী বহুত দুখ সহই	বিঘন-হরণ সমরুঁ দুন্দাল।
মেলউ করি কবি দামউ কহই।	সবত পদরই সোলোওরা মঝার
সুকবি দামউ লাগই পায়	জেষ্ঠ বদি নউমী বুধবার।
হম বর দীয়ো সারদ মায়।	সপ্ততারিকা নক্ষত্র দৃঢ় জান
নমউ গণেশ কুঞ্জর-শেস	বীরকথারস করুঁ বখান॥

কাব্যের উপসংহারে কবি গায়নের হয়ে নায়ক-শ্রোতার কাছে "গাই দক্ষণা আর কাপড় পান" চেয়ে ফলশ্রুতি শুনিয়ে ভগবদ্-বন্দনা করেছেন।

বীরকথা সম্হলই জে বলী	স্থরতা জে বৈকুণ্ঠা ঠাঈ।
তিহি বিয়োগ নহিঁ একা ঘড়ী।	ইগুনিস বিস্বা এক ন রাজ
হরি জল হরি থল হরি পয়ালি	রচই কবিত কবি দামউ সাচ।
হরি কংসাসুর ৰধিয়ো ৰালি।	ইনী কথা কউ যোহী বীরতন্ত্র
দৈত্যসংহারণ ত্রিভুবন-রাঈ	হম তুম্হ জপউ গবরিকাউ কন্ত ॥

লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতী কাহিনী যে অপভ্রংশ থেকে এসেছিল তার প্রমাণ লৌকিক রচনার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও প্রাকৃত গাথার গ্রন্থন। কাব্যকাহিনী সংক্ষেপে বলছি।

গঢ় সামৌরের রাজা হংসরায়ের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়েছে। সেই সভায় এলেন রাজা ধীরসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সিদ্ধনাথ যোগীর উপদেশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বেশে। পদ্মাবতী তাঁরই গলায় মালা দিলে। সমবেত পাণিপ্রার্থীরা তখন একজোট হয়ে লক্ষ্মণসেনকে আক্রমণ করলে। লক্ষ্মণসেন তাদের পরাভূত করলেন, তারপর আত্মপরিচয় দিলেন। লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ হল। কিছুকাল যায়। একদা নিশীথে রাজা লক্ষ্মণসেন স্বপ্ন দেখলেন যে যোগী তাঁর কাছে পানীয় জল চাইছেন। সকালে রাজা গেলেন যোগীর কাছে জল নিয়ে। জল পান করবার আগে যোগী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে তাঁর প্রথম সন্তান জন্মালে যখন তার তিন মাস বয়স হবে তখন যোগীকে তাকে সমর্পণ করতে হবে। রাজা সহজেই রাজি হলেন, কেননা তখন তিনি নিঃসন্তান। যথাসময়ে পদ্মাবতীর ছেলে হল। তার যখন তিন মাস বয়স হল তখন রাজা বেঁকে দাঁড়ালেন। পদ্মাবতী বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাঁকে পাঠালেন যোগীর কাছে ছেলেকে নিয়ে। যোগী রাজাকে বললেন ছেলেটিকে চার টুকরো করতে। রাজা তাই করলেন। চার টুকরো থেকে বেরল ধনুঃশর, অসি, কৌপীনবস্ত্র ও সুন্দরী নারী। রাজা রাজধানীতে ফিরে এলেন কিন্তু রাজ্যশাসনে আর তাঁর মন বসল না। রাজ্য ও রানী ছেড়ে তিনি বনে গেলেন তপস্বীর বেশ ধরে। বনে বনে নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছলেন সমুদ্রতীরে, চন্দ্রসেনের রাজধানী কর্পূরধারা নগরীতে। ঘটনাচক্রে সেইসময়ে সমুদ্রতীরে খেলতে এসে রাজপুত্র হরিয়া জলে ডুবেছে। লক্ষ্মণসেন তাকে উদ্ধার করলেন। চন্দ্রসেন তাঁকে সমাদর করে কাছে রাখলেন। রাজকন্যা চন্দ্রাবতীকে একদিন দেখতে পেয়ে লক্ষ্মণসেন তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন। রাজা চন্দ্রসেনের কানে একথা গেলে লক্ষ্মণসেনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। হত্যার পূর্ব মুহূর্তে লক্ষ্মণসেন আত্মকাহিনী ব্যক্ত করলেন। শুনে রাজার হৃদয় আর্দ্র হল, তিনি কন্যাকে সমর্পণ করলেন লক্ষ্মণসেনের হাতে। চন্দ্রাবতীকে নিয়ে লক্ষ্মণসেন ফিরে এলেন গঢ় সামৌরে। দু রানীকে নিয়ে তাঁর দিন সুখে কাটতে লাগল।

কুতবনের 'মৃগাবতী' লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতী কাব্যের মতো ছোট রচনা নয়, বৃহৎ কাব্য (৩৫০ পাতার পুথি)। ভাষা অবধী বা পূর্বী হিন্দী। জৌনপুরের সুলতান শর্কী হোসেন শাহের অনুচর ছিলেন কবি। তাঁরই সঙ্গে ইনি বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহের আশ্রয়ে। কাব্যটি লেখা হয়েছিল বাংলাদেশে, গৌড়ে, ৯০৯ হিজরীতে (১৫১২ খ্রীস্টাব্দে)। কাহিনীও বাংলাদেশের হওয়া সম্ভব। কুতবন গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহের ও তাঁর হিন্দু-প্রভাবিত দরবারের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

সাহে হুসেন আহে বড় রাজা
ছত্র-সিংহাসন উনকো ছাজা।
পণ্ডিত অউ বুধবন্ত সয়ানা
পঢ়ে পুরাণ অরথ সব জানা।
ধরম দুদিষ্টিল উনকো ছাজা
হম সির ছাহ জীয়ো জগ রাজা।

দান দেই অউ গণত ন আবৈ
ৰলি অউ করন ন সরৰর পাবৈ।
রায় জহাঁ লউ গন্ধ্রভ রহহীঁ
সেবা করহি ৰার সৰ চহহীঁ।
চতুর সুজান ভাষা সব জানে অইস ন দেখুঁ কোয়ে
সৰা সুনহুঁ সৰ কান দই ফুনি রে দিখাবহু সোয়ে॥

তারপর কাব্য রচনার দিশা।

নউ সউ নব জৰ সংবত অহী।
[মাহ্] মোহর্‌রম চান্দ উঁজিয়ারী
য়হ কৰি কহী পূরী সংবারী।
গাহা দোহা অরেল অরজ
সোরঠা চৌপঈ কই সরজ।

সান্তর অখির ৰহুতই আয়ে
অউ দেসী চুনি চুনি কছু লায়ে।
পঢ়ত সুহাবন দীজই কানূ
ইহ কে সুনত ন ভাবই আনূ।
দোয়ে মাস দিন দস মহী য়হ রে দৌরায়ে জায়ে
য়েক য়েক বোল মোতীজস পুরবা ইক ঠান চিত লায়ে

অপভ্রংশের গাহা দোহা অটিল্লা ("অরেল") ও আর্যা ("অরজ") ছন্দের কবিতা ভেঙে সোরঠা-চৌপই করছেন — কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনীর মূল পেয়েছিলেন তিনি অপভ্রংশে। কাহিনী সংক্ষেপে এই বলছি।

চন্দ্রগিরির রাজা গণপতিদেবের পুত্র কাঞ্চননগরের রাজা রূপমুরারির কন্যা মৃগাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে। মৃগাবতী অন্তর্ধানবিদ্যা জানে। অনেক কষ্টের পর মৃগাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হল। একদিন রাজপুত্র পিতার সঙ্গে দেখা করতে রাজধানী গিয়েছেন এই অবসরে মৃগাবতী গেল পালিয়ে। ফিরে এসে তাকে না দেখে রাজকুমার যোগীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল তার অনুসন্ধানে। ভ্রমণক্রমে কুমার পৌছল সমুদ্রতীরে এক পার্বত্য প্রদেশে। সেখানে রাক্ষসের কবল থেকে তরুণী রুক্মিণীকে উদ্ধার করলে। রুক্মিণীর পিতা মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাকে সানন্দে কুমারের হাতে সমর্পণ করলে। নূতন শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে কুমার আবার রাহী হল মৃগাবতীর উদ্দেশে এবং অনেক দুর্গম পথ বেয়ে অবশেষে উপনীত হল মৃগাবতীর দেশে। মৃগাবতী তখন পিতৃরাজ্য শাসন করছিল। কুমারের সঙ্গে মিলন হলে পর মৃগাবতী স্বামীকে সিংহাসনার্ধভাগী করলে। স্বামীস্ত্রীর যৌথশাসনে বারো বছর কেটে গেল। অবশেষে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে রাজা গণপতিদেব দেশে বিদেশে লোক পাঠালেন। একজন দূত রুক্মিণীর দেশে গিয়ে কুমারের সন্ধান পেলে এবং সেই সূত্র ধরে মৃগাবতীর দেশে এল। কুমার মৃগাবতীকে নিয়ে চন্দ্রগিরি রওনা হলেন। পথে বিরহিনী রুক্মিণীকে সঙ্গে তুলে নিলেন। দেশে ফিরে দিন সুখে কাটতে লাগল। একদিন শিকারে গিয়ে কুমার হাতী থেকে পড়ে মারা গেলেন। দুই রানী সহমরণে গেল।

কবি কুতবন সূফী সাধক ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিখ্যাত সূফী পীর শেখ বুর্‌হান চিশ্‌তী। কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি গুরুর উদ্দেশে নতি জানিয়েছেন এইভাবে—

শেখ বুঢ়ন জগ সাচা পীরূ
নাঁব লেত সুধ হোত সরীরূ।
কুতবন নাম লেই পা ধরে
সরবর দী তুহ জগ নীর ভরে।
পাছলে পাপ ধোয়ই সব গয়ে
ঝরহিঁ পুরানে অউ সব নয়ে।
নই কই ভয়া আজ অউতারা
সব সোঁ বড়া সো পীর হমারা।

মৃগাবতী-কাহিনীকে কুতবন কতকটা আধ্যাত্মিক রূপকের আধাররূপে ব্যবহার করেছিলেন। এই পথে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন শেখ বুরহানের প্রশিষ্য মালিক মুহম্মদ জায়সী (?-১৫৪২)। জায়সীর পদ্মাবতী কাব্য শুধু অবধী সাহিত্যের নয় — সমগ্র নবীন-ভারতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কুতবনের মৃগাবতী কাব্য অনুসরণ করেই জায়সী তাঁর উৎকৃষ্ট রূপক কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এই দুজন সূফী কবির রচনা বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না। জায়সীর কাব্য বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে। কুতবনের কাব্যের অনুসরণ হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান কবির দ্বারা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

অপভ্রংশ সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী, মাধবানল-কামকন্দলা, আর্যাবর্তের সর্বত্র আদৃত হয়েছিল। কাহিনী সামান্যই। পুষ্পবতীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুষ্পবটু মাধবানল ছিল রূপে কন্দর্প বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। মাধবানলের প্রতি রাজধানীর তরুণীদের মনোভাব জেনে তাদের স্বামীরা রাজার কাছে প্রার্থনা করলে মাধবানলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে। রাজাও বোধ করি নিজ শুদ্ধান্তঃপুরের জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই মাধবানলকে নির্বাসন দিতে বিলম্ব হল না। পুষ্পবতী ছেড়ে মাধবানল চলে এলেন কামসেনের রাজধানী কামাবতীতে। সেখানকার রাজসভার নটীমুখ্যা ছিল সুন্দরী কামকন্দলা।

একদিন কামকন্দলা রাজসভায় নৃত্য করছে এমন সময় মাধবানল সভাদ্বারে হাজির হল। দূর থেকে অল্প কিছুক্ষণ নাচ দেখে মাধবানল প্রতীহারকে ডেকে বললে, 'বারো জন বাজিয়ের মধ্যে যে লোকটি পূর্বমুখে বসে বাজাচ্ছে তার হাতের বুড়ো আঙুল কাটা বলে তাল কাটছে, রাজাকে এই কথা বলো গিয়ে।' রাজা দেখলেন ঠিকই তো। মাধবানলকে ডাকিয়ে এনে সমাদর করে কাছে বসালেন। রূপবান্ সমজদার গুণীর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে কামকন্দলা তার দুর্ঘট নৃত্যকৌশল দেখাতে লাগল। মাথায় জলভরা কলসী নিয়ে হাতে গুলি লুফতে লাগল, সেই সঙ্গে মুদ্রা দেখাতে লাগল, পায়ে নাচতে ও তাল দিতে থাকল, মুখে গান গেয়ে চলল, চোখে কটাক্ষবর্ষণ করতে লাগল। এমন সময় ভ্রমর এসে তার বুকে বসল। নাচ-গান-তাল-মুদ্রা-কটাক্ষ মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হল না, কামকন্দলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ভ্রমরকে তাড়িয়ে দিলে। এই চাতুর্য মাধবানল ছাড়া কেউই লক্ষ্য করলে না। নৃত্যশেষে সাধুবাদ উঠল না দেখে মাধবানল কিছুক্ষণ আগে রাজার কাছে যে 'পঞ্চাঙ্গ প্রসাদ' লাভ করেছিল তা কামকন্দলাকে পেলা দিলে। কামকন্দলা অঞ্জলি পেতে আশীর্বাদী নিয়ে বললে, 'হে নিখিলবিদ্যাপারগ, তোমার সমান কলাভিজ্ঞ আর তো কাউকে দেখলুম না।' রাজার হল রাগ। মাধবানলের প্রতি হুকুম হল অবিলম্বে সে-দেশ ছেড়ে চলে যেতে। রাজসভা থেকে মাধবানল গিয়ে উঠল কামকন্দলার বাড়িতে। সেখানে দুজনের মনের কথা বিনিময় হল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবার জো নেই। মাধবানল আবার বেরিয়ে পড়ল পথে। এ পথ নিয়ে গেল তাঁকে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে। এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হয়ে ভোজন সেরে মাধবানল

কামকন্দলাকে চিঠি লিখলে প্রণয়ের আর্তি জানিয়ে। সন্ধ্যার পর নগরবাহিরে মহাকালের মন্দিরে গিয়ে এককোণে শুয়ে রইল। বিরহীর চোখে ঘুম আর আসে না। কি করে, অন্তরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে মাধবানল কামকন্দলার নাম নিয়ে কবিতা রচনা করে দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখলে। সকালে ঠাকুর দেখতে এসে এই কবিতা রাজার নজরে পড়ল। রাজা খোঁজ করতে লাগলেন রচয়িতা কে। যখন কেউই খবর আনতে পারলে না তখন রাজা নিযুক্ত করলেন গণিকা ভোগবিলাসিনীকে। সে মহাকাল-মন্দিরে ছদ্মবেশে গিয়ে রাত্রিতে মাধবানলের পাশে শুয়ে ঘুমন্ত বিরহীর মুখে উচ্চারিত প্রিয়া কামকন্দলার নাম শুনে নিলে। খবর নিয়ে রাজা মাধবানলকে ডেকে পাঠিয়ে নানারকমে বোঝাতে লাগলেন বেশনারীর মোহ ত্যাগ করতে। অগত্যা রাজা মাধবানলকে নিয়ে চললেন কামকন্দলার কাছে। রাজাকে বিক্রমাদিত্য বলে চিনতে পেরে কামকন্দলা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। পা টেনে নিতে গিয়ে কামকন্দলার বুকে ঠেকল। কামকন্দলা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করলেন।' রাজার তখন হৃদয়ঙ্গম হল মাধবানলের প্রতি কামকন্দলার কী গভীর অনুরাগ। তবুও তিনি এই অনুরাগ কল্যাণজনক মনে করতে পারলেন না। কামকন্দলাকে বললেন মিথ্যা করে যে কে একজন মাধবানল এক নারীর অনুরাগে পড়ে তার বিরহে মারা গেছে। এই কথা শোনবামাত্র কামকন্দলার প্রাণবিয়োগ হল। দেখেশুনে মাধবানলেরও মৃত্যু হল। কৃতকর্মের অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্য বনে গেলেন আত্মহত্যা করতে। বেতাল বাধা দিলে এবং পাতাল থেকে অমৃত এনে প্রণয়ী দুজনকে বাঁচিয়ে তুললে। রাজার মুখরক্ষা হল। উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করে বিক্রমাদিত্য কামসেনকে বলে পাঠালেন কামকন্দলাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। কামসেন রাজি না হওয়ায় বিক্রমাদিত্য তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। মাধবানল-কামকন্দলার বিবাহ হল। তারা উজ্জয়িনীতে বাস করতে লাগল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে।

মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনীতে একটু রূপকের স্পর্শ আছে। তার পরিচয় নায়ক-নায়িকার নামেই রয়েছে। মধু ঋতুর তাপে কাম হয় উদ্দীপিত।

লৌকিক সাহিত্যে, গুজরাটী-হিন্দীতে, মাধবানল-কামকন্দলা কাব্য অনেকেই লিখেছিলেন। তার মধ্যে পুরানো হলো তিনখানি, গণপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা দোহা', কুশললাভের 'মাধবানল-কামকন্দলা চৌপাঈ' ও আলমের 'মাধবানল-কথা'। গণপতি ছিলেন গুজরাটী কায়স্থ। এঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৪ সংবৎ (১৫২৭ খ্রীস্টাব্দ)। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা রচনার মধ্যে আনন্দধরের কাব্যই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম।

আলম তাঁর কাব্য লিখেছিলেন হিন্দীতে। রচনাকাল ৯৯১ হিজরী (১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। কাব্যের উপক্রমে দিল্লীপতি শাহ্ জলাল আকবরের ও তাঁর মন্ত্রী রাজা টোডরমল্লের প্রশংসা আছে।

জগপতি রাজ কোটি যুগ কীজৈ	ধর্মরাজ সব দেশ চলাবা
সাহ্ জলাল ছত্রপতি কহীজৈ।	হিন্দূ তুরক পন্থ সব ল্যাবা।
দিল্লীয়পতি অকবর সুরতানা	আগে নেউ মহামতি মন্ত্রী
সপ্ত দ্বীপমেঁ জাকী আনা।…	নৃপ রাজা টোডরমল্ল ক্ষত্রী।…

সন নৌ সৌ ইক্যাবনুবৈ আই
করো কথা অবঁ বোলো তাই।
কহো বাত সুনৌ অব লোগ
করো কথা সিংগার-বিয়োগ।
কছু অপনী কছু পরকৃতি চোরৌ
জথা সকতি করি অচ্ছর জোরৌ।

সকল সিংগার-বিরহকী রীতি
মাধো-কামকন্দলা-প্রীতি।
কথা সংস্কৃত সুনি কছু থোরী
ভাষা বান্ধি চৌপই জোরী।
মাধোনল সব-গুণ-চতুর কামকন্দলা জোগ
করই কথা আলম সুকবি উতপতি-বিরহ-বিয়োগ॥

কবির স্বীকৃতিতেই প্রকাশ যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তাঁর অজানা ভাষা ছিল না।

জেসলমীর-নিবাসী কুশললাভ প্রাচীন রাজস্থানী ভাষায় 'ঢোলা-মারবনরী চৌপঈ'-ও লিখেছিলেন যাদব রাওল কুমার হররাজের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। এই কাব্যের রচনাকাল ১৬০৭ সংবৎ (১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ)। মাড়বারের রাজা পিঙ্গলের বিবাহ হয়েছিল জালোরের অধীশ্বর সামন্তসিংহের সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা উমাদেঈর সঙ্গে। পিঙ্গল-উমাদেঈর সন্তান হল মারবনী (অর্থাৎ মরুবাট-রাজকন্যা)। তার বিবাহ হল নলবর গড়ের রাজা নলের পুত্র ঢোলার সঙ্গে। বিবাহকার্য সম্পন্ন হল পুষ্করে। নলবর গড়ে ফিরবার পথে নল পুত্রের বিবাহ দিল মালবের রাজকন্যার সঙ্গে। ঢোলা-মালবিকা সংসার করতে লাগল, ওদিকে মরুবাটনিকা বিরহজ্বালায় জ্বলছে। অবশেষে সে পাঠাল দূত স্বামীর উদ্দেশে। তার পর যথারীতি মিলন। এই হচ্ছে ঢোলা-মারবনী কাব্যের কাহিনী। কাব্যটির মূল ছিল অপভ্রংশে। কুশললাভ মাঝে মাঝে অপভ্রংশ দোহা ও গাহা উদ্ধৃত করেছেন। এবং শেষে বলেছেন,

দূহা ঘণা পুরাণা অছই চউপঈ-বন্ধ কীয়া মই পছই।

বাংলাদেশে মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী অজ্ঞাত ছিলনা। আনন্দধরের কাব্যের বাংলা পুথি যথেষ্ট পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতির নামেও একটি ছোট সংস্করণ মিলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কবি 'দ্বিজ' ধনপতি নেপালে বসে এই বিষয়ে একটি নাটগীত লিখেছিলেন ব্রজবুলিতে।

৩

বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়কাহিনীকাব্য হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর। একজন ছাড়া সব বিদ্যাসুন্দর-কবি ছিলেন হিন্দু। সুতরাং তাদের হাতে কাব্যকাহিনী দেবী-মাহাত্ম্যের ফ্রেমে বাঁধাই হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের প্রথম কবি 'দ্বিজ' শ্রীধর কবিরাজ গৌড়-সুলতান্ নুসরৎ শাহার পুত্র যুবরাজ ফীরুজ শাহার চিত্তবিনোদনের জন্য কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় জৌনপুরের হোসেন শাহা শর্কীর অনুচর কবিদের দ্বারাই এই প্রণয়কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর বিভিন্ন রূপ চলিত ছিল সংস্কৃতে। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু স্বতন্ত্রতা আছে। প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের একমাত্র মুসলমান কবি হচ্ছেন সাবিরিদ খান। ইনি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পাঠানরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা বহুগুণিত হয়ে জ্বলে উঠ্‌ল বাংলা-সীমান্তের সামন্ত-রাজসভাগুলিতে — কামতা-কামরূপে, ত্রিপুরায়, দরঙ্গ-কাছাড়ে, চাটিগাঁ-রোসাঙ্গে, মল্লভূম-ধলভূমে। চাটিগাঁয়ে হোসেন শাহার প্রতিরাজ লস্কর পরাগল-খান ও তাঁর পুত্র নুসরৎ

খান গৌড়-দরবারের অনুরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। উপযুক্ত কবি-পণ্ডিত না থাকায় সে চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ফলবান্ হয় নি। কিন্তু চাটিগাঁয়ে ও রোসাঙ্গে (অর্থাৎ আরাকানে) পরবর্তীকালে যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছিল তা সম্ভব হত না পরাগ-নুস্রতের পূর্বতন প্রচেষ্টা বীজরূপে না রয়ে গেলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির প্রথম সাক্ষাৎ পাচ্ছি চাটিগাঁ-রোসাঙ্গেই।

বাংলায় হিন্দী ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ-দরবারের দুজন সভাকবি, দৌলৎ কাজী ও আলাওল। দৌলৎ কাজী বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পুরানো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম তিনি। তাঁর একমাত্র কবিকৃতি হচ্ছে অসমাপ্ত — পরে আলাওল কর্তৃক সমাপ্ত—'লোর-চন্দ্রানী' পাঞ্চালী-কাব্য। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীসুধর্মার লস্কর-উজীর আশ্‌রফ খানের অনুরোধে দৌলৎ কাজী হিন্দী (বা ভোজপুরী) মূল অনুসরণ করে কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শ্রীসুধর্মার রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীস্টাব্দ। কাব্যের রচনাকালও এরই মধ্যে পড়ে। রচনাসমাপ্তির আগেই দৌলৎ কাজীর মৃত্যু হয়েছিল। দৌলৎ কাজী ছিলেন সুফী কবি-সাধক। এঁর পোষ্টা আশ্‌রফ খানও "হানাফী মোঝাব ধরে চিশ্‌তি খান্দান"।

কাব্যের প্রথমে আল্লার ও রসুলের বন্দনা। তার পর রোসাঙ্গের রাজার সুশাসনের প্রশংসা।

প্রতাপে প্রভাতভানু বিখ্যাত ভুবন
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।
দেবগুরুপূজায় ধর্মেত তার মন
সে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচন।...
রাজ্য সব উপশম কৈল সুবিচার
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার।
মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি
রাজাভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি।

বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার
ভীম সম বলিয়া না করে বলাৎকার।
সীতা সম সুন্দরী সে যদি রহে বনে
রাজাভয়ে না নিরীক্ষে সহস্রলোচনে।...
চতুর্দ্দিক জিনিয়া পৃথিবী কৈলা বশ
সুগন্ধি সমীর বহে রাজকীর্ত্তিযশ।...
মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্ত্তিযশ
শ্বেতরূপে সুধর্ম্মের হৈল পদবশ।

তার পর 'ধর্ম্মপাত্র' মহামাত্য আশ্‌রফ খানের স্তুতিবাদ।

পীর গুরু অভ্যাগত পুজেন্ত তৎপর
লোক-উপকার করে নাহি আপ্ত-পর।
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝেন্ত সকল
মিত্রেরে সহায় করে অরি রসাতল।...
শ্যামতনু যুক্তিমন্ত বচন মিষ্টতা
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা।

দেশান্তরি প্রবাসী পন্থিক বানিজার
দেশে দেশে কীর্ত্তিযশ বাখানে যাহার।
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ
আচি কুচি মচিনি পাটনা আদি দেশ।...
নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি
যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি।

একদিন রাজার মন হল বিপিনবিহারে। অমনি চতুরঙ্গ সেনা সাজল। রাজা চললেন নৌকায় বারো দিনের পথ।

দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে
কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুঞ্জ খেলিতে।

নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে
নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে।

ছুই সারি সে নৌকা ভাসয়ে নানা রঙ্গে
আরোহিল নৃপ সভা আশরফ সঙ্গে।
দশ-দিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়
সুবর্ণের হংস যেন লহরি খেলায়।...
খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবন
সঙ্গী আশরফ-খান আদি পাত্রগণ।...

বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম।
তথাতে রচিয়া সভা রহিলা নৃপতি
ময়ূরগঠন যেন সভার আকৃতি।...
যাহার যেমন যুক্ত শিবির রচিয়া
তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া।

চার মাস কেটে গেল, রাজা রাজধানীতে ফেরবার নামও করেন না। আশরফ খান ফিরে এলেন রাজার অনুমতি নিয়ে এবং নিজের সভা জাঁকিয়ে বসলেন। তত্ত্বকথায় কাব্যগীতিতে সে সভা হল মুখর।

আবরী ফারসী নানা তত্ত্ব-উপদেশ
বিবিধ প্রসঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ।

গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর
সহজে মহন্ত-সভা আনন্দ-নিয়র।

একদিন মহামাত্যের মনে ইচ্ছা জাগল "শুনিতে লোরক-রাজ ময়নার ভারতী"। তিনি কবি দৌলৎকে বললেন, 'ঠেট ভাষায় দোহা-চৌপই শুনলুম, কিন্তু সাধারণ লোক সবাই তো গাঁওয়ারি ভাষা বোঝে না, অতএব গল্পটি দেশী ভাষায় পাঁচালীর ছাঁদে লেখ যাতে সব লোকে বুঝে আনন্দ পায়।' এই নির্দেশ পেয়ে দৌলৎ কাজী "পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী"।

তারপর কাহিনীর আরম্ভ।

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী
ভুবনবিজয়ী যেন জগৎপার্বতী।
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।
কাঞ্চনকমল মুখ পূর্ণশশী নিন্দে
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে।
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।...

প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস সুমতি
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।
সর্ব্বকলাযুতা সতী নূতন যৌবন
স্বামীর লোরক নাম নৃপতিনন্দন।
নানা গুণে বিশারদ লোরক দুর্জয়
বিচক্ষণ বলবন্ত সাহসে নির্ভয়।
অন্যে-অন্যে দোহ চিত্তে প্রেমের মুকুল
তিলেক বিচ্ছেদে হৈলে দোহান আকুল।

তবুও পুরুষের চিত্ত বোঝা দায়,

আচম্বিত মতি হৈল লোরক নৃপতি ছাড়িয়া রতন-হার গুঞ্জাতে আরতি।

মহাদেবীর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে লোরক চলল বিপিনবিহারে, এবং শ্রীসুধর্মার মতো কাননকুটীরে চারু প্রাসাদ ও ললিত মন্দির রচনা করে খেলাধূলার নিত্য মহোৎসবে দিন কাটাতে লাগল পাত্রমিত্রের সঙ্গে। ময়নাবতী রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে বিরহ জ্বালায় জ্বলতে লাগল।

লোরকের কাননসভায় একদা এক যোগীর আবির্ভাব হল। তার হাতে এক সুবর্ণের ঘট তদুপরি এক বিচিত্র 'পোতলির পট'। যোগীর দৃষ্টি সর্বদা সেই সুন্দরীর প্রতিকৃতির উপর নিবদ্ধ। প্রশ্ন করিয়া লোরক জানল যে সে পট মোহরা রাজার দুহিতা চন্দ্রানীর।

পশ্চিমেন্ত এক রাজ্য আছেত গোহারি
তাহাতে মোহরা নামে রাজ্য-অধিকারী।
সুর-বংশ ধনুর্দ্ধর বীর অবতার
জামাতা বামন বীর দুর্জয় তাহার।
রাজসুখ ভুঞ্জয় বসিয়া বৃদ্ধকালে
বামন বীরের বাহুদর্পে ভূমি পালে।...
খর্ব্বরূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ
বামনবিক্রম যেন বলির উদাস।...
সর্ব্বগুণে যৌবনসম্পূর্ণ বীর্য্যবল
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।
তাহার রমণী নৃপ মোহরা-কুমারী
রূপে চন্দ্র সম নহে সে চান্দ গোহারি।...
সে রূপের কাহিনী প্রসরে নানা দেশ
রাজা সকলের কর্ণে অপূর্ব্ব বিশেষ।
অপূর্ব্ব সে রূপ বদি শুনয়ে শ্রবণে
মানস না হয় শান্ত না দেখি নয়নে।
তেকারণে ইচ্ছে লোক সে রূপ দেখিতে
শ্রবণনয়ন মাঝে বিবাদ খণ্ডিতে।...
নগর ভ্রময়ে কন্যা বৎসরে দু-বার
সকলের মনোবাঞ্ছা কন্যা দেখিবার।
পরব-সময় যদি হৈল উপস্থিত
দেবস্থানে যায় কন্যা দেব-সমুদিত।...
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি
নারীসঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি।
মাসেকে না চাহে নেউটিয়া নিজ নারী
বনক্রীড়া করে নিত্য যেন বনচারী।
প্রতি নিতি মহাবীরে কানন ভ্রমিয়া
শার্দূল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া।
বন ভ্রমি আইসে যদি দুর্জয় বামন
প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন।

বহুদিন নারীসঙ্গবিবর্জিত লোরকের চিত্ত বিচলিত হল চন্দ্রানীর ছবি দেখে ও বর্ণনা শুনে। যোগীকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল গোহারি দেশে। ছ'মাস কেটে গেল। অবশেষে চন্দ্রানী-দর্শনার্থী রাজাদের নিমন্ত্রণ হল রাজসভায়।

অব্দে দুইবার অভ্যাগত সকলেরে
সভা রচি বৃদ্ধরাজে নিমন্ত্রণ করে।

সাজসজ্জা করে লোরক রাজসভায় গেল। প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে চন্দ্রানী তাকে দেখে মুগ্ধ হল। আরও ছ'মাস যায়।

চিন্তে যুগী সনে রাজা বৎসর পূরিল
তথাপিহ কুমারীদর্শন না মিলিল।
অনুশোচে লোরক পোতল-রূপ হেরি
লভ্যের কারণে মূল হারাইলুঁ কড়ি।...
দৈবে মোর হৈল হেন দুই কূল হানি
তেজি আইলুঁ ময়নাবতী না পাইলুঁ চন্দ্রানী।
চন্দ্রানীর রূপ ভাবি লোরক ফাফর
বিদ্যারসে মগ্ন যেন বৈদেশী সুন্দর।

চন্দ্রানীর মনের কথা ধাই জেনে নিয়ে লোরককে চন্দ্রানীর রূপ দেখিয়ে দিলে দর্পণে রাজসভার মধ্যে। দর্পণে সেই রূপ দেখে লোরক মূর্চ্ছিত হল। ধাই তাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলে। যোগী-রূপ ধরে লোরক গেল দেবমন্দিরে। সেখানে দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হল। রাত্রিতে লোরক চন্দ্রানীর গৃহদুর্গে অভিযান করলে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। দু'জনের মিলন হল। বামন গিয়েছিল শিকারে। তার ফেরবার সময় আসন্ন হলে লোরক চন্দ্রানীকে নিয়ে পালাল বনপথে। বামন ফিরে এসে ব্যাপার বুঝলে এবং সসৈন্যে লোরককে ধাওয়া করলে। দু'বীরের দেখা হল বনের মধ্যে। যুদ্ধে বামন মারা পড়ল। চন্দ্রানীকে কাটল সাপে। তাকে এক সাধু বাঁচিয়ে তুলল। এমন সময় বুড়ো রাজা দূত পাঠালে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তারা ফিরে গেল।

কুমারকে অভিষেক করি নিজ দেশ
আপনে রহিল বৃদ্ধরাজ গুরু-ভেশ।…
হেন মতে পৃথিবী পালয়ে লোর-পতি
কতকালে বৃদ্ধরাজ পাইল স্বর্গগতি।
বৃদ্ধের মরণে হয় যুবকের আশ
হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস।

কপট সংসারমায়া বুঝিতে কি পারি
পিতৃকে মারিয়ে পুত্রে করে অধিকারী।
চারি যুগ বৃদ্ধ সতী যুবক আকার
প্রতিদিন এক স্বামী করয়ে সংহার।
তাহাকে গ্রাসিয়া পুনি আন স্বামী বরে
পাপিনী থাকিনী কাকে দয়া নাহি করে।…

গোহারিতে রাজা হয়ে লোরক চন্দ্রানীর সঙ্গে সুখে রাজ্য করছে। ওদিকে বিরহিণী ময়নাবতী সর্বদা দেবপূজায় ও স্বামীর মঙ্গলচিন্তায় নিরত।

সে কাহিনী অন্তঃপুরে রম্ভা সরোবর তীরে
শুচিরুচি কুসুম-উদ্যান
তাহাতে নির্জনে নারী আরাধে শঙ্করগৌরী
সর্বহিত স্বামীর কল্যাণ।

চাহন্ত রাজ্যের ভাল টুটউক জঞ্জাল
দ্বিজগুরুজন হৌক শান্ত
এই বর মাগে নারী গৌরীপদ অনুস্মরি
সত্বরে মিলউক নিজ কান্ত।

পতিবিরহিণী ময়নাবতীর রূপগুণের কাহিনী দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক রাজা-রাজড়া ধনী এসে জুটল মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরের মতো। তাদের মধ্যে একজন, নাম ছাতন, উদ্যোগ করলে বেশিরকম। সে রত্না মালিনীকে ময়নাবতীর শৈশবধাত্রী সাজিয়ে দূতীগিরিতে নিযুক্ত করলে। মালিনীর কপট স্নেহরসে মুগ্ধ হয়ে ময়নাবতী তপস্বিনীর বেশ ছেড়ে দিলে।

কুটনী-বচন শুনি ধাই হেন সত্য জানি
নাপিত বোলাই ততক্ষণে
সুগন্ধি কুসুম্ভ রঙ্গে মার্জ্জন করাইল অঙ্গে
স্নান করাইলা সখীগণে।
মনে ভাবে সে মালিনী মোর বুদ্ধি হস্তে রানী
এবে সে যাইব কোন স্থান

উপকথা নানাবর্ণে ভোলাই কহিমু কর্ণে
হৃদে যেন জাগে পঞ্চবাণ।…
তবেহ ময়নার সঙ্গ না তেজে মালিনী
কপটপ্রবন্ধে কহে নানান কাহিনী।
কৃত্যাসূত্রে বাক্যপুষ্প গুথিয়া কপটী
গরল পীলায় যেন অমৃত লেপটি।

মালিনী সর্বদা এই কথা ময়নাবতীর কানে জপতে লাগল,

হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক পুরুষ মিলাই দিমু ভুঞ্জ সুখভোগ।

ময়নাবতী বিরক্ত হয়ে বললে,

মোহর ভ্রমরা স্বামী জগৎপুজিত গোময়ের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত।

তার "সতীত্ববাণী" শুনে মালিনী ভাবলে, সোজা পথে যখন হল না তখন বাঁকা পথে চলতে হবে,

ঋতুমাস পরবেশ উপহাস্য ছলে কহিমু সুন্দরী যেন শুনে কুতূহলে।

নববর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে প্রথম আষাঢে। মালিনী বর্ষার সুখসম্ভোগ বর্ণনা করে শেষে ময়নাবতীর দুঃখ ভেবে কান্না জুড়লে সুহই রাগের পদাবলী ভেঁজে,

শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই

নাগর সুজন মিলাইয়া দেওঁ
রাধার কোলে কানাই।…

ময়নাবতী উত্তর দিলে আসাবরী রাগে,

আই ধাই কুজনী কি মোকে শুনাওসি
বেদ-উক্তি নহে পাটং
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়ে
যো বিধি লিখিছে ললাটং।
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বাণী
ধরম না চাহতি তেজি সতীত্বমতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি।...
দুরন্ত দুর্মতি দূতীপানা দূর কর
চিন্তহ মোহর কল্যাণং
কাজী দৌলতে ভনে দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ-খানং ॥

শ্রাবণ মাসে মালিনী জপাতে লাগল,

আনন্দের হিল্লোলে দম্পতী সব দোলে
কর্ম্মহীন বিরহিণী কান্ত নাহি কোলে।
এতেক বুঝিউ তুমি কর্ম্মহীন নারী
দুর্ভাগ্যের মত বঞ্চ রাজার কুমারী।
অবধি গোঙাইয়া গেল শুন ময়নাবতী
এই ঋতু পতি তোর না আইল সম্প্রতি।

তারপর শ্রী রাগিণীতে জুড়ল পদাবলী

কামিনী-মরমে মোহর বলবান
জীবনযৌবনধন আনন্দনিদান। ধু।
শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় দুখ লাগৌ
রিমিঝিমি বরিখয়ে মনে ভাব জাগৌ।
ধরতী বহয়ে ধারা রাতি আন্ধিয়ারী
খেলয়ে বধূর সনে প্রেমের ধামারী।
শ্যামল অম্বর শ্যামল খেতি
শ্যামল দশদিশ দিবসক জুতি।
খেলয়ে বিজলী মেহু চামরের সঙ্গে
তমসী ভীমশ্রী নিশি রঙ্গ-বিরঙ্গে।
শ্রাবণে সুন্দর ঋতু লহরী ওঘার
হরি বিনে কৈছনে পাইব পার।
খরতর সিন্ধুরব পবন দারুণ
চৌগুণ বাড়িয়া যায় বিরহআগুন।
আকুল কামিনীকুল কামভাবত্রাসে
পিয়া-পাও বন্দয়ে যে রতিরস-আশে।
জনমদুখিনী তুই রাজার দুহিতা
বিফল সে নাম ধর লোরের বনিতা।
সুজনপীরিত জান নিত্যনব মালা
লস্কর নায়কমণি জগ-উজিয়ালা ॥

ময়নাবতী উত্তর দিলে ভৈরবরাগে,

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল।
লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ
কোথায় গোময়কীট কোথায় মধুপ।...

ভাদ্রমাসের বিরহবর্ণনায় দূতী পঞ্চমুখ হল কল্যাণরাগে জয়দেবের ছাঁদে,

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা কামিনী
একাকী বসতি অতি ঘোরং
অধর মধুরৌ তাম্বূল বিনে ধূসরৌ
নিচল চকোর-আঁখি ঝোরং।
ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং
দুরন্ত বিরহানলৌ দহতি তব অন্তরৌ
তথাপি ন চেতই ময়না-চেতং।
বকফুল-মঞ্জরী কিমতি অতি সীদতি
মলিন আঞ্জন মুখ ভেশং
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী

অবিরত বিকল বিশেষং।
সিন্দুর বিনে শীশৌ মলিন কেশ ভেশৌ
কিমিতি মলিন তনুচীরং
শূন্য সুমন তনৌ শূন্য পাট সিংহাসনৌ
শূন্য সুবর্ণমন্দিরং।
শ্বেত ঋতু বরিষণ নিস্ফল ধনি বঞ্চসি
ন গুণসি হিতসুখসারং

এ ভবসুখসম্পদৌ কিমিতি ধনি বঞ্চসি
তব তাত জগ-অধিকারং।
ভনতি কাজী দৌলত দূতী চাটুপাটু কৃত
সতীকর্ণে অট বিষ মানং
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুত আশরফ-খানং॥

ময়নাবতীর উত্তর ধানশী রাগিণীতে,

চকা-চকীত জিনি রজনী দম্পতী বিনি
একাকিনী জাগি প্রেম-ত্রাসে রে
লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর
তনু দহে মদন-হুতাশে রে।

অবিরত লোর ইতি জপয়তি কলাবতী
আন মনে সমতুল নহে রে
শ্রীযুত আশরফ-খান শুনহ সতীর গুণ
কাজী দৌলতে রস গাহে রে॥

আশ্বিন মাসের গুণবর্ণনা করলে রত্না, তবুও ময়নার ধৈর্য টলল না। তখন প্রণয়কেলিজল্পনা ছেড়ে মালিনী ধরলে তত্ত্বকথা,

যেবা বল ময়নাবতী মৃত্তিকার কায়া
মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ-আপ্ত কায়া।...
পরমহংসের খেলা মাটির পাঞ্জর
মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর।...
কে বুঝিবে মাটি-মর্ম্ম পরম সংশয়

হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয়।...
মহামায়া-মাটি-মগ্ন হই যুবাজন
নারীর লাবণ্যরূপে মজিয়াছে মন।
তরুমূলে গ্রাসি যেন ভূমি রহিয়াছে
নারী-মায়াপাশে তেন পুরুষ রহিছে॥

অগ্রহায়ণে রত্না পুরাণ-কথার উদাহরণ পাড়লে,

ধর্ম্মশাস্ত্র-বহির্ভূত নহে কামকেলি
রাধা বিনু নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী।
পুরুষবিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী

সেহ চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী।...
এতেক তোমারে কহি হিতের বচন
পদার্থ না বুঝি কর আমাকে গঞ্জন॥

ময়না বিরক্ত হয়ে বললে, শৈশবের ধাত্রী বলে কিছু বললুম না, কিন্তু—

এসব শুনয়ে যবে জনক ভূপাল
ছত্রপতি তোর শিরে বৈঠাইব কাল।...

পৌষ মাসের বর্ণনায় মালিনীর স্বর নরম হয়েছে,

দীর্ঘলী রজনী বৈরী হইল তোমারি
কোথায় সে কান্ত তোর কোথায় মাধুরি।
অবধি গোঞাইয়া গেল না আসিল লোর

না পূরিল কামকলা রতিরস তোর।
মালিনী মিনতি করি নিবেদয়ে বাণী
ধীর জগৎভোগ লও অনুমানি।...

ময়নাবতী উত্তর দিলে সিন্ধুড়া রাগে,

প্রাণের দুর্লভ কান্ত দেখিলে হৃদয় শান্ত
আঁখিযুগে পীয়ায় সানন্দ
মধুরমুরতি পতি আলোল-বিলোল গতি
অমৃতমণ্ডলি মুখচান্দ।
কর ত দেয়ন্ত লোরে যদি মোর শির পরে
না দোলয়ে দেহ যে আমার
সতী নামে ময়নাবতী জগতে রাখিমু খ্যাতি
মরণেত মুক্ত স্বর্গদ্বার।··

মাঘ মাসের প্রস্তাব শুনে ময়নাবতী মালিনীর মতলব হৃদয়ঙ্গম করলে। সে ভাবলে,

নগরিয়া লোক নগরে থাকে
শতমুখে ধাই বাখানে তাকে।
কত কত মুই শুনিব বোল
ঘাটে বসি দুই হারাইলুঁ কূল।
কুলটা মালিনী কুপন্থে চলে
মোকে-হ কুপন্থে লই যায় ছলে।···
ধাই-জন হয় জননীতুল
সে কেন কহে এত কুবোল।
ধাই হেন মোর না লয় মন
পুণ্য ছাড়ি কহে পাপবচন।···

ফাল্গুন মাসে মালিনী লোভ দেখালে বসন্ত-উৎসব দোলক্রীড়ার,

সুরঙ্গ ফাগুর গুঁড়া পরিয়া সকল
হরিগুণ গাহে সবে নগরে মঙ্গল।···
সুবিচিত্র পাটাম্বর কোঞ্চা পরিধান
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গশোভা কেয়ূর কঙ্কণ।
বান্ধিয়া পাটলি চূড়া কুঙ্কুমে জড়িয়া
বাহেন্ত তবল তাল যুবক মিলিয়া।
মৃদঙ্গ কর্ত্তাল বাজে কহন না হয়
ত্রিভঙ্গ মোহন বেশে মৃদঙ্গ বাজায়।
হেলি ঢলি বাহে তাল ভ্রময়ে মধুর
হরিগুণে পদগানে হরিষে অন্তর।
খেলয়ে নাচয়ে ফাগু-রঙ্গ দশ-বিশে
মৃত্তিকাপ্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে।

ময়না অটল রহিল। চৈত্র-বৈশাখের মাধুর্যেও সে ধৈর্যহারা হল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে রত্নার সবটুকু কথা বলবার অবসর কবির হল না। এইটুকুই দৌলৎ কাজীর শেষ রচনা,

জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ বৎসর হইল শেষ
দুঃখদশা না গেল তোমারি
দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিরহের শোকান্তরে
চন্দ্রকলা যেন যায় জরি।
বহয়ে বন মন্দপ বাজায় মদনে দ্বন্দ্ব
হৃদে জাগে বিরহ-আনল
পতি-রতিক্রিয়া গেল সে কান্ত আর না দেখিল
শরীর দগধে শ্রমজল॥

সুদীর্ঘকাল পরে কাব্যের বাকি কাহিনীটুকু পূরণ করেছিলেন আলাওল। এ অংশের রচনা বর্ণনাময় ও অনুজ্জ্বল। আলাওল একটি দীর্ঘ অবান্তর কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। ময়নাবতীর ধৈর্য-উপদেশক সখীর মুখে রতনকলিকা-মদনমঞ্জরীর উপাখ্যান। আলাওলের উপসংহার সংক্ষেপে বলি।

দূতীকে লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দিয়ে ময়না সখী চন্দ্রমুখীর উপদেশে ধৈর্য ধরে রইল। চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষার পর ময়নাবতী স্বামীর কাছে দূত পাঠালে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, যাঁকে "গুণিগণে মানুয়ে দ্বিতীয় কালিদাস", যিনি

কাব্যে কালিদাস সম হয় দ্বিজবর
শাস্ত্রে বররুচি কিংবা উমাপতিধর।

ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর ছেলে হয়েছে, তার নাম হল প্রচণ্ডতপন। লোরের সভায় গিয়ে ব্রাহ্মণ হাজির হল এবং রাজার কাছে শিক্ষিত শারিকা পাঠিয়ে দিলে ময়নাবতীর দুঃখকাহিনী নিবেদন করতে। শারী বললে,

পুণ্য মহী তোমাকের দিব্য পিতৃভূমি ময়না হেন গুণবতী তেজি বিনি দোষে।...
বিচারি ভুবন তেন না দেখিল আমি। কোন দোষ তোমার বলিতে নারি আমি
হেন স্থল সব তেজি শ্বশুরের দেশে বিস্মরি রহিছ আত্মনারী জন্মভূমি।...

লোরের চেতনা হল। মাণিক্যপুরের রাজা শূদ্রসেনের কন্যা চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বদেশে ফিরে এল এবং দুই রানীকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল। লোরের মৃত্যু হলে ময়নাবতী-চন্দ্রানী সহমৃতা হল।

এই কাহিনীর ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা পৌঁছই চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য বর্ণনরত্নাকরে "লোরিক নাচো"-র উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে পূর্ব-ভারতের অঞ্চলবিশেষে লোর-চন্দ্রানীর নাটগীত নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণ বিহারে আহীরদের মধ্যে লোরিক-মল্লের গান মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে। বিহারী লোরিক-মল্লের গীতের পরিচয় শিক্ষিত সমাজে প্রথম প্রচার করেন গ্রীয়র্সন। এঁকে এইকাজে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বিহারী কাহিনীর মর্ম দেওয়া গেল। এর থেকে দৌলৎ কাজীর কাব্য-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজেই বোঝা যাবে।

লোরিক-মল্লের জন্ম গৌড়ে। তার বাপ বুড় বাঁইয়া (বুড়ো বামন), মা বুড় খুলেন (বুড়ি খুল্লনা), পত্নী মাজর (কাজীর ময়না)। গৌড়ের রাজা মাহারা (কাজীর মোহরা), তার কন্যা চানায়ান (চন্দ্রভানু, কাজীর চন্দ্রানী)। এর বিয়ে হয়েছিল সেওধারীর সঙ্গে। দেবী পার্বতীর শাপে এই বিবাহ দাম্পত্য মিলনে সার্থক হয় নি, তাই রাজকন্যা বাপের বাড়িতেই রয়ে গেল। তারপর লোরিকের সঙ্গে চানায়নের দর্শন, প্রেম ও পলায়ন। চানায়নকে নিয়ে লোরিক গেল হরদি রাজার রাজ্যে। সে রাজসভায় পালোয়ানের কাজ নিলে। তার বাহুবল দেখে রাজা পেলে ভয়। লোরিককে জব্দ করবার জন্যে রাজা তাকে পাঠালে ভাগিনেয় হারোয়া রাজার কাছে। লোরিকের সঙ্গে সংঘর্ষে হারোয়া রাজা প্রাণ হারালে। ভাগিনেয়ের কাটামুণ্ডু এনে লোরিক মামাকে দিলে। হরদি রাজা তখনি লোরিককে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পালাল। সেখান থেকে লোরিক চানায়নকে সঙ্গে করে গেল দোসাদ রাজার রাজ্য ঠকপুরে। সেখানকার রাজাপ্রজা সকলেই ঠক। সেখানে পাশা খেলে লোরিক হল সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠিরের মত। দোসাদ রাজা যখন চানায়নকে অন্তঃপুরজাত করবার জন্যে পালকি পাঠালে তখন চানায়ন বললে, 'এখনও খেলা শেষ হয়নি, আমার সোনার কৌটো তিনটি আর পায়ের আংটি এখনও রয়েছে, তাই নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে খেলব, এবং হারলে তোমার ঘরে যাব।' চানায়নের সঙ্গে খেলায় রাজা হারতে লাগল। তারপর লোরিক রাজার সৈন্যসামন্তকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করলে। ঠকপুর জয় করে লোরিক গেল কৈলরপুরে। সেখানকার রাজা করিঙ্গা (কলিঙ্গ) বড় বীর। রাজার বাগানের একপাশে লোরিক ও চানায়ন বাসা নিয়েছে। রাজা চানায়নকে দেখে প্রেমে পড়ল। লোরিক এগিয়ে এল যুদ্ধং দেহি বলে। এবারে তার হল হার এবং তাকে চড়ানো হল শূলে। চানায়ন কাতর হয়ে

ইষ্টদেবী দুর্গাকে ডাকতে লাগল। দেবী সদয় হয়ে লোরিক-মল্লকে উদ্ধার করলেন। তারপর আবার যুদ্ধ বাধল। সাতদিন সাতরাত যুদ্ধের পর করিঙ্গা রাজা প্রাণ হারাল। লোরিক সিংহাসন অধিকার করলে। বছরখানেক কাটলে চানায়ন স্বামীকে বললে, 'আমাকে তীরহুত দেশ দেখাও।' লোরিক চলল তীরহুতে। সেখানে হিউনির নবাব তাকে পরাস্ত করে বন্দী করলে। চানায়ন খবর পাঠালে দেবর মহাবীর সওয়াকে। সে এসে নবাবকে হারিয়ে দিয়ে দাদাকে উদ্ধার করলে। কিছুকাল পরে লোরিকের মন গেল অতিরছা মুলুক অধিকার করতে। তার এই অভিলাষ জেনে দুর্গাদেবী বললেন, 'ওদেশ আমি আমার বোনকে দিয়েছি, ওখানে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।' নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পত্নী চানায়ন ও পুত্র চন্দ্রাজিৎকে সঙ্গে নিয়ে "ঘোড়-কাটর"-এ চেপে চলল অতিরছা মুলুকে। সেখানে ঘোড়া মরল, আর লোরিক হয়ে গেল ফড়িঙ। গৌড়ে থেকে তার প্রথম পত্নী মাজরকে দুর্গা স্বপ্নে স্বামীর এই দুর্গতি জানিয়ে দিলেন। মাজর ছিল পূর্বজন্মে ইন্দ্রাসনের পরী। স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার সময় সে দেবতার কাছে দান পেয়েছিল এক সবুজ ঘোড়া এবং মৃতসঞ্জীবন জল। এই "হরিয়র" ঘোড়ায় চেপে মাজর পৌঁছল অতিরছা মুলুকে আড়াই ঘড়ির মধ্যে। মৃতসঞ্জীবন জল ছিটোতে লোরিক পুনর্মানব হল। তারপর যথারীতি মিলনের পালা।

শান্তিনিকেতনে ক্লাশ। লিনোকাট। শিল্পী শ্রীআভাস সেন, বয়স বারো

'বিদ্যায়তনে শিল্পকলা', পৃ ১৫৭, দ্রষ্টব্য

রাজা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাজা নাটকে অদৃশ্য 'রাজা'কে বাদ দিলে প্রধান চরিত্র চারটি। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ। চারজনেই বিভিন্ন পন্থায় রাজার সাক্ষাৎ পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। সুরঙ্গমার ও ঠাকুরদার 'রাজা'র উপলব্ধি ঘটিয়াছে, সুদর্শনার ও কাঞ্চীরাজের উপলব্ধির বিচিত্র ইতিহাসই রাজা নাটক। ইহাদের চারজনের উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন, অন্যত্র বলিয়াছি। কী সেই পন্থা?

সুরঙ্গমা দাসীভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে।

ঠাকুরদা তাহাকে ভজনা করিয়াছে বন্ধুভাবে।

সুদর্শনার সাধনপন্থা মধুরভাবে, সে রাজার মহিষী।

আর কাঞ্চীরাজ রাজাকে ভজনা করিয়াছে শত্রুভাবে — সে রাজার শত্রু, সে রাজবিদ্রোহী।

নাটকখানির প্রারম্ভেই দেখিতে পাই যে, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা সাধনার শেষে উপনীত, তাহারা সিদ্ধকাম। তার কারণ দাসীরূপে ও সখারূপে সাধনার দায়িত্ব গুরুতর নয়, তাই তাহার সিদ্ধিও অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। মধুরভাবের সাধনাই কঠিনতম, তাই তাহার সিদ্ধিতে জীবনের চরমতম সার্থকতা। আবার যে শত্রুরূপে ভজনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তোলে, অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে সে ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কেবল যে হতভাগ্য ব্যক্তি দুর্বলতাবশত সাধনপন্থা হইতে দূরে রহিয়া যায়, তাহার গতি হয় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

রানী সুদর্শনার সহচরী সুরঙ্গমা রাজার দাসী। সে রানীর নিকটে আপন সাধনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছে, সিদ্ধিলাভ করিতে অল্প দুঃখ সহ্য করিতে তাহাকে হয় নাই। সিদ্ধিলাভ সে করিয়াছে বটে — তবু সে দাসীমাত্র, কারণ দাস্যভাবের সহজতর পন্থাকেই সে অবলম্বন করিয়াছিল।

"সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত — মদ খেত আর জুয়ো খেলত।...

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত ক'রে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল, ইচ্ছে হ'য়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে। আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল?

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম — সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত।

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর। কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা।...

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন ?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক, ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।"

ইহাই সুরঙ্গমার সাধনার ও সিদ্ধিলাভের ইতিহাস। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও সে রাজার দাসী ছাড়া কিছুই নয় — নিম্নতর স্তরের সাধনার সহজসিদ্ধি !

"সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।...

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে ? রানী হয়ে আমার হয় না কেন ?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল।"

দাসী হইবার সাধনা সে করিয়াছে, মহিষী হইবার বাসনা সে করে নাই। যে তাঁহাকে যেরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে সেইরূপেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে।

এই ভাবটি ঠাকুরদার একটি উক্তিতে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। একজন নাগরিক বলিয়া বেড়াইতেছে যে দেশের রাজা কুৎসিত, তাই তিনি দেখা দেন না। ঠাকুরদা বলিতেছে — "ওর রাজা কুৎসিত বই কি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন ?... ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।"

ঠাকুরদার ভাষায় "তার আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই, সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত।"

ঠাকুরদা রাজাকে সখারূপে ভজনা করিয়াছিল, তাই সিদ্ধিলাভ করিবার পরে কেবল রাজার সঙ্গেমাত্র নয়, রাজার সমস্ত প্রজার সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সে বয়সনির্বিশেষে সকলেরই বয়স্য।

"সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু। আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কি, কর কি রানী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।"

এ অবস্থায় উপনীত হইতে তাঁহাকে অল্প দুঃখ পাইতে হয় নাই। ঠাকুরদা বলিয়াছে "চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" একে একে তাহার পাঁচটি ছেলে মারা গিয়াছে — তবু সে রাজাকে দোষী করে নাই, অল্পবুদ্ধি অন্য লোকের মতো বলে নাই

যে দেশে ধর্ম নাই বা রাজা 'ধর্মের রাজা' নয়। সবাই যখন শুধায়, এত যে বন্ধুত্ব — তার কী পুরস্কার মিলিল ? ঠাকুরদা উত্তর করে "বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয় ?"

পুরস্কার হয়তো রাজা দেন না — কিন্তু সম্মান দেন, গৌরব দেন। গৌরব মানেই সেই বস্তু যাহা বহন করিতে শক্তির আবশ্যক হয়। সাধনার দ্বারা ঠাকুরদা সেই শক্তি অর্জন করিয়াছে। তাই প্রয়োজনের সময়ে রাজা তাহাকে সেনাপতি সাজাইয়া বিদ্রোহী নৃপতিদের শিবিরে প্রেরণ করেন।

ঠাকুরদাকে দেখিয়া নৃপতিদের একজন শুধায়— "তুমি কে ?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।"

অন্যান্য দুর্বলচিত্ত নৃপতিগণ যখন রাজার আহ্বানে পরাভব স্বীকার করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইবে বলিয়া জানায়, কাঞ্চীরাজ স্পর্ধার সঙ্গে বলে — "আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত, কিন্তু সভায় নয় — রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।"

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ঠাকুদার উক্তি পুরাতনী বাণীরই নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবে রাজার ভজনা করিয়াছিল এবং শক্তিমান বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইয়াছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শক্তির যেখানে বিশেষ প্রকাশ সেখানেই রবীন্দ্রবাণীর আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। সে শক্তি কবির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইলেও কবির প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক এবং রক্তকরবীর রাজা দৃষ্টান্তস্থল। বিজ্ঞানে শক্তির বিশেষ প্রকাশ বলিয়াই বিজ্ঞানের আপাত অপকারিতার বহু দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অবহেলার যোগ্য মনে করেন না। কাঞ্চীরাজ সম্বন্ধেও ইহা সর্বথা প্রযোজ্য।

কাঞ্চীরাজ ষড়যন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহী, সুদর্শনাকে বলে কাড়িয়া লইতে সে প্রস্তুত ; তারপরে সুদর্শনার রাজা যখন তাহাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিলেন, তখন সে অপর সকলের মতো পিছাইয়া না পড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে পরাজিত হইল বটে — কিন্তু তেমনি রাজার প্রসাদও লাভ করিল। তাহার শক্তি আত্মমুখিতার খাত পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎমুখিতার পথে প্রবাহিত হইল, কাঞ্চীরাজের শত্রুভাবের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল।

১৮-দৃশ্যে দেখিতে পাই কাঞ্চীরাজ রাজার সন্ধানে পথে বহির্গত। ঠাকুরদা শুধাইতেছে — "একি কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে !

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন ক'রে আর কতদিন এড়াবে ? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজাপতাকা

ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক সে যত বড়ো রাজাই হোক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে।..."

১৯-দৃশ্যে দেখিতে পাই রাজ-সম্মানের পথে সুদর্শনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিল। যাহাকে সে উপভোগের বস্তু বলিয়া কামনা করিয়াছিল, বুঝিতে পারি, 'রাজা'র প্রসাদে তাহার সহিত যথার্থ সম্বন্ধে সে স্থাপিত হইয়াছে।

সকলের চেয়ে রানীর সাধনা কঠিনতর, কারণ সে সাধনা মধুর রসের সাধনা। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রণয়ীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে সুকঠিন দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাধিকার চোখের জলে কালিন্দীধারা চির বন্যাময়ী, সে অশ্রুধারার না আছে অন্ত না আছে পার। কারণ কৃষ্ণকে তাহার প্রণয়ীরূপে পাইবার বাসনা। সুদর্শনা ও রাধিকা একই লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু রাজা অমনি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি, মলিনতা ও অহঙ্কার নিঃশেষ করিয়া দিয়া তবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা তাহাকে প্রথম হইতেই প্রেয়সী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, রানীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সুদর্শনা তো রাজার স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে যথার্থভাবে পাইতে চেষ্টা করে নাই। সে বাহিরে তাকাইয়াছিল, অন্তরের মধ্যে সন্ধান করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। সেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল।"[১]

রানী সুবর্ণকে নিজের রাজা বলিয়া ভুল করিল। এই ভুলের আসল কারণ অন্ধকার গৃহের সাধনা তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইবার আগেই সে বহির্বিশ্বে রাজার সন্ধান করিয়াছিল। নাটকের প্রথম দৃশ্যে রানীকে অন্ধকার গৃহে দেখিতে পাই, এখানেই রাজার সহিত তাহার মিলন হইয়া থাকে। রানীর কাছে ঘরের অন্ধকার অসহ্য, সে রাজাকে বলে, "আমাকে বাহিরে লইয়া চলো, আলোয় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।" "রাজা বলেন, কালে তাহা হইবে, আগে তোমার অন্ধকারের সাধনা সমাপ্ত হোক, নতুবা তুমি ভুল করিয়া বসিবে।" রানী শোনে না, বাহিরে তাহাকে সন্ধান করিবার অনুমতি রাজা দেন, রানী পরম ভুল করিয়া বসেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, অন্ধকার গৃহ বলিতে কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয় — অন্ধকার গৃহ বলিতে তিনি মানুষের সাধনার পর্বকে বুঝিয়াছেন। আর এ সাধনা যে মধুর ভাবের

---

১ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সব সাধনার জন্যই যদি নৈভৃত্যের আবশ্যক, মধুর রসের সাধনার জন্য তাহার আবশ্যক সমধিক। বস্তুত যেখানে যে-কেহ সাধনা করিয়াছে, তাহাকেই একটা পর্ব অন্ধকার গৃহে কাটাইতে হইয়াছে। সিদ্ধার্থকে নৈরঞ্জনা নদীতীরে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল সাধনা করিতে হইয়াছিল, সেটা অন্ধকার গৃহের অনুরূপ। তখন তাহাকে 'মার' কত রূপেই না ছলনা করিতে চাহিয়াছিল। সকল সাধককেই কখনো-না-কখনো 'সুবর্ণে'র ছলনায় পড়িতে হয়। কিন্তু যে-সৌভাগ্যবান সিদ্ধার্থ হইয়াছে — তাহাকে 'সুবর্ণ' ভোলাইতে পারে না। সুদর্শনা সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ঠকিয়া গেল। অমনি তাহার প্রবঞ্চিত চিত্তকে কেন্দ্র করিয়া অগ্নিদাহ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্যময় অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল।

"তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইল, তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল।"[২] নাটকখানিতে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদর্শনা চরম ভুল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবু তাহার অন্তরের সুগভীর স্থানে রাজার জন্যে একটা আকুলতা বরাবর ছিল, আবার রাজাও তাহাকে পরম ভুলে ও পরীক্ষায় ফেলিলেও কখনো সত্যিই তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। কবি যেন বলিতে চান, মানুষ যতই ভুল করুক যতই দূরে যাক তাহার রাজাকে কখনো আমূল বিস্মৃত হয় না। আবার রাজাও তাহাকে সমূলে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মানুষকে দুঃখ দেন বটে কিন্তু সে তো তাঁহার প্রসাদেরই রূপান্তর।

নাটকের শেষ দৃশ্যটিতে আবার অন্ধকার গৃহ। এবারে দেখি অন্ধকার গৃহ সুদর্শনার পক্ষে আর তেমন অসহ্য নয়। প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার গৃহের রানী রাজাকে সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল — তাই তাহার আলোকের জন্য ব্যাকুলতা ছিল। এখন রানী বুঝিতে পারিয়াছে — তাঁহার রাজা সুন্দর নয়, অনুপম। তাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ও আলো দুইই তুল্যমূল্য। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন — "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো,— আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"

এইখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি। অন্ধকারে যাহার সূচনা, আলোতে তাহার উপসংহার, সাধনায় আরম্ভ হইয়া সিদ্ধিতে তাহা উপনীত। অন্ধকার গৃহে জীবন যাপনের পালা শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র রাজা রানীর সম্মুখে বহির্বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।[৩]

---

২ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

৩ প্রফুল্লর সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভবানী পাঠকও তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই। সুদর্শনাও আর করিবে না বুঝিতে পারা যায়।

২

বর্তমান নাটকের রাজা কে? চরাচরের যিনি রাজা সেই ভগবানকেই এই নাটকে রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্যময় রূপটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রাজারূপে তিনি বর্তমান নাটকের নায়ক। ভগবানের সহিত মানুষের যত রকম সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে তন্মধ্যে আবার মধুর রসের সম্বন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রানীরূপে সুদর্শনা এই গ্রন্থের নায়িকা। জন্মপূর্ব হইতেই মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে বটে — কিন্তু মানুষকে সাধনার দ্বারা সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাধনার নাম তপস্যা — যে তাপে তপস্যা উজ্জ্বল হইয়া সার্থকতা লাভ করে তাহা দুঃখের তাপ। তাই মহিষী সুদর্শনাকে সুগভীর দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহাকে সিদ্ধির তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদর্শনার দুঃখের মূলে তাহার একটি ভুল, সে তাহার রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিয়াছিল। এই ভুলটি হইতে তাহার দুঃখের সূত্রপাত, আর সেই দুঃখ হইতে নাটকীয় ঘটনার বিবর্তন। সুদর্শনার রাজা চোখে দেখিবার বস্তু নহেন। "রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ।"[৪]

সুদর্শনার প্রভু "কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, তিনি সকল দেশে সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় — এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"[৫]

রূপক ছাড়িয়া দিলে নির্গলিত প্রশ্নটি দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না ইন্দ্রিয়াতীত, তিনি যদি বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে না থাকেন, তবে তিনি সকল রূপে, সকল স্থানে, সকল দ্রব্যে অবশ্যই আছেন। কিন্তু সকলের মধ্যে কি বিশেষ অন্তর্গত নয়? তাহা হইলে কি দাঁড়ায় না যে তিনি যুগপৎ বিশেষ ও নির্বিশেষ! অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত! বস্তুতঃ তিনি দুই-ই। তিনি 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র', আবার 'অন্তর মাঝে শুধু একা একাকী', বিচিত্রের আলয়রূপে তিনি আকাশ, আর অন্তরবাসীরূপে তাঁহার আলয় নীড়, 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়'। তিনি একাধারে ভাবময় ও রূপময় বলিয়া 'ভাব হতে রূপে' এবং 'রূপ হতে ভাবে' জগৎচক্র আবর্তিত হইতে পারে। রাজার এই স্বতোবিরুদ্ধ স্বভাবের সত্যটি বুঝিবার জন্য আপন অন্তরের আনন্দরসে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তরের বীক্ষণাগারে আনন্দরসের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া জগতে বাহির হইলে আর ভুল করিবার আশঙ্কা থাকে না। সেই বীক্ষণাগার সুদর্শনার অন্ধকার গৃহ। বীক্ষণাগারের কার্য শেষ হইবার আগেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতেই তাহার দুঃখের সূচনা।

রাজা নাটকের ভাব-উপজীব্য হইতেছে মানব-হৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস। এই নীরস

৪ ও ৫ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

তথ্যটি নাটক নয়, নাটকের শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র। কঙ্কাল চিরকালই শুষ্ক। আর সমালোচকের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক সময়েই তাহাকে কঙ্কালের সন্ধান রাখিতে হয়। যতটা সম্ভব কবির বাক্য উদ্ধার করিয়া কঙ্কালের নীরসতা ঢাকিতে চেষ্টা করিব — কিন্তু একেবারে ঢাকা পড়িবে এমন আশা করিতে কাহাকেও বলি না।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান একাধারে বিশেষরূপ ও বিশ্বরূপ। প্রেমের সম্পর্কে তিনি বিশেষরূপ, জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি বিশ্বরূপ। অর্জুনের সখারূপে তিনি কৃষ্ণ, অর্জুনের গুরুরূপে তিনি বিশ্বরূপের প্রদর্শক। তিনি সান্ত, তিনি অনন্ত। ঠাকুরদা বলিতেছে—

"আপনাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্ররূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলঙ্কার।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছে — "আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না ?

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বই কি ! নইলে বাঁচব কী ক'রে ?

রাজা। কী রকম দেখেছ ?

সুদর্শনা। সে তো এক রকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম — এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্কা শাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে — তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু···

রাজা। এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখ্‌তে চাচ্ছ ?"

আবার কেবল সর্ব প্রকৃতিতে নয়, সর্ব মানবে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঠাকুরদার ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারি—

"প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে-তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান থেকেই যায়।"

ঠাকুরদার গানেও এই তত্ত্বটি আছে — "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

প্রাণের মানুষ অর্থাৎ বিশেষ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ।

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।"

তিনি মানুষের মনের সকল অবস্থাতেই বিরাজমান

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে ?"

সার্থকতা, ব্যর্থতা, সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁহার প্রকাশ।

এ গেল রাজার বিশ্বরূপ :

প্রেমের সম্পর্কে অর্থাৎ সুদর্শনার অন্ধকার ঘরটিতে তিনি বিশেষরূপ, সেখানে তিনি বিশ্বরাজ নহেন, সুদর্শনার হৃদয়ের নিঃসপত্ন রাজা।

"সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা, এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।"

আবার রাজার কথায় জানিতে পারি—

"আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।"

ইহাই তাঁহার বিশেষ রূপের পরিচয়। তবে সে বিশেষ রূপ যে সুদর্শনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, সে তাহার দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের আসল কারণ রাজার সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্কটি সত্য হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি সুন্দর, তিনি অনুপম; আর অপ্রেমের দৃষ্টিতে তিনি ভয়ানক। সুদর্শনা নিজেই সে কথা বলিয়াছে—

"সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।"

সুরঙ্গমাও এক সময়ে অনুরূপ ভীতি অনুভব করিয়াছে— তখন সে রাজাকে 'ভয়ানক' দেখিয়াছিল। তারপরে তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দাসী হইবামাত্র তাহার সমস্ত বেদনা সার্থক হইয়া গেল।

ভগবানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার সংগতিসাধন প্রেম। তাহার বিপরীত অপ্রেম। এ প্রায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির মর্মার্থের অনুরূপ—

'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।'

প্রেমের সম্পর্কে দুই পক্ষ না হইলে চলে না। এ পর্যন্ত গেল মানুষের পক্ষের কথা। ভগবানের পক্ষ হইতেও মানুষের প্রতি টান অল্প নয়। তাঁহার চোখে মানুষ সুন্দর, মানুষ তাঁহার প্রিয়, মানুষ তাঁহার বহুকালের ধ্যানের ধন— নতুবা কি মানুষকে তাঁহার প্রেয়সী বলিয়া কবিরা কল্পনা করিতে পারিত?

"সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না, নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না, ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি

দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!"

আত্মকেন্দ্রী মানুষ অকিঞ্চিৎকর, সে রূপ তাহার যথার্থ নয়। নিজেকে যথার্থভাবে জানিবার উদ্দেশ্যেই নিজেকে ভগবদ্দর্শনে প্রতিফলিত করিয়া দেখা আবশ্যক। কবি যেন ইহাই বলিতে চান। ইহার জন্যই মনুষ্যের যত ধ্যানধারণা, ধর্মসাধনা, উপাসনা ও প্রার্থনা। নতুবা এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের আর কোনো সার্থকতা দেখা যায় না। মানুষ দুঃখ কষ্ট ক্ষয় ক্ষতির মধ্য দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছে। তিনি তাহার চোখ বাঁধিয়া খেলার আঙিনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন — আর বলিতেছেন, এখারে ধরো তো। চোখ বাঁধা বলিয়াই খেলার রস জমিয়া ওঠে। চোখের বাধা মনের সাধনার দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে — ইহাই খেলার নিয়ম, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। দুর্ভাগিনী সুদর্শনার আর বিলম্ব সহিল না। সে ভাবিল চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেই মনের সাধনার অভাব পূরণ হইতে পারে।

৩

সুদর্শনা সুবর্ণর গলায় মালা দিল। সে বুঝিতে পারিল না যে সুবর্ণ ছদ্মবেশী রাজা, সে ভণ্ড। সুবর্ণ কে ও কী? যাহা কিছু বা যে-কেহ মানুষের দৃষ্টিকে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিকে টানে, জীবনের চরিতার্থতার দিক হইতে সাংসারিক সার্থকতার দিকে টানে, ভগবানের দিক হইতে তাঁহার বিকল্পের দিকে টানে — তাহাই বা সে-ই সুবর্ণ। সুবর্ণ শব্দটির সুপ্রয়োগ হইয়াছে। সুবর্ণ বলিতে সুন্দর, স্বর্ণ ও মিষ্টবাক্য তিনই বোঝায়। প্রধানত এই তিনটির মোহেই মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়, সুদর্শনারও আত্মবিস্মরণ ঘটিয়াছিল।

সুবর্ণর ধ্বজায় কিংশুক অঙ্কিত। কিংশুক যথার্থই তাহার প্রতীক। দৃষ্টিসুন্দর এই পুষ্পটি গুণহীন বলিয়া কথিত। বাহ্য সৌন্দর্যের অধিক সম্পদ কাহারো নাই — না পুষ্পটির না ব্যক্তিটির। কিন্তু রাজার পতাকায় অঙ্কিত প্রতীক পদ্ম ও বজ্র কত গভীর ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পূর্ণ। পদ্মের সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য ও কোমলতা, বজ্রের অটল কঠোরতার সহিত মিলিত হইয়া সার্থক পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিংশুক বা সুবর্ণ তাহা কোথায় পাইবে? ভগবান কি একাধারে পদ্মের মতো কোমল এবং বজ্রের মতো কঠিন নয়? রবীন্দ্রনাথের কল্পিত প্রতীকটি অপর এক কবির কল্পিত রামচরিত্র স্মরণ করাইয়া দেয় — 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।'

৪

নাটকের স্থান কাল ও পাত্রের মধ্যে এ পর্যন্ত পাত্রের আলোচনা হইল। এখন স্থান ও কালের আলোচনা করা যাইতে পারে। আগে কালের আলোচনা করা যাক। নাটকটির কাল শুধু বসন্ত নয়, একেবারে বসন্তোৎসবের দিন। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে চলিবে।

"রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন — রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। শরতের মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব যদি কিছু থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী — সে রাজসন্ন্যাসী, তাহার যা কিছু

ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

"এই নাটকে দু'জন রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় রাজা ঋতুরাজ বসন্ত। দু'জনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজ অনন্ত-ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজাও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের তাহার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরে তিনি একক, রূপহীন — তিনি অরূপরতন।

"এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

"যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

"রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না, তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

"দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়, দেখিলে ভুল হইবে; সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। এক সময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন সে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে।··· সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত নয় — ইহা ভক্তের দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতমভাবে বুঝিতে পারে নাই।

"এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে সত্যভাবে রাজাকে জানেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টি সখার দৃষ্টি, রাজাকে তিনি বন্ধু বলিয়া জানেন। কবি বলিতে চাহেন ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। যে সেই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

"ইহার আগে কবি মানুষের জীবনলীলার অনুকল্প প্রভৃতিতে দেখিতে পাইয়াছেন। এখানে অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানে আর মানুষের লীলা নয়, স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুকল্প প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাত-বিরোধ, ঋতুরাজের স্বভাবেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের লীলামঞ্চের পটভূমিকারূপে ঋতুরাজকে কবি দাঁড় করাইয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের সংগতি ঘটিয়া গিয়াছে। অন্তর ও বাহিরের যে বিরোধ, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাত-বিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই সব ত্যাগ করিতে সক্ষম, বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়, আর

একটি অন্ধকার ঘরে রানীর সঙ্গে তাঁর মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য, কিন্তু রানী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পান না; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; কারণ সুদর্শনার প্রভু — 'কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দ-রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।'"[৬]

এতক্ষণ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে তাহার তাৎপর্য কী। বুঝিতে পারা যাইবে কবি কেন বিশেষভাবে বসন্তঋতুকেই পটভূমিকারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কীভাবে পটভূমিকায় এবং পুরোভূমিকায়, বিশ্বরাজে ও ঋতুরাজে সংগতি ঘটাইয়া দিয়াছেন।

এবারে নাটকের স্থান সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে একটি অন্ধকার ঘর, আবার ইহার শেষতম দৃশ্যেও দেখিতে পাই সেই অন্ধকার ঘরটিকে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার ঘর হইতে রানী রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছেন — আর শেষের দৃশ্যে রাজা নিজেই দ্বার খুলিয়া রানীকে আলোতে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। শেষ দৃশ্যটিতে এমন যে হইতে পারিল তার কারণ তখন রানীর অন্ধকার ঘরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম দৃশ্যের সময় সন্ধ্যাবেলা আর শেষ দৃশ্যের সময় উষা। এই উষা রানীর নবজীবনের সূচক, এ প্রভাত যেমন বহিরাকাশের, তেমনি রানীর অন্তরাকাশেরও বটে।

আরও একটি বিষয়। নাটকটির দৃশ্যসমূহের অনেকগুলিই অন্ধকার ঘরে ও বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে বিভক্ত। আলো-অন্ধকারের মোটা তুলির টানে নাট্যব্যাপারের অঙ্গে সুখদুঃখের ডোরা কাটিয়া দিয়া কবি ইহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। রানীর ঘর অন্ধকার, বাহিরের রাত্রি পূর্ণিমায় উজ্জ্বল; রানী নিঃসঙ্গ, বাহিরে আনন্দোন্মত্ত জনতা; রানী রাজাকে কাছে পাইয়াও দেখিতে পাইতেছে না, বাহিরের জনতা তাঁহাকে শতরূপে দেখিতে পাইয়াও কাছে পাইতেছে না — এই সমস্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা কবি নাটকের অর্থকে অধিকতর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া পাঠকের রসোদ্বোধনে সাহায্য করিয়াছেন।

৫

এবারে নাটকটির গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। নাটকটি কুড়িটি দৃশ্যে বিভক্ত, অঙ্ক ভাগ নাই। কিন্তু অনায়াসে ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করা চলিতে পারিত। প্রথম আটটি দৃশ্য প্রথম অঙ্ক, শেষের বারোটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্ক। এমন যে বলিলাম তার কারণ প্রথম আট দৃশ্যের স্থান ও কাল এক, 'রাজা'র রাজধানী, রাজপুরী ও প্রাসাদের উদ্যান — সমস্তই একটি মাত্র দিনের ঘটনা। নবম দৃশ্য হইতে স্থানান্তর ও কালান্তর ঘটিয়াছে, ঘটনাও দ্রুততর বেগে পরিণামের মুখে ধাবিত। ষষ্ঠ দৃশ্যে রোহিণীর উক্তিতে আছে — "পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম" এবং অষ্টম দৃশ্যে সুদর্শনার উক্তিতে আছে — "কাল থেকে চেষ্টা করছি।" ইহাতে কালান্তর সূচনা করে বটে — কিন্তু 'কাল' ও 'পরশু'-র ব্যবহার অনবধানতার ভুল বলিয়াই মনে হয়। কেননা ঘটনাপ্রবাহে ছেদ লক্ষ্যগোচর হয় না।

১৭ সংখ্যক দৃশ্যটি ১৬ সংখ্যক দৃশ্যের স্থানে বসিলে ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা সহজতর হইত বলিয়া মনে হয়। ১৫ সংখ্যক দৃশ্যের বিষয় বিদ্রোহী রাজগণের প্রতি রাজসেনাপতিবেশী ঠাকুরদার যুদ্ধের

৬ ঋতুচক্র, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, প্রথম খণ্ড।

আহ্বান। তারপরেই ১৬ সংখ্যক দৃশ্যে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার সংলাপ হইতে জানিতে পারি যে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু রাজা তখনো রানীকে লইতে আসেন নাই। ১৭ সংখ্যক দৃশ্যে নাগরিকগণের সংলাপ হইতে যুদ্ধের একটা বিবরণ জানিতে পারা যায়। কিন্তু ১৬ সংখ্যক দৃশ্যেই পাঠক যুদ্ধের পরিণাম জানিতে পারিয়াছে — তারপরে সে বিষয়ে তাহাদের আর তেমন কৌতূহল থাকিবার কথা নয়। ১৭ সংখ্যক দৃশ্যকে আগে আনিলে পাঠক যথাসময়ে যুদ্ধের বিবরণ জানিতে পারিয়া রানীর ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

নাটকটি দুই অঙ্কে ভাগ করিবার কথা বলিয়াছি — কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে ২০ সংখ্যক দৃশ্যটিকে তৃতীয় অঙ্ক বলিয়া ধরা উচিত। স্থান কাল ও ঘটনার ছেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই অঙ্কপাত করা হইয়া থাকে। ২০ সংখ্যক দৃশ্যটির স্থান প্রথম দৃশ্যের ন্যায় অন্ধকার ঘর — নাটকের ঘটনাচক্র আবার আবর্তিত হইয়া সূচনা-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কবি সেরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই, সরাসরি কুড়িটি দৃশ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্থান কাল ও ঘটনা -বিন্যাস অনুসারে নাটকের দৃশ্যযোজনা ও অঙ্কপাত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বরাবর একপ্রকার শিথিলতা ছিল। কেন এমন হইয়াছে তাহার আলোচনা স্থানান্তরে করা যাইবে।

৬

এতক্ষণ যে আলোচনা হইল প্রধানত তাহা তত্ত্বের আলোচনা। তত্ত্বের আলোচনা রসের আলোচনা নহে। রসের গৌরবেই সাহিত্যের আদর। নাটকটির মূল উপজীব্য — মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের মিলন যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল। এ হেন বিষয়কে রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তোলা সহজ নহে। এখন দেখিতে হইবে এ বিষয়ে কবি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। কারুকার্যময় ভাষা, ঠাকুরদার সহজ প্রজ্ঞা, নাগরিকগণের সরস কথোপকথন, রবীন্দ্রসংগীত বলিতে যে অলৌকিক গীতিকবিতা বুঝায় তাহার প্রচুর প্রয়োগ, ঘটনাবিন্যাসের এক প্রকার দ্রুতি — এই সব উপায়ের দ্বারা কবি যে নাট্য-বিষয়টিকে সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নাটকের মূল গৌরব চরিত্র-সৃষ্টি। প্রাণবান নরনারীই নাটকের প্রধান সম্পদ্। সেই সম্পদে নাটকখানি তেমন সমৃদ্ধ নয়। একমাত্র সুদর্শনা-চরিত্র ব্যতীত আর কোনো মানবচরিত্র পাঠককে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না বলা যাইতে পারে। সুদর্শনার বেদনা, আত্মদ্বন্দ্ব, গ্লানির অনুভূতি, অনুশোচনা ও বিনতি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নাটকের বিষয়টি সাধারণ জনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অতীত, তাহাকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গোচর করিয়া তোলা সহজ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির নিকট হইতে সুলভ সমাধানের প্রত্যাশা কেন করিব? লৌকিক কবির যে দানে মন তৃপ্ত হয় অলৌকিক কবির সে দানে পাঠকের মনে এক প্রকার অতৃপ্তি রহিয়া যায়। রাজা নাটকের পাঠক এই জাতীয় একটা অতৃপ্তি অনুভব করে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বিদ্যায়তনে শিল্পকলা

শিল্প ও শিক্ষাব্যবস্থা

শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় অন্যতম বিষয় ব'লে শুধু গণ্য করলে চলবে না — বিদ্যামন্দিরের ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে গেঁথে তুলতে হবে, বিদ্যামন্দিরের চতুঃসীমা থেকে শিল্পের প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপরে পড়া চাই, তাদের বেষ্টন ক'রে রাখা চাই। শিক্ষার বিষয়টি যাই হোক, শিক্ষার্থীদের সকল আচারে ও আচরণে শিল্পরুচির ব্যঞ্জনা থাকা প্রয়োজন। তারই ফলে যেমন শিক্ষাকালে, তেমনি অবসর সময়ে, একটা চমৎকারের অনুভূতিতে, আত্মিক স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার জ্ঞানে এবং আহ্লাদে তাদের অন্তঃকরণ পূর্ণ থাকবে। এইটেই আমাদের লক্ষ্য। কারণ, সম্ভ্রান্ত সজ্জনের আবাসে শিল্পের স্থান নেই আজ। বিদেশের আমদানি আসবাবপত্রের বাহুল্যে শিল্পের কবর রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ এই যে সামগ্রীসম্ভার এগুলি আমাদের পক্ষে অকল্যাণেরই হেতু; তারই অবিন্যস্ত স্তূপে আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধ'রে ভারতের যাঁরা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা 'ধীমান', তাঁদের গৃহের আর মনের এমন অদ্ভুত সজ্জা যে এদেশে তাঁরা বিদেশীরূপেই বসবাস করেন। অসংগত পরিবেশ এবং বিসদৃশ আচার সহজে দূর হবার নয়; নতুন আগন্তুক শিশুসমাজ তারই মধ্যে বেড়ে ওঠে — কোনো বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি বা সার্থক ব্যবহার তাদের জ্ঞানগোচর হয় না। অন্তরে বাহিরে শৃঙ্খলা নেই, ছন্দ নেই।

শিক্ষালয় আর শিক্ষক উভয়ে মিলে পরিবেশকে আবার সংগত আকারে রচনা করা প্রয়োজন — জীবনযাত্রাকে সুষমায় স্বাভাবিকতায় ও সুষ্ঠু অলংকারে পুনরায় সার্থক ক'রে তোলা প্রয়োজন।

ধনীগৃহের দ্রব্যস্তূপে কেউ হাতও দেয় না, কেউ দৃষ্টিও দেয় না; ধূলি-আস্তরণে তা আবৃত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবলুপ্ত হয় না। চেয়ারে টেবিলে ঘরে স্থান থাকে না, কিন্তু সেগুলি ব্যবহারের নয়, প্রদর্শনের বস্তু। তারই সঙ্গে দেখা যায় প্রাচীরলগ্ন চিত্রাবলী — সেও সমান নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, কেউ চোখে না দেখলেও কিছু যায় আসে না। তা হলেও, এই অনাবশ্যক ছবিতে ঘরের দেয়ালে আর অনাবশ্যক আসবাবে ঘরের মেজেয় ভিড় ক'রে ঘরের ভিতরের সমস্ত অবকাশ ও আরাম, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা হরণ করে। প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় ছিন্ন, তাই ব্যর্থ স্বামিত্বের আরোপিত অভিমানমাত্র সম্বল ক'রে এরূপ সামগ্রীস্তূপের মধ্যে অন্ধ ও উদাসীনের মতো লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে — আপন গৃহে থাকে পর হয়ে। প্রাচীন পরিবারগুলির এই তো ব্যাধি; নূতন যারা নিজেদের বাসা নিজে বাঁধছে, তারা সেরূপ ভারগ্রস্ত নয়। তাদের গৃহের দেয়াল বা মেজে পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ, আধুনিক কালোচিত আরামের ব্যবস্থা তথাকথিত 'নূতন' রকমের আসবাবপত্রে। বদ্ধ ঘরের অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে মুক্ত বাতায়নে, 'নূতন' ফ্যাশানের আয়স জালায়নে তার শোভাবৃদ্ধি। শোভাবৃদ্ধি ছাড়া নিরাপত্তাও আছে, ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও গুপ্ত আমলের বুদ্ধমূর্তির ব্রোন্‌জ্ নকলের ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্যের তারিফ করা সম্ভবপর।

এদিকে পথপার্শ্বে দরিদ্র পল্লীতে রজকের কুটীর বাঁশ বাখারি ও মৃত্তিকার তৈরী, পিতল-কাঁসার

পাত্রগুলি চ্যাটাইয়ের পটভূমিতে সোনার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ঘরে অনাবশ্যক আসবাবপত্র নেই বলা চলে, বাইরে বিশেষ তিথিতে বিশেষ বারব্রত উপলক্ষ্যে দাওয়ায় দেয়ালে আল্পনার আকারে বিশেষ চিত্র ও প্রতীক অঙ্কিত করা হয় — সেগুলি বারেবারেই নূতন অথচ চিরপুরাতন। দেশের আবহাওয়া (পল্লীতে ও শহরে সে বিষয়ে কোনো ভেদ নেই) এবং নিজেদের বৃত্তি ও উপার্জন, এগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে এই কুটীরবাসীদের জীবনযাত্রায় একটি যথাযোগ্য সম্ভ্রম দেখা যায় — তারা বস্তির বাসিন্দা নয়।

মফস্বল শহরে, আর পল্লীতেও, শিক্ষিত সমাজের চালচলন সাধ্যপক্ষে অন্যের দ্বারাও অনুকৃত হচ্ছে। একমাত্র ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রের পক্ষেই জীবনযাত্রার সুষমারক্ষা আজও সম্ভব রয়েছে। দেশের এই বিশাল জনসমাজের সমরুচি মুষ্টিমেয় লোকের সাক্ষাৎ মেলে শহরের বিদ্বৎসমাজেও, কোথাও বেশি কোথাও কম — এঁরা বৃত্তির দিক দিয়ে শিল্পী ; শিল্পী ব'লে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। এই শিল্পীদের চিত্রে যে ছন্দসংগতি দেখা যায় বাসগৃহেও তাই — কিন্তু, যদি বা কোনো উৎসাহদাতা সেই গৃহে পদার্পণ করেন, শিল্পীর ছবি চোখে পড়লেও গৃহ চোখে পড়ে না।

চোখ থাকতেও যারা দেখে না এমন এক উদাসীন অনাসক্ত ভাবে তারা সংসারে বিচরণ করে যা কেবল বিষয়বিমুখ, তুরীয়ের ধ্যানে মগ্ন সাধু সন্ন্যাসীরই যোগ্য। তবে সাধুদের নিকটে লোক জীবনের উন্নত আদর্শের সন্ধান পেয়ে থাকে, এদের কাছে পাবে কোথা থেকে ?— জগতের অতীতে তো এদের দৃষ্টি যায় না, জগতের অভ্যন্তরেও এরা চোখ বুজে থাকে। এদের তো অনাসক্তি নয়, অভাব — ইন্দ্রিয়মনের একপ্রকার পঙ্গুতার ফলে সংসারকে এরা ফিরে দিল ন্যূনতম দেয়। চক্ষুষ্মান মানবের পক্ষে এ জগৎ জ্ঞানের নিদান, আনন্দ-অমৃতরূপ — এরা সে দিক থেকে বঞ্চিত।

এই প্রকার অসাড়তা ও পঙ্গুতা 'শিক্ষিত সমাজে'ই দেখা যায় ; সেই সমাজের সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরাও ঐ দলভুক্ত, তথাকথিত 'শিল্পী'রাও প্রায় বাদ যান না। শিক্ষা বলতে ইংরেজি শিক্ষাই বোঝায় — রুচির বিষয়ে, চালচলনের বিষয়ে। পাশ্চাত্যের যে আসবাবপত্রের আমদানি এদেশে, তা হল সেখানকার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিসম্মত। সেকেলে, সে হল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি — স্বদেশে তার আয়ু কয়েক যুগ আগে নিঃশেষ হলেও এদেশে আজও সমাদৃত। না স্থানের সঙ্গে না কালের সঙ্গে আছে তার মিল, অসন্দিগ্ধ চিত্তের কাছে আজব জিনিস বা 'কিউরিও' হিসাবেই তার সমাদর — প্রায়-মূল্যহীন দ্রব্যের নকলের তা নকল।

তা ব'লে এই রুচিবিগর্হিত অনুকরণসার নিষ্ক্রিয়তা এদেশের লোকের সহজ প্রকৃতি নয় — পরবশতারই অন্যতম পরিণাম মাত্র।

অভিনব শিক্ষাব্যবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষাবিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। সেরূপ শিক্ষার লক্ষ্য সমগ্র জাগ্রত জীবন্ত সত্তা ; উপায় পুঁথি মুখস্থ করা নয়, ক্রিয়া, জীবনচেষ্টা — সেরূপ পদ্ধতিতে দেখার ক্ষমতা, ওজনের বোধ, স্পর্শের বোধ, মনন, এগুলির কোনোটিই অবহেলার নয়। একমাত্র অন্ধ ব্যক্তিই চোখে দেখে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ; শ্রুতি, স্পর্শজ্ঞান, ভাববোধ, এগুলিতেই তার বিষয়কে অন্তরঙ্গভাবে জানা এবং অন্ধত্বের ক্ষতিপূরণ হয়। অন্ধ নয় বা দৃষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত নয় এরূপ যে কোনো মানুষকেই শিক্ষিত বা সংস্কৃত করা চলে দেখার মতো ক'রে দেখতে শিখিয়ে।
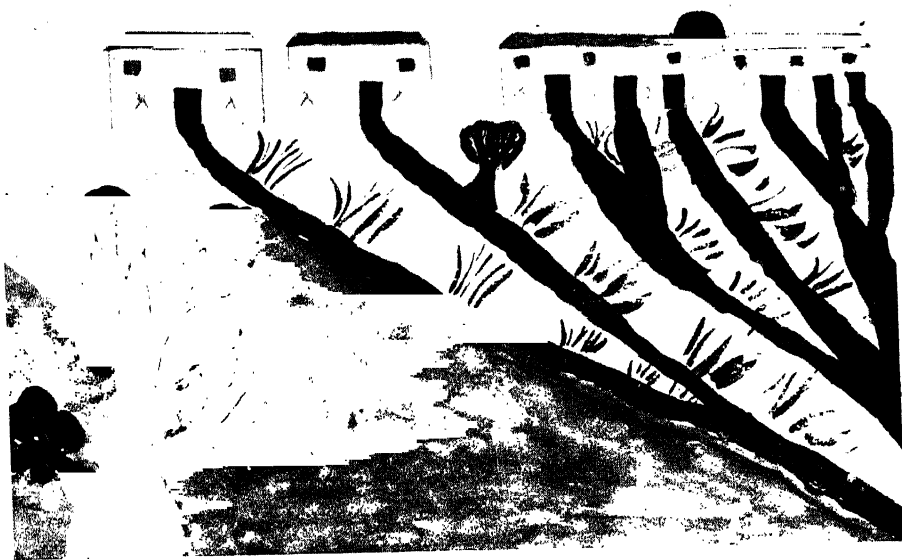
ঘরের পথ ॥ শিল্পী শ্রীতারা দেবী, বয়স আট
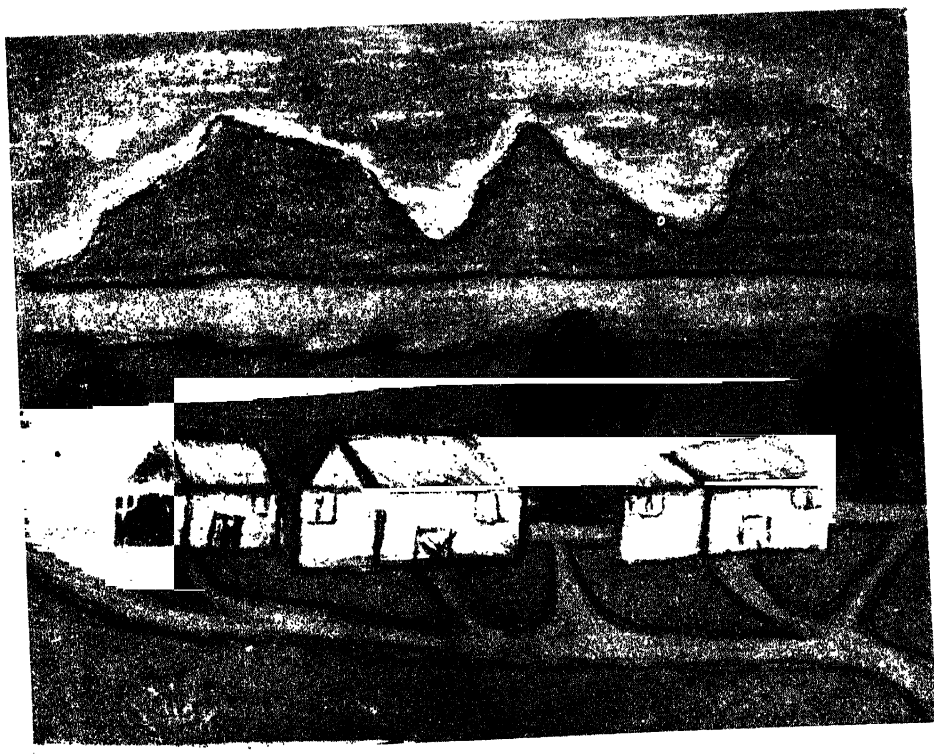
ঘরের পথ ॥ শিল্পী শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ সাহা, বয়স দশ

পানেরোহাট আগমন । শিল্পী শ্রীমনোজিৎকুমার রায়, বয়স ছয়

পানেরোহাট আগমন । শিল্পী শ্রীআলো গোস্বামী, বয়স ছয়

এ কথার অর্থ নয় যে শিশুমাত্রেই শিল্পী হবে বা শিশুর আঁকা ছবি অসাধারণ একটা কিছু। শিশু ছবি আঁকে আপন চোখের দেখা ও চিত্তপটের ছাপ আপনার কাছে, অন্যের কাছে, গোচর করবার স্পৃহায়। শিশুর পক্ষে বিশ্ববাসভূমিকে পরিচ্ছন্নভাবে ও পরিস্ফুট প্রতীকে জানবার এ একটা প্রক্রিয়া। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঁকবার উপায় উপকরণ ও বিষয় বদলাতে থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর স্বভাবশিল্পীর ভাব সে হারিয়ে ফেলে। বাল্যে, অর্থাৎ তিন থেকে ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত, শিশু বা কিশোর মানবজন্মের অর্থ ও সুষমা এক দিকে যেমন গ্রহণ করে অন্য দিকে তেমনি নির্মাণও করে। ঐ বয়স পার হয়ে বেশির ভাগই তারা নির্মাতার পদবী থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিছক গ্রহণ করার দৈন্য স্বীকার করে, আর স্ব স্ব পরিবেশের বিরুদ্ধতায় ক্লিষ্ট হয়।

শিশুর নির্মাণপ্রবণতার পুষ্টি ও সংস্কৃতি শিল্পশিক্ষকেরই হাতে। কিন্তু, শিল্পবস্তুর যোগ্য গ্রহীতারূপে শিশুর অর্থাৎ ভাবী সামাজিকের যে শিক্ষা তা বিশেষ বিষয়গত নয়। সে শুধু সম্ভব বিদ্যালয়ের আদ্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আর অখণ্ড পরিবেশকে বিশেষ একটি উৎকর্ষ দান ক'রে, বিশেষ একটি সুরে বেঁধে তুলে।

শিল্পের গুণগ্রহণ করে এমন সমাজ আজ এদেশে নেই। শিল্পীদের উৎসাহদান ও প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় — সেখানে ভিড়ের মধ্যে গোপনচারী দু-চারজন সমঝদার মৌনকেই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ব'লে জানেন। বিচিত্র রীতিতে আঁকা বাঁধা বিষয়েরই ছবি — সেই স্থলে আমন্ত্রিত হয়ে বিপুল জনতা তিলধারণ-স্থান-শূন্য দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টিহীন চোখ বুলিয়ে যায়। প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে অল্প কিছু সুরচিত। কিন্তু চিনে নেবার লোক কোথা?

প্রদর্শনীর দর্শকদের ভিড়ে তেমন লোক বিরল যে কোনো একটা বস্তু ঠিকমতো বানাতে জানে। ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে অর্থসঞ্চয় করাটা জানে বটে। এদের বিচারে শিল্পের দরকারটা কী! এদের বাসগৃহে এই মনোভাবের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। পাশ্চাত্য আসবাবপত্র — নির্মাতা আর ক্রেতা কম-বেশি উভয়ের কাছেই তা বৈদেশিক রয়ে গেছে চোখে পড়ে। তেমনি তো প্রদর্শনীর দেয়ালগুলিও পাঁচরঙা সামগ্রী দিয়ে আবৃত — তারই মধ্যে দু-দশটা, প্রদর্শনীর দেয়াল ত্যাগ ক'রে ঘরের দেয়ালে গিয়ে গলরজ্জু অবস্থায় লম্বিত হয়, যে কারণেই হোক — বড়ো কারণটা অবশ্য ঘরের মালিকের পছন্দই।

দর্শকসমাজে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যে কিছু একটা গড়তে পারে, হোক তা ছাতা জুতা, হোক তা মাটির বাসন। কারখানার তৈরী জিনিস নিয়েই যা কিছু ব্যবহার। বিধিদত্ত হাতখানা নিষ্ক্রিয়। আর, যে যন্ত্রে ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন তা ভারতে উৎপন্ন নয়, বিদেশীরই আবিষ্কার। ভারতের ক্রেতা যান্ত্রিক যুগে আজ যন্ত্রের দাসের দাস মাত্র। কারিগরি ও শিল্পসৃষ্টির জন্মভূমি বা যজ্ঞশালা থেকে বহুদূরে। ভাববারই সাহস নেই যে কোনো বস্তু আপন হাতে গড়ে তুলতে সে সক্ষম — সেই হাতের কাজের ছলে জড় বস্তুতেও আপন জীবনী সঞ্চার ক'রে আপন জীবনকে অমিতায়ু করতে সমর্থ। জীবনের এই পরিবৃদ্ধি, এই অমৃতত্বলাভ, শিল্পীও তো আপনসৃষ্ট আলেখ্যে মূর্তিতে তাকে দান করতে উৎসুক — সে গ্রহণ করতে পারবে কি?

চৈতন্যশীল জীবরূপে বেঁচে থাকার শিল্প হল লক্ষণবিশেষ, ক্রিয়াবিশেষ। বর্বর আদিবাসীর জীবনেও এর দর্শন মেলে। বস্তিবাসীর জীবন এর প্রসাদবঞ্চিত। তেমনি বঞ্চিত ভারতবর্ষের আধুনিক

শিক্ষিত সমাজ; কারণ, জীবনযাত্রার বিচিত্র উপকরণ আপন হাতে নির্মাণ করার ও আপন চোখে নির্বাচন করার শক্তির অব্যবহারে চোখ থাকতেও তারা অন্ধ, হাত থাকতেও তারা ঠুঁটো।

মানুষের অন্তঃকরণে নির্মাতার পদবী গ্রহণের যে সহজ প্রবৃত্তি, সুনির্মিত দ্রব্যরাজির পরিবেশেই তার সম্যক্ উদ্দীপন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর। শহরের সাধারণ গৃহস্থঘরে তার অভাব।

ছাত্রদের মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্যবিধানের উদ্দেশে অন্তত বিদ্যালয়গুলি সুনির্মিত স্থাপত্যনিদর্শন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট শিল্পকে নীতিশতক আওড়াতে হয় না; তার সঙ্গমাত্রই স্বাস্থ্যবিধায়ক, শিক্ষাবিধায়ক, নিঃশব্দে অথচ অনিবার্য বেগেই তা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, যথাবিধ আয়তনের ও যথোচিত গঠনের দ্রব্যটি, তরুণ মনে কী ভাবে যে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করা কঠিন। মন্ত্রবৎ তার কার্য; নিঃশব্দ সেই মন্ত্রণায় আকাশ আলো ও বায়ুর আনুকূল্য। নির্মাতার বদ খেয়ালে বা বিনা বিবেচনায় রচিত বিসদৃশ আয়তনের জানলা দরোজা চক্ষুষ্মান শিশুদের কম যন্ত্রণা দেয় না। সে কী কষ্ট! অষ্টপ্রহর ভাঙা যন্ত্রে যেন বেসুর সাধনা হচ্ছে। বেঢপ পরিচ্ছদ পরতে হলে যে অস্বস্তি ও অসুখ, ঘরের মাপে আর দরোজা জানলার মাপে সংগতি না থাকলেও সেই অবস্থা। গঠনকর্মে পূর্বাপর ভাবনার অভাবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থার ত্রুটিতে, এমন মনুষ্যাবাসও দেখা যায়, সেখানে আলোতে চাবুক মারে, অন্ধকারে ত্রাস সঞ্চার করে— সুখ আর শান্তির ভাব জাগায় না।

পরিবেশের মধ্যে পরিমিতি গৃহের সুগঠন, এগুলি তো শিক্ষার্থীর নিয়ত সঙ্গী— এরই পুণ্যপ্রভাবে, আপন জীবনকে ও পরিবেশকে সে ছন্দোময় করে তুলবে। যথোচিত ছন্দ ও মাত্রা এগুলি তরুণমন সহজেই গ্রহণ করে, এরূপ পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই তাদের অন্তঃকরণ সুস্থ থাকে। অন্তরে বাহিরে চিন্তায় চেষ্টায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভারসাম্য ও পরিমিতি তাদের প্রয়োজন। পরিদৃশ্যমান বিষয় আর সক্রিয় বিষয়ী উভয়ের ঠিক সম্বন্ধবন্ধনটি ঘটা চাই চেতনার সর্বস্তরে। তবেই পরিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতি, ছন্দ; চিন্তার মধ্যেও ন্যায়, মাত্রা, সমতা। গৃহভিত্তির ঋজুগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ঠিকমতো যে উপলব্ধি করেছে চারিত্রিক ঋজুতার বা সমতার মূল্যও সে নিশ্চিত বুঝেছে।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে, বাঙলায় বা রাজস্থানে বা অন্যত্র, শিক্ষার্থীরা আজও যদি যায় প্রবুদ্ধ মন আর নির্মল দৃষ্টি নিয়ে, ঠিকটি দেখা আর ঠিক জিনিসটি তৈরী করার শিক্ষা তারা পাবে। গ্রাম্য কুমোরের গড়া মৃৎপাত্র বিদ্যালয়ে এনে দেখানো ভালো। স্থানীয় কারিগরের সাহায্যে সুতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্পের স্বেচ্ছানুকূল শিক্ষাও দেওয়া চলে। কোনো জিনিসটি ঠিক-ঠিক নির্মাণ ক'রে আর ব্যবহার ক'রে আপন হাতের কাজে ছাত্রের যে গর্ববোধ আর আনন্দলাভ তার ফলে, 'চারু' শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা বা 'শিল্প-সমঝদারির' ক্লাস নাই থাকুক, শিল্প যে কী সে বোধ সে লাভ করবে। (শিল্প সমঝাবার ক্লাস! বোঝাই যাচ্ছে একালের চিন্তাধারার কী পর্যন্ত অধোগতি! সত্য সমঝাবার ক্লাস খুললে ক্ষতি কী ছিল!)

বিশেষ কালে বিশেষ প্রতিমা আবাহন ক'রে পূজার ব্যবস্থা করা ভালো— স্থানীয় কারিগরদের সর্বোত্তম গড়নটি ছাত্রেরা বেছে এনে অর্চনা করবে, পুষ্পাঞ্জলি দেবে।

চারুকলা ও কারুকলার যে ধারা আজও এদেশে বর্তমান তার সঙ্গে বিদ্যায়তনগুলির প্রত্যক্ষ

যোগসাধনের বহু অবকাশ আছে। শিশুরাই ভাবী সমাজের সামাজিক; শিল্পের আবহাওয়ায় লালিত হওয়াতে শিল্প সম্পর্কে তাঁদের ক্ষুধাবোধ ও স্বাদবোধ জন্মাবে, শিল্পের যোগ্য গ্রহীতা তারা হবে। কারুকর ও শিল্পীদের পক্ষে অরণ্যে বাস হবে না, সমাজে তাদের কাজের মূল্য ও মর্যাদা থাকবে। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই কৃতার্থ হবে।

ভারত তাদের বাসভূমি, চোখ খুলে এই ভারতের রূপ তরুণেরা দেখুক; এরই জীবনযাত্রার ছন্দে নিজেদের জীবন, নিজ নিজ গৃহ তারা গড়ে তুলুক। সে যে সুন্দর, আজও সে অবিকৃত। এদেশে পল্লীবাসী লোকের চলনে ও বলনে শালীনতা, পরিধানের বসন দেহবীণার যেন তান। এই দেশে যে কোনো ভার- উত্তোলনে বা বহনে, যে কোনো দ্রব্য- দেওয়ায় বা গ্রহণে যে ভঙ্গী সর্বব্যাপক কী এক নৃত্যের ছন্দে তা বাঁধা। সেই ভঙ্গীর দাক্ষিণ্যে ও বাঙ্ময়তায় জীবৎসত্তার পরিস্ফুরণ।

আপন পরিবেশের শৃঙ্খলা, সকল বস্তুর প্রাণদীপ্তি এবং তারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে যারা তাদেরও প্রাণময় গরিমা — শিশুদের নিরাবরণ দৃষ্টিতে তা উদ্ভাসিত হোক। তাদেরই মধ্যে নূতন জাতি নূতন জীবনে জেগে উঠে এদেশীয় শিল্পকলার অন্তর্নিহিত সত্যের ও সামর্থ্যের ধারণায় ধন্য হোক।

স্টেলা ক্রাম্‌রীশ

শিশুদের ছবি-আঁকা

শিশুদের ছবি-আঁকা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন যে আছে, তা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা কোন্ দিক দিয়ে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধের সম্ভাবনা। আপাতদৃষ্টিতে সমস্যা যত জটিল মনে হয় ব্যাপারটা তত জটিল নয়।

কারণ মূল দুটি উদ্দেশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এক দলের উদ্দেশ্য, সংঘবদ্ধ জীবন-যাপনের উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন; অপর দলের ইচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী শিক্ষা দান।

অর্থাৎ এক দিকে চেষ্টা চলেছে সামাজিক শিক্ষার, অন্য দিকে মানসিক শিক্ষার। বলা বাহুল্য, দু'এর যথাযথ সম্মিলন সকলেই চান। কিন্তু কোন্‌টা বড় — মানুষ না সমাজ? বলা বাহুল্য সমাজ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্ম রাষ্ট্র অর্থ — এর যে-কোনো একটাকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিমাত্রকেই কোনো-না-কোনো সমাজকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে হয়। তাই সামাজিক শিক্ষা তো চাই। এই দুই আদর্শের একটাকে প্রধান বলে স্বীকার করে না নিয়ে কোনো শিক্ষারই প্রবর্তন আমরা করতে পারি না; অন্তত, এ পর্যন্ত পারা যায় নি।

এর পর আর-একটা কথা। বাইরে থেকে কোনো উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা চাপানো যায় কি না এবং এইভাবে মানুষকে শিক্ষিত করা শিক্ষার আদর্শ হতে পারে কি না বা মানুষের মানসিক বিকাশের সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ কি না — সেটা আগে ভেবে ঠিক করে নিতে হবে। এখানেও শিক্ষাব্রতীকে ঠিক করে নিতে হবে তিনি কোন্‌টা বিশ্বাস করেন। যাঁরা বিশ্বাস করেন মানুষের পূর্ণ পরিণতি তার

মানসিক বিকাশের মধ্যে, তাঁরা সকলেই মানুষের সহজাত মনোবৃত্তি ও তার অনুভূতি মার্জিত ক'রে তোলাকে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য ব'লে স্বীকার করেন। অর্থাৎ বাইরে-থেকে-মুখস্ত-করানো উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাতে যে বিশেষ লাভ হয় তা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। এবং যেটুকু লাভ হয় তার যৎসামান্য মূল্যকে তাঁরা প্রায় উপেক্ষা করেছেন। দলবদ্ধভাবে একটা বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদানের চেষ্টাও এঁরা স্বীকার করেন না। কারণ এঁরা মনে করেন উদ্দেশ্যমূলক দলবদ্ধ এক ছাঁচের শিক্ষার মধ্যে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না।

যাঁরা ব্যক্তিত্বকে প্রধান করে দেখছেন, তাঁরাই শিল্প সাহিত্য সংগীত নৃত্য এবং নানা কারুকলাকে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন এবং শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে শৈশব থেকেই যে শিক্ষা শুরু হওয়া প্রয়োজন এ সম্বন্ধে একমত হ'য়েছেন। শিশুর সহজাত মনের বিকাশ যাতে বিচিত্র পথে বিনা বাধায় সম্ভব হতে পারে তার জন্যই শিল্পকলাকে ভূগোল-জ্যামিতি-গণিতের মতোই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষায় শিল্পকলার এতটা মূল্য নেই। আধুনিককালে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পকলা সংগীত নৃত্য বিশেষ মূল্য পায়। প্রথম রবীন্দ্রনাথ, তারপর ইউরোপীয় আধুনিকতম শিক্ষাব্রতীদের এবং ঐদেশের মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের প্রভাবে এদেশে ছোটদের শিক্ষায় নাচ গান ছবি-আঁকা স্থান পেয়েছে।

আজকের আমরা যে ছোটদের ছবি-আঁকা শেখাতে চাইছি, নাচ গান অভিনয় করবার সুযোগ দিচ্ছি, সেসব কিসের জন্য — সেটা প্রথমে আমাদের ঠিক করে নেওয়া দরকার।

একটা সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে হলে এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মতো অনেকেই হয়ত বলবেন, ছবি-আঁকা শেখানো নাচ-গান করানো এক রকমের রিক্রিয়েশন; হকি, ফুটবল খেলার মতো এগুলিও এক-এক রকমের খেলা। যাঁরা শিশুমনের খবর রাখেন তাঁরা শিশুমন বোঝবার জন্য এসব এক-এক রকমের উপাদান ব'লে মনে করেন। শৈশবের শিক্ষা তার মনের পূর্ণ বিকাশের সহায় বলেই ছবি-আঁকা নাচ-গান করা দরকার অর্থাৎ এর প্রয়োজন সংস্কৃতির দিক দিয়ে।

মনস্তত্ত্ববিদ্ আর শিক্ষাব্রতী দু'জনেই বিশ্বাস করেন যে মানুষের শিক্ষাটা ষোলআনা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। প্রত্যেকের প্রকাশ করার কিছু-না-কিছু আছে, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হবার সুযোগ যাতে ঘটে, সেইজন্যেই শিক্ষায় স্থান হ'য়েছে শিল্পকলার।

কাজেই আজকের দিনে যাঁরা ছোটদের ছবি-আঁকা শেখাতে চান, তাঁদের এ কথা মেনে নিতে হবে যে এ জিনিস দরকার মনের দিক দিয়ে। তাই যাতে মনের বিকাশ হতে পারে তেমনি করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ছবি-আঁকা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ — এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি ঐ আদর্শেই তৈরি করা আবশ্যক। এখন, যে-কোনো বিষয়েই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হোক্ তার পদ্ধতি তৈরি করার আগে এই কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, ছোট বয়সে প্রথমত ছোটদের মনকে একটা বিশেষ দিকে জোর করে চালিত করবার চেষ্টা করা সংগত নয়। কারণ ছোটদের মন বিশেষজ্ঞের মতো বিশেষ-একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে না। আর মানুষের স্বভাবও বিশেষজ্ঞের মতো নয়। দ্বিতীয়ত, কাজ ও অকাজের মধ্যে জোর করে একটা পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং অস্বাভাবিক উপায়ে ছোটদের মনকে বিশ্লেষণধর্মী করে তোলার চেষ্টা না করাই ভাল।

একাকী। লিনোকাট। শিল্পী শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা, বয়স বারো

কুটির। লিনোকাট। শিল্পী শ্রীদেবজ্যোতি কংসকার, বয়স এগারো

আরতি। লিনোকাট। শিল্পী শ্রীবেলা বসু, বয়স এগারো

শৈশবের সীমানা নিয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নানা বিচার করেছেন, কিন্তু ঠিক বয়স হিসাবে সীমানা ঠিক হলেও সব সময় তা ঠিক থাকে নি। তবে একটা বিষয় ঠিক আছে যে, যতদিন পর্যন্ত ইম্‌প্রেশন্‌টাই প্রধান, ততদিন পর্যন্ত শৈশব বর্তমান; যখন থেকে ইম্‌প্রেশনের পরিবর্তে অবজার্‌ভেশন্‌ শুরু হয় অর্থাৎ মন যখন বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই ছোটদের বড় বলে ধরা যেতে পারে। যে বয়সে ইম্‌প্রেশন্‌টাই প্রধান সে বয়সে ছেলেদের শেখাবার কিছু নেই, কেবল ইম্‌প্রেশন্‌ পাবার সুযোগ দেওয়াই হল শিক্ষকের কাজ। কোনো বিশেষ শব্দ, কোনো বিশেষ গতি, কোনো বিশেষ রং ছোটদের মনে যখন একটা ইম্‌প্রেশন্‌ দেয় তখনই তারা সেই শব্দ সেই রং বা সেই গতিকে চেনে। এ সময়ে ছোটদের মন বিস্ময়ে পূর্ণ, কৌতূহল এখনও প্রধান নয়।

স্থির ও অচঞ্চল পদার্থের চেয়ে গতিমান চঞ্চল দ্রব্যই ছোটদের মনকে আকর্ষণ করে বেশি। ছোট ছেলে যখন হাতি দেখে তখন সে হাতির শুঁড় নাড়া লেজ নাড়াই লক্ষ্য করে থাকে। রংএর বেলায়ও এই রকম, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। কাজেই ছোটদের ছবিতে হুবহু নকলের কোনো চেষ্টাই যে দেখা যাবে না, তা বলাই বাহুল্য। আর ছোটবেলায় যখন ছেলেদের কাছে সবকিছুই বিস্ময়ের বস্তু তখন অধৈর্য শিক্ষক যদি তাদের বিশ্লেষণ করতে শেখাতে চান, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। অন্তত ব্যর্থ না হলেও লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই রকম শেখাবার চেষ্টায় ছোটদের সহজ ইচ্ছা নষ্ট হয় ও তাদের বিস্ময় বিদ্যার চাপে পিষ্ট হয়। কিন্তু যদি সহজ ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক তৈরি করতে পারা যায়, যদি বিজ্ঞ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে পার্‌স্‌পেক্‌টিভ মডেল ড্রয়িং শেখাবার চেষ্টা না করেন, তা হলে ছোট ছেলেমেয়েরা অবলীলাক্রমে এঁকে যাবে — কেউ রেলগাড়ি, কেউ জাহাজ, কেউ হ্যাটকোটপরা ছড়িহাতে সাহেব, ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্ট, মোটরগাড়ি, আরও কত কী।

সেইসব ছবি দেখে পাকা চোখে মনে হবে, ভুল শুধরে দেওয়া দরকার, জানিয়ে দেওয়া দরকার — গাড়ির চারটে চাকা এক সঙ্গে দেখা যায় না, মোটরগাড়ির আলোটা অত বড় হয় না, মানুষের মুখের রং লাল নয়।

আমরা সকলেই জানি যে, গাড়ির চারটে চাকা এক সঙ্গে দেখা যায় না, আমরা আমাদের বিশ্লেষণবুদ্ধির বলে এটা জেনেছি। কিন্তু আমাদের ইম্‌প্রেশন্‌ আছে চারটে চাকার, ছোটরা সেই ইম্‌প্রেশন্‌ নির্ভয়ে প্রকাশ করেছে ছবিতে। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে ভুল বলা যায় কেমন করে? কাজেই শিক্ষক এ সব ক্ষেত্রে তেমন কিছু করতে পারেন না। তবে কি শিক্ষকদের করণীয় কিছুই নেই?

আছে বই কি, রীতিমতো কাজ আছে। শিক্ষকের কাজ হল এই যে, তিনি কেবলই চেষ্টা করবেন নানাভাবে ছেলেদের মনের বিস্ময় জাগিয়ে রাখতে, নতুন নতুন ইম্‌প্রেশন্‌ দিয়ে। যে ছেলে গাড়ি এঁকেছে সে ছেলের মনে গাড়ির সব দিকের ইম্‌প্রেশন্‌ যদি না পড়ে থাকে শিক্ষক তাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারেন। ফলে দেখা যাবে, ছেলে চট্‌পট্‌ মনে করতে পারছে কতক জিনিস, কতক জিনিস তার মনে আসছে না। যা তার মনে নেই তা তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। তা হলেই তার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হল। যাঁরা ছোটদের ছবি-আঁকা শিখিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, যতদিন ছোটরা ইম্‌প্রেশন্‌ নিয়ে চলে ততদিন তাদের কাজে কোনো সন্দেহ

থাকে না। ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে, এ প্রশ্ন নিয়ে তারা চিন্তা করে না। তারপর একদিন আসে, যখন ছোট ছেলে ড্রইং খাতা নিয়ে শিক্ষকের কাছে এসে বলে, ঠিক হচ্ছে না, দেখিয়ে দিন কী করে করব। ছেলেরা যেদিন এই প্রশ্ন করবে সেদিন বুঝতে হবে, ছোট ছেলে তার বিস্ময়ের দৃষ্টি হারাতে শুরু করেছে, মনে তার কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছে, তার বিশ্লেষণবুদ্ধি জেগেছে। এইবার সে বড় হয়েছে, তার বিদ্যা-অর্জনের কাল শুরু হল। এখন তাকে কপি করানো পার্‌স্‌পেক্‌টিভ শেখানো ইত্যাদির সময়। কিন্তু আদর্শ শিক্ষা হবে তখনই, যখন শিক্ষক ছোট বয়সের বিস্ময়কে বিদ্যাদানের মধ্য দিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কারণ বিস্ময়ের ভাব যতকাল পর্যন্ত থাকবে, ততকাল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সৃষ্টি করার চেষ্টা বন্ধ হবে না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই আদর্শ স্বীকৃত হলে কার্যক্ষেত্রে এভাবে কাজের চেষ্টা দৈবাৎই দেখা যায়। এ দেশের স্কুলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ অতিরিক্ত তাড়া — প্রগ্রেস রিপোর্ট, পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আদর্শ শিক্ষার জন্য যে পরিমাণে অবকাশ ও ধৈর্যের দরকার, প্রয়োজনের তাড়ায় কোনো সমাজই সে অবকাশ দিতে পারে না। তাই আধুনিককালে যে কয়জন আদর্শবাদী সংস্কারক শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সমাজের সহযোগিতা বড়-একটা পান নি। এইজন্যই শিক্ষাকে সফল করা এত আয়াসসাধ্য।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বনপথ। লিনোকাট। শিল্পী শ্রীসুজিতকুমার রায়, বয়স বারো

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

১৮০৩-১৮৬৮

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জীবিতকাল। এই সত্তর বৎসরে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, এবং ইহার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়ের ভিতরকার সম্পর্ক অনেকটা নির্দিষ্ট হইয়া যায়। এই শতকের প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় স্বদেশবাসীকে সুসংস্কৃত করিয়া বিদেশীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে অগ্রসর হন। তিনি স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এই কার্যে নিয়োজিত করিলেন। যাঁহারা রামমোহনের কার্যে সহায়তা করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। রামমোহনের কথা বলিতে গিয়া অনেকে তাঁহার সঙ্গী বা সহকর্মীদের বিষয় আলোচনা করিতে ভুলিয়া যান, কিন্তু রামমোহনের জীবন-দর্শন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইঁহাদের বিষয়ও আমাদের জানা আবশ্যক। রামমোহনের যখন প্রৌঢ়াবস্থা প্রসন্নকুমার তখন যুবক। তিনি যুবজনোচিত আগ্রহ ও তৎপরতার সহিত রামমোহনের সমাজকল্যাণকর প্রতিটি কার্যে সহায়ক হইয়াছিলেন। আবার রামমোহনের আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত কোন কোন কার্যের সম্পাদন ব্যাপারে প্রসন্নকুমার নিজেকে লিপ্ত করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

অথচ, প্রসন্নকুমার যে পরিবারের সন্তান তাঁহারা ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। গোপীমোহন দর্পনারায়ণ ঠাকুরের আত্মজ; ধনৈশ্বর্যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কলিকাতা সমাজে একক বলিলেও চলে। হিন্দু কলেজের দুই জন মাত্র গবর্নর— বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র এবং কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর। যাঁহারা সংস্কারপ্রিয়তার জন্য রামমোহনকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে ইহা হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপীমোহনও ছিলেন। এহেন গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমার শৈশবে স্বগৃহে অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়া শেরবোর্নোর স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া সদ্যপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে (২০ জানুয়ারী, ১৮১৭) প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং শিবচন্দ্র ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তারাচাঁদ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক, শিবচন্দ্র সেযুগের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজী-নবিশ। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রীতিভাজন দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই পুত্র।

ধনীর দুলাল হইয়াও প্রসন্নকুমার সমাজসেবায় যৌবনেই আত্মনিয়োগ করেন। আর এ কার্যে নিজ পরিবার হইতে যেমন, রামমোহন রায়ের নিকট হইতেও তেমনি অনুপ্রেরণা পান। ১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য একটি বিধি রচিত হয়। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিলে সরকারী বিধিগুলি কার্যকরী হইত। এই বিধিটি যখন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন ছিল সেই সময় প্রস্তাবিত আইনটির বিরুদ্ধে একখানি আবেদন-পত্র সেখানে প্রেরিত হইল। রামমোহন রায় ও

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রসন্নকুমারও ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের এই যে সংযোগ আরম্ভ হইল, ১৮৩০ সনের নবেম্বর মাসে তাঁহার ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে দেখি। এ বিষয় একটু পরেই বিশদভাবে বলিব। এখানে এমন একটি বিষয়ের কথা বলা হইবে যাহার সঙ্গে নানা কারণে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই, অথচ যাহার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি থাকা আদৌ অসম্ভব ছিল না। ইহার উদ্দেশ্য এবং ইহার সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে। প্রসন্নকুমারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক।

পারিবারিক জীবন

প্রসন্নকুমার বার্ধক্যে যে উইল করিয়া যান তাহার আরম্ভেই তিনি নিজের পারিবারিক জীবনের কথা এই মর্মে বলিয়াছেন—

"আমি গোপীমোহন ঠাকুরের ছয় পুত্রের মধ্যে একজন। বাংলা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮) গোপীমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পৈত্রিক এবং স্বোপার্জ্জিত বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। তখন তাঁহার ছয় পুত্র জীবিত— সূর্য্যকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এবং আমি নিজে। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে সূর্য্যকুমার গত হন এবং উইল দ্বারা তাঁহার নিজ অংশ প্রায়ই ভ্রাতাদের দিয়া যান। সূর্য্যকুমারের মৃত্যুর পর আমার মাতৃদেবীও পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার স্ত্রীধন ও ভরণপোষণের জন্য পিতার উইলে প্রদত্ত যাবতীয় বিষয়ই আমরা পাই। ইহার পরে এই যৌথ পরিবারকে অহিফেনের ব্যবসায়ে এবং মেসার্স আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী ও মেসার্স ব্যারেটো এণ্ড সন্সের সঙ্গে মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের ফলে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আমরা ভয়ানক রকম ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। উক্ত মোকদ্দমাগুলি পিতার আমলেই আরব্ধ হয়। ১২৩৪ সালের ১৬ই আষাঢ় (২৯শে জুন ১৮২৭) আমরা পাঁচ ভ্রাতা মিলিয়া যাবতীয় সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লই। ঋণের ভারও প্রত্যেকে অংশতঃ গ্রহণ করি। সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কিত দলিলপত্র বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়া যথারীতি রেজেষ্ট্রী করা হয়। সম্পত্তি রক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, পূজার্চ্চনা— প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সম্পত্তি বিভাগের দিন হইতে আমি আমার ভ্রাতাদের হইতে স্বতন্ত্র। আমার অংশে যে পরিমাণ সম্পত্তি, ঋণের বোঝাও প্রায় সেই পরিমাণ ছিল। কিন্তু স্বীয় পরিশ্রম, ব্যবসায়ে সাফল্য, এবং বিশেষ ভাবে সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারজীবের কার্য্য ও সরকারী ওকালতি দ্বারা সমুদয় ঋণ আমি শোধ করিতে সমর্থ হই। পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বাদে আমি বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। এ সকলের বাৎসরিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার অধিক। আয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে।"

প্রসন্নকুমারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা ক্রমে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব। এখন বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের কথা বলিতেছি।

গৌড়ীয় সমাজ

বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে সমাজোন্নতিকল্পে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন-স্বরূপ 'গৌড়ীয় সমাজে'র উল্লেখ করিতে হয়। বাঙালীদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ এবং গণ-চেতনার যে ধীরে ধীরে

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

১৮০৩-১৮৬৮

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে রক্ষিত তৈলচিত্রের
শ্রীপরিমল গোস্বামী গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

উন্মেষ হইতেছিল তাহার প্রমাণ গত শতাব্দীর প্রথম পাদে আরব্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে প্রাপ্ত হই। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার একটি ইংরেজী অনুবাদ[১] পাওয়া গিয়াছে। ইহা পাঠে জানা যায়, স্বীয় শাস্ত্রগ্রন্থ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু প্রতি পদে এদেশবাসীদের বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইতেছে, মিশনরীদের অপপ্রচার তাহাদিগকে স্বদেশে ও বিদেশে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। এই সকল বিপদ হইতে আত্মরক্ষা, এবং বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির জন্যই গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়েই সমাজ কার্য আরম্ভ করিবেন স্থির হয়। কারণ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই দ্রুত জাতীয় উন্নতি ও জাগরণ সম্ভব। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য— এসবের কোনটিই আশু ফলপ্রদ হইবে না। আধুনিক বাংলায় নূতন মৌলিক গ্রন্থ রচনা এবং অন্যান্য ভাষা হইতে জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদির অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করিবার বিষয় গৌড়ীয় সমাজের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠান-পত্রখানিতে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন। খ্রীস্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থসকল প্রকাশ করাও সমাজ কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিলেন।

অনুষ্ঠান-পত্রে গৌড়ীয় সমাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি নিয়মেরও উল্লেখ পাইতেছি। উহাতে উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করার উপায় বলা হইয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সমাজবিধি-বিগর্হিত কার্যে বাধাদান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিয়মাবলী রচিত। সমাজ স্থাপনোদ্দেশ্যে দুইটি প্রারম্ভিক সভা হইবার পর নেতৃবর্গ ১৮২৩ সনের ২৩শে মার্চ হিন্দু কলেজ হলে একটি সাধারণ সভায় সম্মিলিত হন। গৌড়ীয় সমাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দিবসেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সম্পাদক হইলেন রামকমল সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কার্যনির্বাহক সমিতি বা অধ্যক্ষ-সভায় ছিলেন— লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র এবং কাশীনাথ মল্লিক।

ব্যাপকতর উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গৌড়ীয় সমাজ যেভাবে কার্য আরম্ভ করেন তাহাতে আমরা ইহাকে প্রথম সাহিত্য-সভাও বলিতে পারি। ইদানীং যেমন কোন কোন সাহিত্য-সভার অধিবেশন ইহার এক-একজন সভ্যের বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়, গৌড়ীয় সমাজের বেলায়ও দেখিতেছি এইরূপ রীতি ছিল। ভূকৈলাসের ঘোষাল-ভবনে এবং পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাটীতে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় সমাজ কর্তৃক কাশীকান্ত ঘোষালের 'ব্যবহার মুকুর' নামক বাংলা পুস্তক প্রকাশের কথা হয়।

গৌড়ীয় সমাজ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই ইহা বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। ইহার মধ্যে যুবক প্রসন্নকুমারেরও যে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে কলিকাতার বিভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে বঙ্গভাষায় অনুবাদ-গ্রন্থ এবং বঙ্গাক্ষরে

[১] *The Asiatic Journal*, December 1823, pp. 549-55: Native Literary Society.

মূল সংস্কৃত প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশের আয়োজন চলে। ইহার মূলে এই সমাজের বিশেষ প্রেরণা রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। স্বদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই সময়কার কৃতবিদ্য সমাজের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন বহু মিলে। হিন্দু কলেজের প্রথম দলের ছাত্র ইংরেজিনবীশ প্রসন্নকুমারও যে ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না তাহা আমরা এতক্ষণে জানিতে পারিলাম।[২]

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব

গৌড়ীয় সমাজের প্রসঙ্গ হইতে রামমোহন রায়ের সহিত প্রসন্নকুমারের সংস্রবের কথায় আমরা আসিতেছি। গৌড়ীয় সমাজ কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল, বা ইহার কার্যকলাপ ক্রমে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে এই সময়ে প্রসন্নকুমার রামমোহন রায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন, একটি ব্যাপারে আমরা তাহা জানিয়াছি। একটু পূর্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৮২৪ সনের ১লা এপ্রিল পেশ করা হয় এবং ইহাতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রথম স্বাক্ষরকারী প্রসন্নকুমারের মধ্যমাগ্রজ।

সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনেও প্রসন্নকুমারকে রামমোহনের সঙ্গীরূপে দেখিতে পাই। ১৮২৯ সনের ৫ই মে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল হেরাল্ড' এবং তাহার বাংলা 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হইল। হিন্দী ও উর্দ্দু সংস্করণও প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। এই পত্রিকাসমষ্টির স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে প্রসন্নকুমারও ছিলেন।

রামমোহন ১৮২৮ সনের ২০শে আগস্ট ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। চিৎপুর রোডের উপর নূতন গৃহ নির্মিত হইলে ১৮৩০, ২৩ জানুয়ারী দিবসে ব্রাহ্মসমাজ সেখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৩০ সনের ৮ই জানুয়ারী প্রসন্নকুমার ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৪৭ সনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের অনুকূলে তিনি পদত্যাগ করেন।

এই সময়কার আর একটি আন্দোলনেও প্রসন্নকুমার রামমোহন রায়ের সহযোগী হন। এ দেশে ইউরোপীয় সাধারণের স্থায়ী বসবাস এবং স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিকূল অনেক নিয়ম-কানুন ছিল। পরবর্তী সনন্দে এসকল বাধা-নিষেধ বিদূরিত হইয়া যাহাতে তাহারা সাধারণ নাগরিকের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করিতে পায় সে উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সনে সংবাদপত্রে এবং সভা-সমিতিতে আলোচনা শুরু হয়। এই বৎসর ১৫ই ডিসেম্বর ঐ উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউন হলে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। প্রগতিশীল ভারতবাসীদের পক্ষে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করেন। এ আন্দোলন ঐ সময় ইংরেজীতে 'Colonisation' আন্দোলন নামে অভিহিত হয়। এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী ভাবে বসবাসের বিরুদ্ধ দলও বাঙালী প্রধানদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু রামমোহনপ্রমুখ প্রগতিপন্থীরা এ আন্দোলনকে এই কারণে সমর্থন করেন যে, এ দেশে স্থায়ী বসতি

২ 'গৌড়ীয় সমাজ' সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রধানতঃ সমাচার দর্পণ' হইতে সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রথম খণ্ডে (পৃ ৯-১৩) পাওয়া যাইবে।

স্থাপনের ফলে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়েরা নিজ নিজ মূলধন বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা সবই নিয়োজিত করিবেন। ভারতবাসীরা ইহা দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইবে। আর এমন একদিনও আসা অসম্ভব নয় যখন এদেশীয় ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ইংরেজ শাসকদের নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও দাবি করিবেন। পরবর্তীকালে বার বার শাসন-নীতি পরিবর্তনের ফলে এরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। উক্ত সভায় এদেশে ইউরোপীয়দের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণের প্রস্তাব হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং কয়েকজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের উপর এই আবেদনপত্র রচনার ভার পড়িয়াছিল।[৩]

সতীদাহের বিরোধী আন্দোলনেও প্রসন্নকুমার রামমোহনের সহকর্মী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে-সব প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তাহার প্রায় সকলের মধ্যেই প্রসন্নকুমার যুক্ত হইয়া পড়েন। ১৮২৯ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। সহমরণের বিরুদ্ধবাদী নেতৃবৃন্দ এদেশের মহদুপকারক এবম্বিধ আইন প্রণয়নের জন্য বেণ্টিঙ্ককে একখানি প্রশংসাসূচক মানপত্র প্রদান করেন। এই মানপত্র প্রদানে উদ্যোগীদের মধ্যে প্রসন্নকুমারও ছিলেন একজন। রামমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রসন্নকুমার মানপত্রে স্বাক্ষর করেন।

সংবাদপত্র-সেবা

রামমোহন রায়ের ভারতবর্ষ-ত্যাগের পর প্রসন্নকুমার প্রধানত সংবাদপত্রের ভিতর দিয়াই জনসেবায় অগ্রসর হইলেন। ১৮৩১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'রিফর্মার' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। ইহার স্বত্বাধিকারী তিন জন— প্রসন্নকুমার স্বয়ং, রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামাচরণ ঠাকুর। কলিকাতাস্থ ভোলানাথ সেনের 'বঙ্গদূত যন্ত্র' হইতে এখানি প্রকাশিত হইত। 'রিফর্মার' প্রকাশের কিছুকাল পরে, ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে ইহার অনুবাদ— 'অনুবাদিকা' সাপ্তাহিক ভোলানাথ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহারও মালিক ছিলেন প্রসন্নকুমার। বিনা পয়সায় এখানি বিতরিত হইত। বৎসরখানেক পরে 'অনুবাদিকা' বন্ধ হইয়া যায়।

'রিফর্মার' পত্রিকা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারি। 'রিফর্মারে' প্রথম প্রথম নানা বিষয়ে পত্র প্রকাশিত হইত। পত্রের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকিত। ইহা ব্যতীত সম্পাদক নিজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত এই সব আলোচনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলাভাষার প্রতি প্রসন্নকুমারের আন্তরিক দরদ একটি প্রস্তাবের মধ্যে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সকল বিষয়ও অন্যান্য পত্রিকায় 'রিফর্মারে'র উদ্ধৃতি হইতে জানিতে পারি। 'রিফর্মারে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "Address to our Countrymen" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি এখানে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য তথা সম্পাদক প্রসন্নকুমারের প্রগতিশীল মতবাদের কথা জানা যাইতেছে। প্রসন্নকুমার লেখেন—

---

৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮৯-৯০

"It is indeed gratifying to my feelings to observe, that in proportion as our understandings expand, as our feelings take their right course, and as our minds shake off the shackles of ignorance and superstition, means are taken by those to whose zeal in this good cause the native community are not a little indebted for raising them towards the meridian of all that is good and great. Whatever may be the opinion of those who advocate the continuance of the state of feelings as they are, there will come a time when prejudice, however deep and ramified its roots are reckoned to be, will drop, and eventually wither away before the benign radiance of liberty and truth.

"It is not a mere theoretical presumption that we raise this great and noble fabric of what must be estimated the only means of happiness to mankind. The influence of liberty and truth was spread and is spreading far and wide, and nothing can check its course. There was a time when the natives of this country were looked upon as a race of unprincipled and ignorant people, void of all qualities that separate human from the brute creation. But look at the contrast now. Is it possible that at the present day an impeachment of such a dark character will be allowed to bear the slightest colour of truth?

"The restrospect is indeed sad—pitiable; but we have relinquished the notions that had made it so. We are, as it were, regenerated in the light and by the influence of principles, that testify to the truth of our being made after the image of our Maker. Our ideas do not range now on the mere surface of things. We have commenced probing, and will probe on, till we discover that which will make us feel we are men in common with others, and, like them, capable of being good, great, and noble. We have been sufficiently degraded and despised, and will no longer bear the stigma. We cast off prejudice and all its concommitants as objects abhorrent to the principles which are calculated to ennoble us before the world.

"Assisted by the light of reason, we have the gladdening prospect before us, of soon coming to that standard of civilization, which has established the prosperity of the European nations. Let us then, my countrymen, pursue with diligence and care, the tract laid down by these glorious nations. Let us follow the ensign of liberty and truth, and, emulating their wisdom and their virtues, be in our turn the guiding needle to those who are blinded by the gloom of ignorance and superstition." [8]

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার এই দুইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং স্বাধীন জাতিসমূহের আদর্শে স্বাধীনতা ও সত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে ঐকান্তিক আকূতি প্রসন্নকুমারের প্রতি ছত্রে অনুরণিত হইতেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা এবং সত্যের দিকে আমরা ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করিয়া দিয়াছি।

প্রসন্নকুমার 'রিফর্মারে'র মাধ্যমে আমাদের তৎকালীন জাতীয় সমস্যাগুলিরও আলোচনা

[8] *The Asiatic Journal* for August 1831: Asiatic Intelligence, pp. 200-1.

করিয়াছেন। তিনি বরাবর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তখন আদালতে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল। 'রিফর্মার'[৫] ১৮৩১ সনেই আদালতে ফারসির স্থলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। ইহার কিয়দংশের মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল—

"ফারসি যে আদালতের ভাষা হওয়া উচিত নয়, সে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়া সহজ। তবে সমস্যা এই যে, আদালতের ভাষা ইংরেজি হইবে, না প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদের নিজ নিজ মাতৃভাষা হইবে। যদি ইংরেজি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আদালতের ভাষাও ইংরেজি হওয়ায় আপত্তি থাকিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ বোধগম্য ও কথ্য ভাষা ইংরেজি হওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় বিবেচ্য, আদালতের ভাষা বিচারকের মাতৃভাষায় হইবে, না তিনি যাহাদের বিচারকার্যে রত তাহাদের মাতৃভাষায় হইবে। সমগ্র জাতির পক্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেয়ে জনকয়েক মাত্র ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অধিকতর সহজসাধ্য।···কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিচারকেরা ফারসি ভাষায় এতই ব্যুৎপন্ন যে, ইহাতে লিখিত নথিপত্র তাঁহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কোন কোন বিচারক যে ফারসিতে ব্যুৎপন্ন তাহা মানিয়া লইলেও ইহা কিরূপে বলা চলে যে, তাঁহারা ইংরেজির চেয়েও ফারসি ভাষা ভাল জানেন? অথবা যদি শিখাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা কি ফারসির মতই প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে সমান ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন না? ইহা ছাড়া, এখনই ফারসির মত বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করা সিভিলিয়ানদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।"[৫]

প্রসন্নকুমার 'রিফর্মারে' যে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন তাহার সমর্থনে পরে অন্যান্য পত্রিকাতেও আলোচনা চলিতে থাকে। ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৩৮ সনে সরকার আদালতে ফারসির পরিবর্তে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন। পর বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে বঙ্গের আদালতসমূহে বাংলাভাষা প্রচলিত হইল।

প্রসন্নকুমার স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন। কিন্তু মিশনরী-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান-প্রণালী যে সমাজের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ১৮৩১, ১৯শে ডিসেম্বরের 'রিফর্মারে' একটি মিশনরী স্কুলের বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে এই মর্মে লেখেন যে, ছাত্রীদের সাধারণ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আর স্কুলের কর্তৃপক্ষ যেন হিন্দুর জাতীয় সংস্কারগুলির প্রতি মনোযোগী হন। এইরূপ করিলে তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, হিন্দু কলেজ দ্বারা যেমন হিন্দু ছেলে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে, আলোচ্য পদ্ধতি অনুসৃত হইলে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারাও তদনুরূপ শিক্ষাদান সম্ভব হইবে।[৬]

প্রসন্নকুমার শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজ গৃহেও স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার কন্যা বালসুন্দরী ইংরেজ গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন।[৭]

---

৫ *The Asiatic Journal* for May 1832: Asiatic Intelligence, Calcutta, p. 14.

৬ *Ibid.*, June 1832, *Ibid.*, pp. 80-1.

৭ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু নারীদের গৃহশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেখেন—
"The provisions which Baboo Prosunno Coomar Tagore had made for the education

'রিফর্মারে' ১৮৩৪ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্র এবং ইহার সপ্তাহ দুই পূর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে আলোচনা হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাজদ্রোহাত্মক। 'সমাচার দর্পণ' ১৮৩৪, ৫ই নবেম্বর তারিখে লেখেন—

"গত মাসের ১২ তারিখে [অক্টোবর ১৮৩৪] রিফর্মার সংবাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি আছে এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ব্বং রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ঐ পত্র সম্পাদক স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওন বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র [*The Calcutta Courier*] সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন।"

এই বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার 'এশিয়াটিক মিরর' নামক একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই মর্মের একটি রাজদ্রোহাত্মক উক্তির বিষয় উল্লেখ করেন, "এতদ্দেশীয় প্রজাদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টি পরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটী একটী ডেলা ফেলিয়াও মারেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন।" তখন 'মিরর'-সম্পাদক ত্রুটি স্বীকার করিয়া তবে সরকারী কোপ হইতে মুক্তি পান।[৮]

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রসন্নকুমার জমিদার-সন্তান হইলেও নানা কারণে কিছুদিন সরকারী নিমক-মহালে কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি তমলুকের সল্ট এজেন্টের দেওয়ানের কর্ম করিতেন। ১৮৩৪ সনের আগস্ট মাস নাগাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতাস্থ সল্ট বোর্ডের দেওয়ানের পদ ত্যাগ করিলে শূন্য পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র-সম্পাদনা করিতে হইলে সরকারের সহিত আর্থিক সংস্রব রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষত যখন 'রিফর্মারে' প্রকাশিত বিষয়াদি সম্বন্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে থাকে তখন প্রসন্নকুমার সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা হয়ত সমীচীন বোধ করেন নাই। তিনি ইহার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর কোম্পানীর কর্মীরূপে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন।

'রিফর্মার' ১৮৩৬ সনের প্রারম্ভ হইতে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। ২রা জানুয়ারী ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন—

"বৎসরাবসান সময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নানা সংবাদপত্রের নিবর্ত্ত পরিবর্ত্তনাদি হইয়াছে। বিশেষতঃ রিফর্মার ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গালা হেরাল্ডভুক্ত হইল। কিন্তু দুই সম্পাদক স্বাতন্ত্র্যেই আপনাদের অভিপ্রায় সকল লিখিবেন।..."[৯]

---

of his much-lamented daughter, were significant proofs of his sense of paternal duty, as well as of his energy and public spirit; and the happy effects produced by his exertions were illustrative of the probability of the plan we are recommending. For a Hindu gentleman of rank and station, so far to disregard the corrupt prejudices of a bigoted community, as to engage a European tutoress for the purpose of instructing a female member of his household; and the success which crowned his efforts, was an earnest of what might be expected from similar measures."—*A Prize Essay on Native Female Education*, pp. 114-5.

৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯১-২। ৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৫।

হিন্দু থিয়েটার

প্রসন্নকুমারের জীবনে ১৮৩১ সনটি বাস্তবিকই সন্ধিক্ষণ। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে এই বৎসর হইতে তিনি নিজেকে একেবারে লিপ্ত করিয়া ফেলেন। সংবাদপত্র-সেবার মধ্যে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই সময়ে হিন্দু কলেজের ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুবৎসরব্যাপী শিক্ষাগুণে হিন্দু সন্তানগণ অনেকে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় লাভে সমর্থ হন। প্রচলিত যাত্রা, কবি, তরজা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মানসিক উন্নতির সঙ্গে খাপ খাইতেছিল না। প্রসন্নকুমার ইহা লক্ষ্য করিয়া ইউরোপীয় নাট্যশালার আদর্শে কলিকাতায় একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিলেন। ডিরোজিও-সম্পাদিত 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান' লেখেন—

"The Hindoo Theatrical Association. On Sunday last, a meeting was called by Prusunno Comar Thakoor, to take into consideration a proposal for establishing a native theatre. It was attended by a select few, who resolved, first, theatres were useful ; second, that an assocition, to be called the Hindoo Theatrical Association, be established ; third, that a managing committee be formed to take into consideration the matter relative to such an undertaking. The following gentlemen were elected members of the Committee: Baboos Prusunno Comar Thakoor, Sreekissen Singh, Kishen Chunder Dutt, Gunga Churn Sen, Madhab Chunder Mullick, Tarachund Chuckerbuttee, and Huru Chandra Ghose."[১০]

ভারতের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের কথা বঙ্গ-সমাজ তখন বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় ছিল। ইহার কোন কোনটির ইংরেজী অনুবাদও হইয়া গিয়াছিল। বাংলা নাটকের তখন আবির্ভাব হয় নাই। মূল সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ও হয়ত সম্ভবপর ছিল না। অথচ ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা ইংরেজীতে আবৃত্তি এবং ইংরেজী নাটকের অংশবিশেষের অভিনয় স্কুল-কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রসন্নকুমারপ্রমুখ হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোগিগণ এই যুব ছাত্র-সমাজের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে অগ্রসর হইলেন। প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর প্রসন্নকুমারের শুঁড়োর বাগানে হিন্দু থিয়েটারের দ্বার ১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর উন্মোচিত হইল। উইলসন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত উত্তররামচরিত এবং জুলিয়স সীজার নাটকের শেষ প্রকরণ এই দিনে ইংরেজ ও বাঙালী বহু মান্যগণ্য ব্যক্তির সম্মুখে অভিনীত হইল। অভিনেতাদের বেশভূষা রুচিসম্মত এবং অভিনয় মনোরম হইয়াছিল। *Nothing Superfluous* নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয় পরবর্তী ২৯শে মার্চ। এইরূপে বাঙালীদের দ্বারা আধুনিক রুচিসম্মত নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইল।[১১]

---

১০ *The Asiatic Journal* for April 1832: Asiatic Intelligence, p. 176.

১১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, পৃ ১১-১৩ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

হিন্দু কলেজ

প্রসন্নকুমার ১৮২৪ সনে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্মকর্তৃ-সভার সদস্য নিযুক্ত হন। হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু বেনাভোলেণ্ট ইন্‌স্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিল। কিন্তু তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজের সঙ্গে। আর ইহার বলবত্তর কারণও ছিল। এই কথাই এখন বলিব।

আমরা জানি, প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের অন্যতম কৃতী ছাত্র। নিজের কৃতিত্ব বলেই ১৮৩১ সনের প্রারম্ভ হইতে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার একজন 'ডিরেক্‌টর' বা অধ্যক্ষ মনোনীত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি কলেজের 'গবর্নর' হইলেন। এ বিষয় এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। আমরা পূর্বে জানিতে পারিয়াছি, হিন্দু কলেজের দুই জন গবর্নরের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন একজন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার যখন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র এককালীন তের হাজার এবং গোপীমোহন ঠাকুর দশ হাজার টাকা দান করেন। কলেজের নিয়মাবলীতে স্থির হয় যে, এককালীন দশ হাজার বা তদূর্ধ্ব টাকা দান করার জন্য এই দুই জন বংশানুক্রমিক ভাবে উহার গবর্নর থাকিবেন। এই নিয়মে গোপীমোহন ঠাকুরের মৃত্যু (১৮১৮ খ্রী) হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্যকুমার ঠাকুর গবর্নর হন। সূর্যকুমারের মৃত্যুর (১৮২০ খ্রীঃ) পর তদনুজ চন্দ্রমোহন ঠাকুর এই পদ পান। চন্দ্রকুমার ঠাকুর গত হন ১৮৩২ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর। তাঁহারই শূন্য পদে গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার গবর্নর হইলেন। ইহার পর ১৮৫৪ সনে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রসন্নকুমার ১৮৩১ সনে কলেজের ডিরেক্‌টর বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াই একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দু কলেজে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষায় যুবক ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এই বিশ্বাসে হিন্দু সমাজের মধ্যে আন্দোলন-আলোড়ন উপস্থিত হইল। ডিরোজিওকে শিক্ষকতা কার্য হইতে অপসারণ করা হইবে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কর্তৃপক্ষ ১৮৩১, ২৩শে এপ্রিলের সভায় সমবেত হইলেন। ডিরোজিওর গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এ সম্বন্ধে অধিকাংশ সভ্যই এক মত হইলেন। হিন্দু কলেজের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে আছে, প্রসন্নকুমার ডিরোজিওকে এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (Baboo Prasano Coomer Thakoor acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage)। ইহার পর যখন প্রশ্ন উঠে যে, সমাজের বর্তমান মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডিরোজিওকে কাজে বহাল রাখা উচিত হইবে কিনা তখন অধিকাংশ সদস্যই ডিরোজিওকে কাজে বহাল না রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন। প্রসন্নকুমারও অধিকাংশের মতে মত দিলেন।

ইহার পর হইতে, বিশেষত গবর্নর পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজ পরিচালনা, শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ যুক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৩৫ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে সরকার একটি নূতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে 'ভিজিটর' বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের

পর্যবেক্ষণভার অর্পণের পরিবর্তে শিক্ষা-সমাজের[১২] ছয় জন সদস্য[১৩] লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী সাব-কমিটির উপর এই ভার পড়িল। ইহার বিনিময়ে কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণকে শিক্ষা-সমাজের সদস্য বলিয়া মান্য করা হইল। তবে ইহাতে একটি শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, অধ্যক্ষ-সভার মাত্র দুই জন সদস্য শিক্ষা-সমাজের কার্যে অংশী হইতে পারিবেন। সরকার যে বিভিন্ন ধাপে হিন্দু কলেজকে স্বায়ত্তে আনিতে চাহিতেছিলেন, ইহা তাহার একটি মাত্র। যাহা হউক, অধ্যক্ষ-সভা এই নিয়ম মানিয়া লইয়া শিক্ষা-সমাজে দুই জন সদস্য পাঠাইলেন। প্রথম বার পাঠানো হয় রাধাকান্ত দেব এবং রসময় দত্তকে। প্রসন্নকুমার কলেজের অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে ১৮৩৭, ১৮৪০-৪৪ এবং ১৮৪৪-৫০ সন পর্যন্ত শিক্ষা-সমাজের সদস্য ছিলেন।

হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা

হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজ পাঠশালার কথাও বিশেষ করিয়া বলিতে হয়, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও প্রসন্নকুমার অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু কলেজ এবং কলিকাতার অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইলেও বাংলা শিক্ষা দিবারও যথেষ্ট আয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসক, ইংরেজী শিখিলে যেমন সমাজে মান প্রতিপত্তি বাড়ে তেমনি অর্থার্জনও সহজ হয়; একারণ সাধারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৫ সনে বড়লাট বেণ্টিঙ্কের শিক্ষা-সংক্রান্ত নির্দেশ, অর্থাৎ সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন ইংরেজী ধার্য হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিই লোকের দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়িল। যদিও শিক্ষা-সমাজ ১৮৩৬ সনে বলিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে, কিন্তু পরবর্তী কার্যকলাপে ইহা মাত্র কথার কথাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ বাংলা শিক্ষার প্রতি সরকারের অনাদর এবং সাধারণের অমনোযোগ লক্ষ্য করিলেন এবং কি করিয়া হিন্দু কলেজের ইংরেজীশিক্ষিত ছেলেদের বাংলাতেও পাকাপোক্ত করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা তাঁহাদের এই চিন্তার ফল।

হিন্দু কলেজের পশ্চিম দিকে, বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার মধ্যে কলেজের জমির উপরে কলেজেরই অর্থে বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা-গৃহ নির্মিত হয়। ডেভিড হেয়ার ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন কলেজের অধ্যক্ষ ও বহু মান্যগণ্য ব্যক্তির সম্মুখে ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলা শিক্ষার উপকারিতা আর এরূপ পাঠশালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ডেভিড হেয়ার এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এড্ওয়ার্ড রায়ান বক্তৃতা দিলেন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর বক্তৃতা করেন এবং তাহা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। 'সমাচার দর্পণ' (৩ জুন, ১৮২৯) শিলান্যাসের বিবরণের মধ্যে প্রসন্নকুমারের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিলেন—"তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন।"

---

১২ বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনার জন্য সরকার ১৮২৩ সনে "General Committee of Public Instruction" গঠন করেন। ১৮৪২ সনের জানুয়ারী হইতে ইহার নাম বদল হইয়া 'Council of Education' হয়। সমসাময়িক পুস্তক ও পত্রিকাদিতে ইহার বাংলা করা হয় 'শিক্ষা-সমাজ'।

১৩ সার্ এড্ওয়ার্ড রায়ান, এইচ্. সেক্সপীয়ার, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, জে. ইয়ং, ক্যাপ্টেন বার্চ এবং জে. গ্রাণ্ট।

প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৪০ সনের ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে পাঠশালার কার্য আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রথম দিনে বাংলা ভাষার পক্ষে শিক্ষার বাহন হইবার যোগ্যতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি কার্যারম্ভের প্রথম ছয় মাস কাল প্রধান পণ্ডিতরূপে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ছাত্রদের নিকট 'নীতি-দর্শন' সম্পর্কে একপ্রস্ত বক্তৃতা দেন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিয়োগে প্রসন্নকুমারের বিশেষ হাত ছিল। তাঁহার পর ১লা জুলাই হইতে পাঠশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন ক্ষেত্রমোহন দত্ত। প্রসন্নকুমারই তাঁহাকে এখানে আনয়ন করেন। ১৮৪২, ৭ই মার্চ হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের একখানি পত্রের নিম্নাংশ হইতে জানা যাইতেছে—

"Moreover the present superintendent Khetramohan was employed at the Calcutta School Society's school and brought by our worthy colleague Baboo Prasanna Cumar Takoor for the regularity of the Patsala and has discharged his duties to the entire satisfaction of the Managing Committee of the Hindu College. [১৪]

হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্দেশ্য— বাঙালী ছেলেদের বাংলাভাষার মাধ্যমে স্বদেশীয় এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান। ১৮৪৩-৪৪ সনের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ ১৯) পাঠশালা প্রতিষ্ঠার এই উদ্দেশ্য স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে আছে—

"The primary objects contemplated in the establishment of the Patsala were to 'provide a system of National Education, and to instruct Hindoo youths in Literature and in the Science of India and Europe, through the medium of the Bengalee Language'."

কলেজ কর্তৃপক্ষ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক রচনা করাইতে উদ্যোগী হইলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লিখিলেন বালকদের পাঠোপযোগী 'শিশুসেবধি'। গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও বাংলাভাষায় রচিত এবং হিন্দু কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ইহার একটি বিবরণ ১৮৪০-৪১ এবং ১৮৪১-৪২ সনের যুগ্ম সরকারী শিক্ষা রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সরকারের প্রতিবন্ধকতা হেতু কলেজ কর্তৃপক্ষের এই কার্য আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। একটু পরেই আমরা তাহা জানিতে পারিব। ইতিমধ্যে পাঠশালাটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ইহা নিরাকরণার্থ হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হইবার উচ্চতম বয়স বাড়াইয়া আট স্থলে দশ বৎসর করিতে শিক্ষা-সমাজকে অনুরোধ করিলেন। শিক্ষা-সমাজ তখন এই যুক্তি দেখাইয়া ইহা অগ্রাহ্য করেন যে, ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহ এবং বাংলা পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে বাংলা শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আবশ্যকতা তাঁহারা স্বীকার করিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি জে. সি. সি. সাদার্ল্যাণ্ড এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। প্রসন্নকুমার এবং সাদার্ল্যাণ্ড উভয়েই হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ এবং পাঠশালার ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার বিষয় পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন

১৪ *Hindoo College Proceedings.* Unpublished.

যে, শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে পাঠশালায় বেশী দিন ছেলেদের পড়াইতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স আট স্থলে দশ বৎসর করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শিক্ষা-সমাজ তাঁহাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।[১৫] ইহা হইতে হিন্দু কলেজ, পাঠশালা, বাংলা শিক্ষা তথা শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন হয় তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এ বিষয় বলিবার পূর্বে বাংলা শিক্ষা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের মতামত আমাদের জানিয়া রাখা দরকার।

বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা

প্রসন্নকুমার ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা এবং বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া সরকারের নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি ১৮৩৯-৪০ সনের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে স্থান পাইয়াছে। প্রসন্নকুমার বাংলা শিক্ষাকে দুইটি স্তরে ভাগ করেন— (১) ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা, এবং (২) বাংলা বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা। প্রসন্নকুমার বলেন, বাংলা বিদ্যালয়ই আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু আপাতত মাতৃভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষাদানের কথাই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। একারণ তিনি বাংলা শিক্ষার ক্রম স্থির করেন এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি অনুবাদে দক্ষতা অর্জনের জন্য যুবকদের বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা দেন। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন-কল্পে এইরূপ এক দল শিক্ষিত যুবক প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক যাঁহারা যোগ্য শিক্ষক হইতে এবং অনুবাদ-পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন। প্রসন্নকুমার বলেন—

"Could we but find a few Native youths qualified in the English arts and sciences, and possessed of sufficient knowledge to express their newly acquired ideas through the vernacular language, they might, we think, be trained in the combined duties of authors and teachers. This were, at least, the first and surest step eventually to establish a permanent system of Indian national education."

সংস্কৃত পণ্ডিতদের জ্ঞানে গভীরতা এবং নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করার আগ্রহ সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহাদিগকে ইংরেজি শিখাইয়া লইলে উপরের দুই উদ্দেশ্যই অতি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে। বাংলা পাঠশালার শিক্ষাদান এবং পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে এইরূপ পণ্ডিত নিয়োগ দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। পরিকল্পনাটিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন—

". . . . and it occurs to me that among this class we might find fit and competent persons for the office of Teacher, to be entrusted with the immediate charge of the vernacular classes. We have already secured the services of some such qualified instructors, who, notwithstanding that they are born, and have been brought up as Pundits, and have so far imbibed somewhat defective habits and modes of thinking ; yet I have often found them comparatively more open

---

১৫ *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* for 1843-44, pp. 20-22.

to conviction and susceptible of improvement in the art of instruction, than the generality of individuals of their section of the community. It only requires, in my opinion, some tact and policy to train them up for the office of Teachers, and useful co-adjustors in our undertaking."

সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা শিক্ষাদান এবং বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় সার্থকতা লাভ করে।

পাঠ্য পুস্তক রচনা ও সরকার

বাংলা ভাষা শিক্ষাদান এবং বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের মতামত আমরা জানিতে পারিলাম। এই উদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশে শিক্ষা-সমাজ ১৮৪১ সনের ২৯শে জুলাই কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি সাব্-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব্-কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বাংলা শিক্ষার প্রতি শিক্ষা-সমাজ আদৌ অবহিত ছিলেন না। এতদিন কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিবিধ বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনা করাইতেন। শিক্ষার ভার ক্রমশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ্য পুস্তক রচনা নিয়ন্ত্রণ করিতে মনোযোগী হইলেন। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্বও সরকার নিজে লইলেন। স্থির হইল, বিবিধ বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রথমে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, পরে বাংলা ভাষায় সে সকল অনুবাদিত হইবে। প্রথমে ইংরেজিতে রচনা করাইবার কারণ— কোন অবাঞ্ছিত বিষয় পাঠ্য পুস্তকে লিখিত বা সন্নিবেশিত না হয়। শিক্ষা-সমাজের একটি অংশের উপর পাঠ্য পুস্তক রচনার ভার অর্পিত হয়, ইহার নাম দেওয়া হয় Section of the Council of Education for the Preparation of Vernacular Class Books। এই অংশটি বর্তমান সরকারী টেক্সট-বুক কমিটির পূর্বজ।

প্রসন্নকুমার স্বয়ং জরিপ সম্বন্ধে একখানি পাঠ্য পুস্তক লেখেন। ইহার স্বত্ব তিনি শিক্ষা-সমাজকে অর্পণ করেন। শিক্ষা-সমাজের ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে (পৃ ২৬) আছে—

"Our colleague Baboo Prosunno Comar Tagore liberally placed at our disposal the copyright of his elementary work on land surveying in Bengalee, a new edition of which will shortly be published by the Calcutta School Book Society at their own risk, upon our guarantee of introducing it into our schools as a class book. This we agreed to . . . ."

হিন্দু কলেজের পরিণতি

হিন্দু কলেজের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের সংযোগের কথা বলিয়াছি। ১৮৩৫ সনে হিন্দু কলেজের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয়। ১৮৪১ সনে ইহা একেবারে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসে। ভারত-সরকারের সেক্রেটারী জি. এ. বুস্‌বি ১৮৪১ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে শিক্ষা-সমাজকে এক পত্রে[১৬] হিন্দু কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান—

১৬ *Hindoo College Proceedings.* Unpublished.

"The Native management and control of the Hindu College to be vested in the Sub-Committee of the General Committee of Public Instruction consisting of the present Managers with the addition of the two Members of the General Committee subject like other Sub-Committees, to the control of the General Committee of Public Instruction."

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা এবং শিক্ষা-সমাজের দুই জন সদস্য লইয়া কলেজ পরিচালনার জন্য একটি সাব্-কমিটি গঠিত হইবে। অন্যান্য সাব্-কমিটিগুলির ন্যায় শিক্ষা-সমাজের কর্তৃত্বাধীনেই ইহা কাজ করিবেন। এই পত্রেই আছে—

"The Rajah of Burdwan and Baboo Prossunno Coomer [Thakur] to be recognised as heriditary Governors of the College under the original regulations of the College when it was founded, and their families to be allowed the privilege of choosing a Member of the Sub-Committee."

বর্ধমানের মহারাজা এবং প্রসন্নকুমার মূল নিয়ম অনুসারে গবর্নর রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের পরিবার দুইটির গবর্নর নিযুক্ত করিবার অধিকার রহিল।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার মূল সদস্যগণ ইহার সঙ্গে বিশেষ যোগ না রাখিলেও প্রসন্নকুমার ইহার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন ইহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। শিক্ষা-সমাজের অনাদর এবং সরকারের শিক্ষা-নীতির জন্য হিন্দু কলেজ পাঠশালা যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হইল তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রসন্নকুমার স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কামনা করিতেন। সরকারের মনোভাব জানিয়াও এতদিন তিনি যথাসাধ্য সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সনের শেষ পর্যন্ত তাহা আর সম্ভব হইল না। তখন হিন্দু যুবকদের খ্রীস্টান করার হিড়িক চলিয়াছিল। মিশনরীদের এই কার্যে সরকার নীরব থাকিয়া পরোক্ষে সহায়তাই করিতেন। ঐ বৎসর আগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীস্টান হইলে তাঁহাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া দিবার জন্য হিন্দুসমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা অর্থাৎ শিক্ষা-সমাজের সাব্-কমিটিতে ইহা লইয়া আলোচনা হইল। সাব্-কমিটির ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা ইতিমধ্যে বাড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত সভায় চার পাঁচ জন ইউরোপীয় সদস্য এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্ত উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় সদস্যগণ ও রসময় দত্ত কৈলাসচন্দ্র বসুকে কলেজ হইতে অপসারিত করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব ইহার সপক্ষে মত দিলেন। প্রসন্নকুমার কৈলাসচন্দ্রকে অপসৃত করার অনুকূল কারণসমূহ সম্বলিত একখানি প্রতিবাদপত্র লিখিয়া দিলেন এবং উপস্থিত সদস্যগণকে শিক্ষা-সমাজ ও সরকারের নিকট ইহা পেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইউরোপীয় সদস্যগণ সকলেই ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষা-সমাজের অধিবেশনে দেখা গেল, সরকারের নিকট প্রেরণ করা দূরে থাকুক, এমন কি শিক্ষা-সমাজে আলোচনা করিতেও উক্ত সদস্যগণ অসম্মত হইলেন। ইউরোপীয় সদস্যগণের এতাদৃশ গর্হিত আচরণে বিরক্ত হইয়া প্রসন্নকুমার নিজ পদে কার্য করা স্থগিত রাখিলেন। রাধাকান্ত দেব শিক্ষা-সমাজের সভাপতি বেথুন সাহেবের নিকট লিখিত পত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি ইহার একটি রূঢ় জবাব দিলেন। তিনি লেখেন—

"I regret Baboo Prosunno Coomer Thakur's secession from the performance of his own duty but carries with it its own punishment in the loss of the influence in the counsels of the College which his well-known ability would otherwise secure to him."[১৭]

অর্থাৎ হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রসন্নকুমারের পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেরাই দণ্ড পাইয়াছেন। ইহার পরে, বলিতে গেলে, শিক্ষা-সমাজই কলেজ পরিচালনা করিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ-সভা নামে মাত্র ছিল। ১৮৫৩ সনের নবেম্বর মাসে স্থির হয়, হিন্দু কলেজের কর্তৃত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পরিচালনার ভার শিক্ষা-সমাজের উপর অর্পণ করিবেন। শেষে অধ্যক্ষ-সভার সর্বশেষ অধিবেশনে রসময় দত্তের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা রহিত হইল এবং ইহার কলেজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য কলেজের প্রিন্সিপাল সম্পন্ন করিবেন। তিনি অতঃপর সকল বিষয় শিক্ষা-সমাজকেই জানাইবেন। বর্ধমানের মহারাজা এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর গবর্নর-পদ ত্যাগ করিলেন। কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত ১৮৫৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি নিজ পদে ইস্তফা দেন।[১৮]

হিন্দু কলেজের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন ইহার উচ্চতন বিভাগ (Senior department) প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং নিম্নতন বিভাগ (Junior department) হিন্দু স্কুলে পরিণত হইল। যে হিন্দু কলেজ বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে একদা যুগান্তর আনিয়াছিল এবং যাহার পরিচালনায় রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত প্রসন্নকুমারও এতখানি সময় ও শক্তিক্ষেপ করিয়াছিলেন এইরূপে তাহার রূপান্তর ঘটিল।

---

১৭ *Hindoo College Proceedings.* Unpublished.

১৮ *General Report on Public Instruction, etc.* from 30th September 1852 to 27th June 1855.—Hindu College, p. 7.

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যায় 'বিদ্যায়তনে শিল্পকলা' প্রসঙ্গে যে চিত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত।

স্বরলিপি

বাহার — আড়াঠেকা

গান ॥ একি হরষ হেরি কাননে

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

II { -া ধণা পা মমা | মপা -ধপধা মজ্ঞা -মজ্ঞমা | ^মণা -ধণা -পর্সা -নর্রা | র্সাঃ -ণধঃ -পর্সা -া } I
০ এ০ কি হর ষ০ ০০০ হে০ ০০রি কা ০০ ০০ ০ন নে ০০ ০০ ০

I -র্সর্সা র্সর্সা র্সনর্সা -র্রর্সা | র্সাঃ -ণধঃ -পর্সা -া | -া ^ণর্সণা পা মপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা I
০প রান আ০০ ০কু ল ০০ ০০ ০ ০ স্বপ ন বি০ ক০ ০০০ শি ত

I -সসা -মমা মমা পধপা | ^ম-পা -া মজ্ঞা -মজ্ঞমা | ^মণা -ধণা -পর্সা -নর্রা | র্সা -ণধা -পর্সা -া II
০মো ০হ মদি রা০০ ০ ০ ম০ ০০য় ন ০০ ০০ ০য় নে ০০ ০০ ০

II -া মমা মণা -া | -ধা -া ননা র্সর্সা | র্সা -া -া -নর্সা | র্সর্সা -া -া -া I
০ ফুলে ফুলে ০ ০ ০ করি ছেকো লা ০ ০ ০০ কুলি ০ ০ ০

I -র্সর্সা নর্সা র্রা -া | -র্সা -না -া ননা | ননা র্সা -নর্রা র্সা | -ণধা -পা -া র্সর্সা I
০ব নেব নে ০ ০ ০ ০ বহি ছেস মী ০র ণ ০০ ০ ০ নব

(দাদ্‌রা) I { ণা -ধণা পা | -মা পা -া I ^মজ্ঞা -া -া | মা পা -া I
প ০০ ল্ল ০ বে ০ হি ০ ০ ল্লো ল ০

I মা -া -রজ্ঞা | -মা জ্ঞা -রা I সা -া -া | (র্সা র্সা -া) } I
তু ০ ০০ ০ লি ০ য়ে ০ ০ "ন ব" ০

I -া -া সা I
০ ০ ব

I সমা -া -মমা মমা | {পধপা -মপা মজ্ঞা -মজ্ঞমা | ^মণা -ধণা -পর্সা -নর্রা | (র্সাঃ -ণধঃ -পর্সা -া I
স০ ০ ০স্ত পর শে০০ ০০ ব০ ০০ন শি ০০ ০০ ০হ রে ০০ ০০০

I ^ধণা পা মা মমা) } | র্সা -া -া -ণধা I
ব স ন্ত পর রে ০ ০ ০০

I -া -া ধধা ধণা | র্সর্মা -া -র্গর্মর্পাঃ -র্মঃ | -র্গা -া -াঃ র্গঃ | র্গর্গা র্গর্মা র্মর্গা-র্রর্সা I
০. ০ কিঙ্কা নিকো থা০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ প রান মন ধা০ ০ ০

I র্সর্রর্সা -ণর্সা ণধা -া | -া ধধাঃ -ণঃ র্সর্রা | র্রজ্ঞর্রা-র্সর্রা -নর্সর্রা -র্রর্সা | র্সাঃ -ণধঃ -পর্সা -া II
ই ০ ০ ০০ ছে০ ০ ০ বস ০ স্তুস মী ০ ০০ ০০০ ০র ণে ০০০০০

II -া মমা ণা -ধণা | র্সা -া -া -া | র্সনা -র্সর্সা র্সা -া | -া -া -া -া I
০ ফুলে তে ০শু য়ে ০ ০ ০ জ্যো০ ০ছ না ০ ০ ০ ০

I -র্সর্সা নর্সা র্রা -র্সা | -না -া -া ননা | র্সা -নর্রা র্সাঃ -ণধঃ | -পা -া -া র্সা I
০হা সিতে হা ০ ০ ০০ সিমি লা ০ই ছে ০০ ০ ০০ মেঘ

(দাদ্‌রা) I { ণা -ধণা পা | -মা পা -া I মজ্ঞা -া -রজ্ঞা | মা পা -া I
ঘু ০ ০ মা ০ য়ে ০ ঘু ০ ০ ০ মা য়ে ০

I মা -া -রজ্ঞা | -মা জ্ঞা -রা | সা -া -া | (র্সা -া -া) } I
ভে ০ ০ ০ ০ সে ০ যায় ০ ০ "মেঘ" ০ ০

I -া মা মা I
০ ঘু ম

II মা মা -া মমা | { পধপা -মপা -মজ্ঞা -মজ্ঞমা | ধণা -ধণা -পর্সা -নর্রা | (র্সাঃ -ণধঃ -পর্সা -া I
ভা রে ০ অল সা০০ ০০ ০০ ০০ব সু ০০ ০০ ০ন্ধ রা ০০ ০০০

I ধণণা পা মা মমা) } | র্সা -াঃ -ণঃ ধণা I
"ঘুম ভা রে অল" রা ০ ০ দূরে

I র্সর্গাঃ র্গঃ র্গর্মা -র্গর্মর্পা | -র্মর্গা -া -া র্গর্গা | র্গর্মাঃ -র্গঃ -র্রর্সা র্সর্রর্সা | ণধা -া -া -া I
পা ০ পি য়া ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ পিউ পিউ ০ ০০ র ০ ০ বে০ ০ ০ ০

I -া ধধাঃ -ণঃ র্সর্রা | জ্ঞর্রা -র্সর্রা -নর্সা -নর্সর্রা | র্সা -া -া -ণধা | -পর্সা -া -া -া IIII
০ ডাকি ০ ছেস ঘ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ নে ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

বিদ্যালয়ের শিথিল গ্রন্থিগুলিকে আঁট করে তোলবার মুখেই আমাকে চলে আস্তে হল তাই মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ভালো করে যখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা সামর্থ্য আছে তার মধ্যেই নিজের কাজকে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন করাই সঙ্গত। কোনোদিন এত বেশি সম্পদ আমাদের জুটবেনা যখন বল্‌তে পারব, বাস্, আর দরকার নেই। আজ কুড়ি বছর পূর্ব্বে যখন হাতে কিছুই ছিলনা তখন মনে হত বছরে যদি দু তিন হাজার পাই তাহলেই আর ভাবনা থাকেনা। আজ বছরে বারো হাজার টাকা খরচ করেও মনে বুঝচি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্তুত অর্থলাভের দ্বারা দৈন্য কখনই ঘোচে না। কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্রের মতোই কর্ম্মেরও একটা art আছে। সম্পূর্ণতার দ্বারাই তার দৈন্য ঘোচে। উপকরণবৃদ্ধির দ্বারা কোনোদিন দৈন্য ঘোচেনা, উপকরণের সামঞ্জস্য দ্বারাই সেটা সম্ভব। যা আমার হাতে আছে সেইটেকেই সুঘটিত করতে পারলে সে স্থায়ী মূল্য পায়, তাকে তার আপন সীমার চেয়ে বড়ো করতে গেলেই সে সুষমা হারায়। আমার কাজের সেই কুড়ি বছর আগেকার সুকুমার মূর্ত্তিটি যখন মনে পড়ে তখন আমার অন্তরের থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে। তবু একথাও স্বীকার করতে হয় সকল কর্ম্মই কাব্যের মতো অহেতুক আনন্দময় নয়। অর্থাৎ কেবল তার রূপের সৌষ্ঠব নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া চলেনা তার ফলের বিচারও চাই। মানুষের অভাব আছে তা পূরণ করতে হবে। এরজন্যে যে সাধনা সে রূপের সাধনা নয়। তার শেষ লক্ষ্য সিদ্ধি। জলপাত্রের চরম কথাটা এই যে তাতে করে বেশ ভালো করে জল সঞ্চয় বা জল পান করতে পারা চাই— সেই সঙ্গেই গৌণভাবে তাকে সুন্দর করা ভালো। কীট্‌স্‌এর Ode to Grecian Urn কাব্যটি ব্যবহারের অতীত, সুতরাং সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যে পাত্রটি দেখে তিনি ঐ কবিতা লিখেছিলেন, তার মূল প্রয়োজন ছিল আধারের কাজ ভালো করে করা— আনুষঙ্গিকভাবে সুন্দর যদি সে নাও হত তাহলে খুব বেশি নালিশের কারণ থাকতনা। বিদ্যালয়টাও তেমনি ব্যবহারিক বস্তু, বিশেষ অভাব পূরণের জন্যে— অর্থাভাবে, লোকাভাবে, নিষ্ঠাভাবে তা যে পরিমাণে

অসমাপ্ত থাকবে সেই পরিমাণেই সেজন্যে লজ্জিত হওয়া চাই। অতএব সমুদ্রের এপারে ওপারে দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে, তাতে শরীর থাক্ আর যাক্।

তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জিনিষটাকে আত্মীয়ের মতো দেখো। যদি কোথাও শৈথিল্য ধরা পড়ে তবে দুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো। আমার অনুপস্থিতিতেই তোমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেশি এই কথাটি ভুলোনা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই আত্মীয়োচিত দায়িত্ববোধ যদি জেগে ওঠে তাহলে আমি সব চেয়ে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হই। সম্প্রতি আমরা বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থাবিধিকে আঁট করে তুল্‌ছিলুম, তার মধ্যে ওখানকার মেয়েদের বেষ্টন করতে পারিনি। সেখানে শান্তিনিকেতনের পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি দেওয়া দুঃসাধ্য। আমি ওখানকার আশ্রম-সম্মিলনী থেকে অনেক প্রত্যাশা করচি। এই সম্মিলনীর যোগে ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে একটা স্বকর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠ্‌চে অনুভব করে আমি মনের মধ্যে খুব একটা আশ্বাস বোধ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশ্রমসম্মিলনীতে মেয়েরা আছে পদ্মপত্রে জলের মতো— তারা ওর সঙ্গে এক হয়ে যায়নি। এই কারণে সমস্ত আশ্রমের প্রতি মেয়েদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হচ্চেনা। তারা কি পেতে পারে একথা যতটা ভাবচে কি দিতে পারে একথা তত ভাবচেনা। তাতে করে আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের প্রাণের যোগ ত্যাগের পথে সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চেনা। এইটে আমাকে সব চেয়ে আঘাত দিয়েচে। কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি সেইদিন থেকেই আমার মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রমরচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর এবং প্রাণবান হয়ে উঠ্‌বে। পূর্ব্বকালের ছাত্রীদের মধ্যে ইভা ও বাব্‌লি হৃদয় দিয়ে আশ্রমকর্ম্মের আনুকূল্য করেচে— সেইজন্যে আজো আশ্রমের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সরস ও সবল হয়ে আছে। তারা নিয়ম রক্ষা সম্বন্ধেই যে কেবল সতর্ক ছিল তা নয় তারা আশ্রমের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা ঘট্‌লে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ত— বারবার আশ্রমব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনা করতে আস্‌ত, সেটা তাদের নিজের অধিকারলাভের সুবিধাসাধনের দাবী নিয়ে নয়, সাধারণ হিতের প্রতি লক্ষ্য করে। সেইজন্যে তখনকার দিনের উৎসব প্রভৃতিতে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের এত বেশি সাহায্য করেচে। আশ্রমের প্রতি আত্মীয়ভাবের নিষ্ঠা যদি ওখানকার মেয়েদের মনে স্বভাবতই স্ফূর্ত্তি না পায় তাহলে জানব ঐ অংশে সমস্ত আশ্রমের সাধনা ব্যর্থ হয়েচে। নুটু আমাদের আশ্রমেরই মেয়ে— শিশুকাল থেকে সে সর্ব্বতোভাবেই ঐখানে মানুষ হয়েচে— আশ্রমের জন্যে সে সাধ্যমত চেষ্টা করচে এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ওখানকার ছাত্রীমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে না পারলে যথার্থ সফলতালাভ করবেনা। তাই ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে মেয়েরা যদি স্বতন্ত্র আশ্রমসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করে ও সম্মিলনীতে তাদের সম্মিলিত সাধনা যদি আশ্রমের হিতসাধনে তাদের দায়িত্বকে উদ্বোধিত করে তোলে তাহলে আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়। একদিন শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লী ছিলনা তখন ওখানে দুই একটি গৃহস্থবাড়িতে ছাড়া মেয়েরা কেউ থাকতেন না। তখন কতদিন আমি কবিসুলভ কল্পনায় আশ্রমলক্ষ্মীদের কথা ভেবেছি— তখন আমার মনে ছিল ওখানে গুরুপত্নীদের আসন প্রতিষ্ঠা যদি হয় তাহলে আশ্রম প্রাণে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমার সে কল্পনা রূপ গ্রহণ করেনি। এমেরিকায় Urbanaয় যখন ছিলাম তখন Mrs. Seymour প্রভৃতি গুরুপত্নীদের লোকসেবা আমি দেখেছি ও তার মাধুর্য্য আমি ভোগও

করেছি। ঠিক সেই প্রাণের জিনিষটি হৃদয়ের যত্নটি পুরুষদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আমার মনে ছিল মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রূষার অমৃতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। নানা উদ্যমের স্রোতে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস করে তুল্‌বে। সেটা যে ঠিকমতো হয়নি এটা আমার কাছে নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে। তাই মনে হয় এর মধ্যে আমাদেরই ত্রুটি আছে। হয়তো এর কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে মেয়েদের শক্তিকে ঠিকভাবে আবাহন করতে পারিনি। কিন্তু সেইরকম বাইরের আনুকূল্যের প্রতি অপেক্ষা করে থাকা ঠিক হবেনা। মেয়েদের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সে যেন আপনার স্থান আপনিই জয় করে নেয়। আশ্রমের মধ্যে সেটা কোনো কারণেই যেন অব্যক্ত না থাকে। মেয়েরা যদি আশ্রমসম্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাহলে তাঁদের সকলের যোগে শ্রীভবনের ও সেই সঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। মনে আশা করে আছি একদা ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্‌ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়েরা সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্কণ্টক ও তার বিধিবিধানগুলিকে যদি সুদৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অনুকূল করেন তাহলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। এখনো সেইজন্যে আশা করে থাকব।

পাঠভবনের জন্যে আমি যে আদর্শপত্র তৈরি করে দিয়েছি, সেটিকে বিশ্লেষণ করে তোমরা অধ্যাপকেরা মিলে একটা কর্ত্তব্যতালিকা তৈরী কোরো। সেই তালিকার মধ্যে কোন্‌গুলি অনুষ্ঠিত হচ্চে কোন্‌গুলি অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্চে এবং কোন্‌গুলি আদৌ অনুষ্ঠিত হচ্চে না তা নিয়তই তোমাদের চোখের সামনে থাকা চাই। অন্য দেশের লোকের কাছে যখন শান্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এই সব আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিস্ময়বোধ করে— কিন্তু এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কিছুই হতে পারেনা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র নিষ্ঠা দাবী করিনি। খুব সম্ভব আমি তার অধিকারী নই। যদি অধিকারী হতুম তাহলে এতদিনে আশ্রমকে ঘিরে সহায়কারী লোকের অভাব হতনা। আশ্রমের আদর্শের মধ্যে যে সত্য আছে আমি কেবল সেই সত্যের দোহাই দিয়েছি। যে কারণেই হোক্ আমাদের দেশে ব্যক্তিগত নিষ্ঠার প্রভাবই সব চেয়ে প্রবল— সেই নিষ্ঠার যোগেই আমাদের দেশে ত্যাগ সহজ হয়। এই ব্যক্তিস্বরূপের মহিমা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ যদি তাঁদের মুখোষ পরে আড়ম্বর করে তাহলে সেটা একটা গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠে। অতএব ও পথ আমার নয়। সেইজন্যেই তোমাদের কাছে নির্দ্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশি কিছু দাবী করতে আমি কুণ্ঠিত হই। কাজের ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সেই বেশিটুকুর দরকার হয়। সেই বেশিটুকু দেওয়া সহজসাধ্য, এমনকি আনন্দময় হতে পারত, যদি বিদ্যালয়ের আদর্শগত সত্যরূপের প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রবল হত। তাহলে নিজের কথা অনায়াসেই ভোলা যেত। কিন্তু সেটাকে দাওয়া করা যায় না। দেনাপাওনার সম্বন্ধেই দাবীদাওয়ার কড়াক্রান্তি হিসাবনিকাস চলে— কিন্তু যা দেনাপাওনার অতীত তার উপরে ব্যক্তিবিশেষের জোর খাটেনা, ব্যবস্থা বিভাগের জোর খাটেনা— সত্য স্বয়ং তাঁর সমস্ত আনন্দ নিয়ে যাঁর অন্তরে আবির্ভূত হন তিনি বিনাবাক্যেই সর্ব্ব সমর্পণ করেন। সেই কথা যখন মনে ভাবি তখন একথাও স্বীকার করি যে শান্তি-

নিকেতনের আশ্রমের কাজকে সত্য করে তোলবার ভার আমার মতো লোকের নেওয়া [উচিত] ছিলনা। আমি ভাবুকমাত্র, আমার মনে ভাবের রূপ প্রকাশ পায়, তাতে আমার নিজেকে উৎসাহ দেয়, আমার নিজেকে আমার সহজ আরামের আয়োজন থেকে সঙ্গহীন উপলবন্ধুর পথে বের করে আনে— কিন্তু আমার নিজের মধ্যে প্রেরণাশক্তি নেই। এ শক্তি কেউ চাইলেই পায়না। এ শক্তি ঈশ্বরদত্ত। যার এ শক্তি স্বভাবত নেই তার এমন কোনো কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় যে কাজের জন্যে বিভিন্ন চরিত্রের নানা লোকের প্রয়োজন। সেই বহুকে এক লক্ষ্য অভিমুখে প্রেরণ করা কেবল ভাবুকের কাজ নয়। অথচ দুর্দ্দৈবক্রমে কোনো এক সময়ে এই কর্ম্মভার আমি স্বীকার করেছি। আমি এই কাজের যোগ্য নই বলেই প্রথম দিন থেকেই নিরতিশয় দুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়ে এসেচি। এইজন্যেই এই কর্ম্মের অন্তরের দিকে যতই অভাব বেড়েচে বাইরের দিকে এর রূঢ়তা ততই কঠিন হয়েচে। ততই টাকার প্রয়োজন এত উগ্র হয়ে উঠেচে। সকলের সব অভাব আমাকে একলাই মেটাতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি আমার একলারই স্কন্ধে। তাতে প্রত্যহ আমার শরীর পীড়িত, চিত্ত উদ্বেগে অশান্ত— দুরাশার তাড়নায় সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরে বেড়াচ্চি ফল অতি অল্পই মিলচে— অপরপক্ষে অহৈতুক প্রতিকূলতা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে। এমনি করে আজ ২৫ বৎসর বহু টানাটানি করে কেটে গেল, এখনও কূলের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলেমনা। আর বেশি দিনের মেয়াদ নেই। এখন এই অল্প কয়দিনের জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য বা ক্লান্তির দোহাই দিয়ে আমার চেষ্টায় শৈথিল্য ঘট্‌তে দেবনা। প্রদীপে তেল জোগাতে হবে। নইলে আজ আমি কিছুতেই শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে আসতুমনা।

ইংরেজিসোপান ও সহজপাঠ যাতে অতি শীঘ্র ছাপানো হয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয় সেজন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরো। ইংরেজিসোপান প্রথমভাগখানা ছাপা শেষ হতে দেরি হওয়া উচিত নয়— অবিলম্বে হাতে নিয়ো। কত কপি ছাপা কর্ত্তব্য তার পরামর্শ কর্ম্মসচিবের কাছ থেকে নেওয়া দরকার। সহজপাঠের ছবিগুলি শেষ হতে আশা করি দেরি হবেনা।

ম— সম্বন্ধে আমার মনে একটা সঙ্কোচ রয়ে গেছে। তাঁর কাছে কিছুমাত্র ত্যাগের দাবি আমি করতে পারিনে। তাঁকে যেন অনুরোধের পীড়নে বাধ্য করা না হয়। আমাকে তিনি জানেননা আমার কাজকেও অল্পই জানেন— উৎসাহপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করবেন তার কোনো হেতু নেই। সেটা যদি সহজ হত তবে আমার পক্ষে আনন্দের হত। কিন্তু কোনোদিনই হয়নি হঠাৎ আজই হবে এমন আশা আমি করবনা।

মঙ্গলবারে বম্বাই মেলে যাত্রা করব। যদি সোমবার, এমনকি মঙ্গলবার অপরাহ্নেও একবার আসো তবে যদি কিছু বলবার থাকে বলব।

আমার সব Lectureগুলো ও বাংলা ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ও Personality Creative Unity, Sadhana সঙ্গে এনো। বিশ্বভারতীর সদ্যঃপ্রকাশিত journalখানাও চাই, যার মধ্যে ক্ষিতিবাবুর বাউল আছে। ইতি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

একখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্ম চাই।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাল্মীকি ও কালিদাস

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

"পুরাণকবিক্ষুণ্ণে বর্ত্মনি দুরাপমস্পৃষ্টং বস্তু, ততশ্চ তদেব পরিসংস্কর্ত্তুং প্রযতেত"—
ইতি আচার্য্যাঃ। —রাজশেখর: কাব্যমীমাংসা, দ্বাদশ অধ্যায়।

১

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের স্থান যে সর্বোচ্চ—ইহা নির্বিবাদ। সংস্কৃত-সাহিত্যের যাঁহারা কিছুমাত্র রসাস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহারা কালিদাসের কাব্যের চিত্তোন্মাদী মাধুর্য কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ভারতীয় সাহিত্যের নন্দনকাননে কালিদাস পারিজাতপাদপের ন্যায়ই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সূক্তিমঞ্জরীর সৌরভ দূর দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছে। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তাঁহার 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন—

"অমৃতেনেব সংসিক্তাশ্চন্দনেনেব চর্চিতাঃ।
চন্দ্রাংশুভিরিবোদ্‌ঘৃষ্টাঃ কালিদাসস্য সূক্তয়ঃ॥"

"কালিদাসের সূক্তিসমূহ যেন অমৃতরসের দ্বারা সিক্ত, চন্দনরসের দ্বারা অনুলিপ্ত, এবং চন্দ্রকিরণের দ্বারা উদ্‌ঘৃষ্ট!"

আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্যগণও কালিদাসকে ব্যাস ও বাল্মীকির সমান আসন দান করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। মহাভারতের কিংবা রামায়ণের বিশালতা কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দৃষ্টিগোচর না হইলেও যে শব্দার্থসম্পদ্, কল্পনার নিরঙ্কুশ বিহার, ভারতের চিরন্তন আদর্শের প্রতি যে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার বিস্ময়কর সমন্বয় কালিদাসের কাব্যে ঘটিয়াছে, তাহা রামায়ণ কিংবা মহাভারতের স্রষ্টার পক্ষেও অগৌরবের নহে। তাই সহৃদয়-শিরোমণি আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে।"

"যে প্রতিভাবিশেষের স্ফুরণের ফলে, অতিবিচিত্রকবিপরম্পরাপ্রবাহী এই সংসারে কালিদাস প্রভৃতি দুই-তিনজন অথবা পাঁচ-ছয়জন পুরুষই কেবল মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।"[১]

কিন্তু কালিদাসের এই শব্দার্থনির্বাচন বিষয়ে মার্জিত শালীনতাবোধ কোথা হইতে আসিল? ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের মত মহাকবির আবির্ভাব সত্যই সাধারণ পাঠকের নিকট পরম বিস্ময়কর ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হইবে—ইহা যেন পূর্বাপরসংগতিশূন্য একটি আকস্মিক সংঘটন! আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের বিশাল বিরলপ্রচার প্রান্তরে কালিদাস

১ ধ্বন্যালোক, বৃত্তি পৃ. ৯৩, কাশী সংস্করণ

যেন অভ্রংলিহ বনস্পতির মতই একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে ঋষিকবিদ্বয়ের কাব্যপ্রবাহ কোন্ অনাদিকাল হইতে ভারতীয় জনসাধারণের মানসভূমিকে আপন পীযূষধারায় প্লাবিত ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, একমাত্র কালিদাসই যেন তাহা হইতে জীবনরস সংগ্রহ করিয়া আপনার কাব্যবনস্পতিকে নিয়ত অভিষিক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। কালিদাস কোন্ ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জানি না। তিনি কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন—তাহা আজও পর্যন্ত গবেষণার বিষয়ই রহিয়া গিয়াছে। তথাপি, রামায়ণ-মহাভারতরূপী মহাকাব্যদ্বয়ের রচনাকাল ও কালিদাসের আবির্ভাবকাল—এই উভয়সীমার মধ্যবর্তী কালখণ্ড ব্যাপিয়া প্রাচীন ভারতে কতদূর সাহিত্যিক বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার ফলে অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত দৃশ্যকাব্য ও রঘুবংশ-কুমারসম্ভব-মেঘদূতের মতো শ্রব্যকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব হইল—এই প্রশ্ন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসানুসন্ধিৎসুর চিত্তে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে একজায়গায় বলিয়াছেন, "আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি।"[২] কিন্তু সত্যই কি তাই? বঙ্গসাহিত্যের সঙ্কীর্ণ শাদ্বলাচ্ছন্ন সাহিত্যভূমিতে মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক প্রতিভার আবির্ভাব আপাতদৃষ্টিতে যতই খামখেয়ালী ও কার্যকারণশৃঙ্খলাবহির্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে যেমন সেই আপাত-আকস্মিকতার মধ্যেও নিগূঢ় কার্যকারণতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারা যায়, সেইরূপ কালিদাসের সাহিত্যিক প্রতিভার বিস্ময়কর নিঃসঙ্গত্ব ও অলৌকিকতা দুর্ভেদ্য কার্যকারণশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। বৌদ্ধদর্শনের "প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব" (theory of dependent origination) দৃশ্য জড়জগতের ক্ষেত্রে যেমন, সেইরূপ মনোজগতের পক্ষেও তুল্যভাবেই প্রযোজ্য। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রমই থাকিতে পারে না। কালিদাসের কবিপ্রতিভার উপর তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিক পরিবেশের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত কার্যকর হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি পূর্বকবিগণের কল্পনা যে, অতিস্বল্প-পরিমাণে হইলেও, কালিদাসের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও ক্রমবিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। অন্যথা সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের মূল তত্ত্বই ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই স্বীকৃতির দ্বারা কালিদাসের প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র লাঘব প্রদর্শন করা হয় বলিয়া মনে করা ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধিরই পরিচায়ক। এইরূপ অন্ধভক্তির দ্বারা মহাকবির প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শিত হইয়া থাকে বলিয়া আমি মনে করি না। কালিদাসের মহাকবিত্ব কতটুকু তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভার দান, আর কতটুকুই বা পূর্বকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে সমাহৃত ও সংস্কৃত—ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানিবার চেষ্টা করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত কালিদাসের অলোকসামান্য সৃষ্টিশক্তির যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি ইহা বুঝি যে পূর্বকবিগণের প্রতি কালিদাসের ঋণ স্বীকার করিতে, কালিদাসের এই অধমর্ণত্বের কথা চিন্তামাত্র করিতেও বহু সংস্কৃতসাহিত্যরসিক সহৃদয়ের চিত্ত বিমুখ হইবে, কুণ্ঠিত হইবে, ব্যথিত হইবে। তথাপি এই "বিবেকজ্ঞানে"র পর কালিদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে যে সাদর সম্ভ্রমবোধ আমাদের চিত্তে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই হইবে মহাকবির শিল্পপ্রতিভার প্রতি প্রকৃত সম্মানের প্রতীক।

২ সাহিত্যের স্বরূপ, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', পৃ. ৬০

কালিদাস তাঁহার 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটিকার প্রস্তাবনায় তাঁহার পূর্বগামী প্রথিতযশাঃ কবিত্রয়ের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়াছেন।—তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বর্তমানে প্রত্যেক সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগীর নিকটই সুপরিচিত। 'ভাসকবি'র কথা আমরা বহুদিন যাবৎ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু 'ভাসনাটকচক্রে'র আকস্মিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতসাহিত্যগগনের একটি অস্তোন্মুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পুনরায় উদিত হইয়াছে। সৌমিল্ল এবং কবিপুত্র নামক অপর দুইজন কবির সাহিত্যিক প্রতিভার সম্বন্ধে আজও আমরা অতি অল্পই অবগত আছি। তথাপি একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে, উদীয়মান "বর্তমান কবি" কালিদাস যে কবিদ্বয়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা, অধুনা বিস্মৃত হইলেও, প্রতিভাশালী কাব্যস্রষ্টা ছিলেন। এই তিনজন ছাড়াও, কালিদাসের পূর্বে "কবিগ্রাম" যে অন্যান্য কবিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল, ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না। অনেকে বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষকে কালিদাসের পূর্বগামী বলিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের আবির্ভাবকালের নিঃসন্দিগ্ধ কোনও সাক্ষ্যের অভাবে তাঁহাদের এই যুক্তিকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে অনেকেই স্বীকৃত হইবেন না।

যাহাই হউক, কালিদাস এই সকল পূর্বগামী কবিগণের কাব্য নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছিলেন—একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, যেমন সত্যের অপলাপ করা হইবে রবীন্দ্রনাথ, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণের রচনার সহিত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ছিলেন বলিলে। যদিও মহাকবিগণের সহজ প্রতিভাই সমস্ত কাব্যনির্মাণের মূলে, তথাপি সেই প্রতিভার উদ্ভাসন, সংস্কার ও উৎকর্ষের জন্য পূর্ব কবিগণের রচিত কাব্যের অনুশীলন অপেক্ষিত,—ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন।[৩] ইহা কোনও অগৌরবের কথা নয়। 'সহজ প্রতিভা'র সহিত বুদ্ধিমত্তা, কাব্যানুশীলন, ও বহুশ্রুততা বা ব্যুৎপত্তির একত্র সমবায় হইলেই কবিকর্ম চরম উৎকর্ষ লাভ করে—ইহা নির্বিবাদ।[৪] সেইজন্যই 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মটভট্ট 'কাব্যহেতু'র মধ্যে ব্যুৎপত্তি বা নৈপুণ্য এবং কাব্যজ্ঞশিক্ষাজনিত অভ্যাস এই কারণদ্বয়কেও শক্তি বা নৈসর্গিক প্রতিভার সহিত সমান আসন দান করিয়াছেন। এই জন্যই প্রাচীন ভারতে কবিযশঃপ্রার্থিগণের শিক্ষার জন্য 'কবিচর্যা' নামে একটি পৃথক্ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং কালিদাসও সে পূর্বকবিগণের নিবন্ধসমূহ অনুশীলন করিয়া তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। বিশেষতঃ রামায়ণ

৩ রাজশেখর 'প্রতিভা'র দুইটি প্রধান ভেদ দেখাইয়া—(কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী), প্রথম জাতীয় 'প্রতিভা'র অর্থাৎ কারয়িত্রী প্রতিভার আবার তিনটি অবান্তর ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন—যথা, সহজা, আহার্যা ও ঔপদেশিকী। ইহার মধ্যে 'সহজ' প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"ঐহিকেন কিয়তাপি সংস্কারেণ প্রথমাং তাং সহজেতি ব্যপদিশন্তি।" —সুতরাং 'সহজ-প্রতিভা'সম্পন্ন কবির পক্ষেও যে কাব্যানুশীলনজনিত সংস্কার প্রয়োজন, ইহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন।—কাব্যমীমাংসা, পৃ ১২

৪ 'উৎকর্ষঃ শ্রেয়ান্' ইতি যাযাবরীয়ঃ। স চানেকগুণসন্নিপাতে ভবতি। কিঞ্চ—"বুদ্ধিমত্ত্বং চ কাব্যাঙ্গবিদ্যাস্বভ্যাস-কর্ম চ। কবেশ্চোপনিষচ্ছক্তিস্ত্রয়মেকত্র দুর্লভম্॥ কাব্যকাব্যাঙ্গবিদ্যাসু কৃতাভ্যাসস্য ধীমতঃ। মন্ত্রানুষ্ঠাননিষ্ঠস্য নেদিষ্ঠা কবিরাজতা॥"—কা, মী, পৃ ১৩

পুনশ্চ—'প্রতিভাব্যুৎপত্তী মিথঃ সমবেতে শ্রেয়স্যৌ' ইতি যাযাবরীয়ঃ। ন খলু লাবণ্যলাভাদৃতে রূপসম্পদ্ ঋতে রূপসম্পদো বা লাবণ্যলব্ধির্মহতে সৌন্দর্য্যায়।'— ঐ, পৃ ১৬

ও মহাভারত—ভারতের চিরন্তন আদর্শ ও সাধনার বাঙ্‌ময় প্রতীকস্বরূপ—এই মহাকাব্যদ্বয় ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের কবিত্ব ও কল্পনাকে চিরকাল উজ্জীবিত করিয়া আসিয়াছে। এই মহাকাব্যদ্বয়ই ছিল সকল কবির উপজীব্য।[৫] ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, মুরারি, রাজশেখর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি প্রথিত-যশা কবিগণ এই মহাকাব্যদ্বয়ের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই তাঁহাদের কাব্য ও নাট্যের উপাখ্যান-ভাগ সংকলন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের কবিত্বের পক্ষে কোনও গর্হাসূচক নহে। সকল দেশেই এই প্রথাই চলিত আছে। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যসমূহের আখ্যানভাগও প্রায় সকল স্থলেই প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী অথবা ঐতিহাসিক নিবন্ধ হইতেই সংগৃহীত। অলংকারশাস্ত্রেও এই প্রথাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের মতে রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি মহাকাব্যই সকল কাব্য এবং নাট্যের 'কথাশ্রয়'। সুতরাং কালিদাসও তাঁহার কাব্যবস্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণকথা হইতেই আহরণ করিয়াছিলেন। 'রঘুবংশে'র বিষয়বস্তু যে স্পষ্টতই 'রামায়ণ' হইতে আহৃত, তাহা মহাকাব্যের নামকরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু 'মেঘদূত' নামক খণ্ডকাব্য, যাহা কালিদাসের কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া জগতের সহৃদয়-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাও রামায়ণের কল্পনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ইহা রামায়ণ মহাকাব্য যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও কালিদাস তাঁহার শব্দসম্পদ্, উপমাসম্ভার ও কল্পনাভঙ্গীর জন্য মহাকবি বাল্মীকির শ্লোকোচ্ছ্বাসের নিকট কতদূর পর্যন্ত ঋণী ছিলেন, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজ আমরা শব্দসৌষ্ঠব, উপমাবিন্যাসের অলোকসামান্য মনোহারিতা এবং কল্পনার বিচিত্র লীলার জন্য কালিদাসের স্তুতিগীতিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছি। সেই স্তুতির কতটুকু অংশ মহাকবির প্রাপ্য আর কতটুকুই বা আদিকবি রত্নাকরের শিল্পপ্রতিভার প্রতি প্রযোজ্য, তাহার যথাযোগ্য বিচার এপর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা কালিদাসকে পাইয়া যেন বাল্মীকিকে ভুলিয়াছি, ফলের আস্বাদ পাইয়া বীজকে বিস্মৃত হইয়াছি, প্রবাহের বিচিত্র শোভায় মুগ্ধ হইয়া গহনগিরিকন্দরবর্তী উৎসের সন্ধান হইতে বিমুখ হইয়াছি। কিন্তু কালিদাস তাঁহার বিশ্ববরেণ্য পূর্বসূরির নিকট আপনার সাহিত্যিক ঋণ স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন :

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"[৬]

আবার, 'রঘুবংশে'র পঞ্চদশ সর্গে কুশলব কর্তৃক রামায়ণগানের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি বলিয়াছেন :

"বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিস্তৌ কিন্নরস্বনৌ।
কিং তদ্‌যেন মনো হর্তুমলং স্যাতাং ন শৃণ্বতাম্॥"— ১৫.৬৪

---

৫ কবি গোবর্ধন তাঁহার 'আর্যাসপ্তশতী' শীর্ষক কোষকাব্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং অধুনালুপ্ত 'বৃহৎকথা' শীর্ষক কথাকাব্যের বিষয়ে সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন :

"শ্রীরামায়ণ-ভারত-বৃহৎকথানাং কবীন্ নমস্কুর্মঃ।
ত্রিস্রোতা ইব সরসা সরস্বতী স্ফুরতি যৈর্ভিন্না॥"—৩৪

৬ রঘুবংশ ১ম সর্গ, ৪ শ্লোক। মল্লিনাথ : "পূর্বৈঃ সূরিভিঃ কবিভির্বাল্মীক্যাদিভিঃ কৃতবাগ্দ্বারে কৃতং রামায়ণাদি-প্রবন্ধরূপা যা বাক্ সৈব দ্বারং প্রবেশো যস্য তস্মিন্।"

সুতরাং কালিদাস তাঁহার শব্দসৌষ্ঠব, উপমানির্বাচন এবং কল্পনাবিলাসের জন্য প্রাচেতসকবির নিকট কতদূর ঋণী ছিলেন, তাহা যে সূক্ষ্মবিচারের যোগ্য, ইহাতে কিছুমাত্র বৈমত্য থাকিতে পারে না।

২

আমরা প্রথমে কালিদাসের উপমাসম্ভারের বিষয়েই আলোচনা করিব। উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্যই কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুলপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। "উপমা কালিদাসস্য"—ইহা একটি প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার কাব্য বা নাট্যের যে কোনও শ্লোক আলোচনা করা যাউক না কেন, তাহাতে উপমার অন্তর্নিগূঢ় সুষমা আমাদের চিত্তকে প্রলোভিত করিবেই। কিন্তু এই সকল উপমা নির্বাচনের জন্য কি মহাকবির কোনও প্রযত্ন আবশ্যক হইয়াছিল? আদৌ নহে। কালিদাসের উপমার সহিত, পরবর্তী যে কোনও খ্যাতনামা মহাকবি—ভারবি, মাঘ, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য হইতে উপমা নির্বাচন করিয়া, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে ইহা সহজেই প্রমাণিত হইবে। মহাকবি কালিদাসের উপমানির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ! ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, মানবের অন্তর্গূঢ় বাসনালোক, এই দৃশ্যমান বিপুল বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টি, মহাকবির 'নিষ্প্রতিঘ' প্রাতিভদর্শনের সম্মুখে যেন আবেগভরে, আগ্রহাতিশয্যবশতঃ নিজ নিজ সৌন্দর্য ও মাধুর্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিল! সহৃদয়চক্রবর্তী আনন্দবর্ধনাচার্য্যের ভাষায় আমরা বলিতে পারি—"অলঙ্কারান্তরাণি তু নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।"— অলঙ্কারসমূহ যেন কবির লেখনীর অগ্রে সজ্যবদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্যাকুলস্বরে প্রার্থনা করিয়াছে— "আমাকে অগ্রে নির্বাচন করো, আমাকে অগ্রে!"[৭] মহাকবি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের বর্ণনা করিতে গিয়া যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন না। নীল-ধবল প্রবাহদ্বয়ের পবিত্র সঙ্গম দেখিয়া কখনও নীলকাদম্বপংক্তিবিমিশ্রিত মানসোৎসুক শুভ্র বলাকার দৃশ্য তাঁহার মনে পড়িতেছে, কখনও কালাগুরু-বিন্দুলাঞ্ছিত শুভ্রচন্দনদ্রববিরচিত শৃঙ্গাররচনার সৌন্দর্য তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা নিশীথে নিবিড় আরণ্যভূমিতে বিকীর্ণ গহনচ্ছায়াশবলিত জ্যোৎস্নার চিত্তোন্মাদী সৌন্দর্য তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্গত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই মহাদেবের বিভূতিভূষিত ভুজগবলয়মণ্ডিত দেহসুষমা তাঁহার রসবিহ্বল চিত্তে সহসা উদিত হইয়া সমগ্র বর্ণনার মধ্যে একটি অলৌকিক ভক্তিরসের সঞ্চার করিতেছে! উপমার পর উপমা—সহজ সুন্দর, অযত্ন বিহিত, প্রতিভার নৈসর্গিক শক্তির দ্বারা সমুল্লসিত![৮] ইহাই "সুকুমারমার্গে"র কবিপ্রতিভা, যাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কাশ্মীরক আলঙ্কারিক কুন্তকাচার্য তাঁহার "বক্রোক্তিজীবিত" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"অম্লানপ্রতিভোদ্ভিন্ননবশব্দার্থবন্ধুরঃ।
অযত্নবিহিতস্বল্পমনোহারিবিভূষণঃ॥

---

৭ তুলনীয়: "মতিদর্পণে কবীনাং বিশ্বং প্রতিফলতি। কথং নু বয়ং দৃশ্যামহে—ইতি মহাত্মনামহংপূর্বিকয়ৈব শব্দার্থাঃ পুরো ধাবন্তি।"—কাব্যমীমাংসা, ১২শ অধ্যায়, পৃ ৬২.

৮ তুলনীয়: "কচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ কচিৎ।
কচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড্মলৈঃ॥"— কিষ্কিন্ধ্যা, ২৭, ২২

ভাবস্বভাবপ্রাধান্যন্যকৃকৃতাহার্য্যকৌশলঃ।
রসাদিপরমার্থজ্ঞমনঃসংবাদসুন্দরঃ॥
অবিভাবিতসংস্থানরামণীয়করঞ্জকঃ।
বিধিবৈদগ্ধ্যনিষ্পন্ননির্ম্মাণাতিশয়োপমঃ॥
যৎকিঞ্চনাপি বৈচিত্র্যং তৎসর্বং প্রতিভোদ্ভবম্।
সৌকুমার্য্যপরিস্পন্দস্যন্দি যত্র বিরাজতে॥
সুকুমারাভিধঃ সোঽয়ং যেন সৎকবয়ো গতাঃ।
মার্গেণোৎফুল্লকুসুমকাননেনেব ষট্পদাঃ॥"[৯]

কিন্তু কালিদাসের উপমার এই অসীমতা ও চিরনবীনতা সত্ত্বেও, বহুক্ষেত্রে মহর্ষি বাল্মীকির সারস্বতনিঃষ্যন্দই যে তাঁহার আকরস্বরূপ ইহা অস্বীকার করা চলে না। উভয়ের মধ্যে পরস্পর এই ঘনিষ্ঠসাদৃশ্যকে প্রতিভার স্বাভাবিক সংবাদ (correspondence)-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া দুষ্কর। দুঃখের বিষয় মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ সূরি, যিনি কালিদাসের "মূর্চ্ছিত ভারতী"কে স্বকীয় 'সঞ্জীবনী' ধারায় পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তিনি এই বিষয়ে কোনও আলোকপাত করেন নাই, করিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্বগামী প্রথিতযশা টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তাঁহাদের 'মেঘসন্দেশের' টীকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের উপমার সহিত শ্রীরামায়ণের কল্পনাসাদৃশ্য শ্লোক উদ্ধার পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং রামায়ণই যে মহাকবির উপজীব্য তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে উক্ত টীকাকারদ্বয়ের কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(১) 'মেঘদূতে'র 'উত্তরমেঘ' খণ্ডে বিরহিণী প্রিয়তমার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥—" ২.১৬

"রামায়ণে" বিরহিণী সীতাদেবীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই—

"হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না॥"

দক্ষিণাবর্তনাথ তাঁহার টীকায় রামায়ণের এই শ্লোকটির অন্ত্যচরণ উদ্ধার করিয়া উহাই যে মেঘদূতের শ্লোকের উপজীব্য তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে

৯ ১ম উন্মেষ, শ্লো ২৫-২৯। দ্রষ্টব্যঃ "এবং সহজসৌকুমার্য্যসুভগানি কালিদাস-সর্বসেনাদীনাং কাব্যানি দৃশ্যন্তে। তত্র সুকুমারমার্গস্বরূপং চর্চনীয়ম্।"—ঐ. বৃত্তি. পৃঃ ৭১।

১০ সুন্দরঃ ১৬.৩০ অস্যার্থস্য মূলম্—"সহচররহিতেব চক্রবাকী—" ইতি শ্রীরামায়ণবচনম্। অনেন শ্রীরামায়ণ-বচনার্থানুসারেণ কবেঃ পূর্বোক্তো রামকথাভিলাষঃ স্পষ্টঃ॥"

রামায়ণশ্লোকের দুইটি উপমাই কালিদাস একই শ্লোকে সন্নিবেশ করিয়াছেন, শুধু ছন্দোব্যত্যাসের সাহায্যে তাহাতে নবীনতা সঞ্চার করিয়াছেন মাত্র। রামায়ণশ্লোকের ত্বরিতগতি 'পুষ্পিতাগ্রা' মহাকবি কালিদাসের হস্তে মন্থরগতি 'মন্দাক্রান্তা'রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই যাযাবরকবি রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'য় শব্দার্থাহরণের 'ছন্দোবিনিময়' নামক প্রভেদরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[১১]

(২) যক্ষ মেঘসন্দর্শনোৎসুক প্রিয়ার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত স্পন্দমান নেত্রতারকাকে মীনপক্ষাহত বেপমান কুবলয়কুণ্ডলের সহিত তুলনা দিয়াছে—

"রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥"—২. ২৭

উপমাটি যে রামায়ণ হইতেই আহৃত তাহা উভয় টীকাকারই আকরনির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। দক্ষিণাবর্তনাথ বলিতেছেন—

"স্ত্রীণাং বামাক্ষিস্পন্দনং এতন্নিমিত্তমিতি শ্রীরামায়ণে দর্শিতম্—
"তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্মরাজীবৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং মৃগাক্ষ্যা মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্॥" ইতি[১২]
—সুন্দর ২৯. ২

(৩) মেঘদূতে যক্ষ বলিতেছে 'হে প্রিয়ে! হিমগিরিশিখরবর্তী অলকানগরীর দেবদারুক্ষীরসুরভি শিশিরবায়ু আমি ঔৎসুক্যভরে আলিঙ্গন করি, কারণ হয়ত' তোমার কোমল অঙ্গের সম্পর্ক লাভ করিয়া তাহা ধন্য হইয়া থাকিবে!"—

"ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি! ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বংস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥"—২. ৪০

ইহা যে রামায়ণের বিরহখিন্ন রামচন্দ্রের উক্তিরই প্রতিধ্বনি তাহা দক্ষিণাবর্তনাথ এবং পূর্ণসরস্বতী[১৩] উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছেন। রামায়ণের শ্লোকটি নিম্নরূপ—

মেঘদূতের সহৃদয় টীকাকার পূর্ণসরস্বতীও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—"রামায়ণ-রসায়ন-পরায়ণেন চ কবীন্দ্রেণ তদর্থচমৎকারপরতয়া তদর্থচ্ছায়াযোনিরর্থোঽস্মিন্ পদ্যে নিবেশিতঃ। স যথা—'হিমহতনলিনীব—' ইতি।" পৃ. ১২৬ (শ্রীবাণীবিলাস প্রেস।)

পুনশ্চ "অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে।"—সুন্দর ৫৯.২৮; "অধঃশয্যা—হিমাগমে"—সুন্দরঃ ৬৫.১৫

১১ "ছন্দসা পরিবৃত্তিশ্ছন্দোবিনিময়ঃ।"—ঐ. পৃ ৬৭

১২ টীকাকার পূর্ণসরস্বতীও সেই একই মন্তব্য করিয়াছেন। যথা—অস্যচ্ছায়াযোনিশ্চায়মর্থঃ। "প্রাস্পন্দতৈকং নয়নম্—" ইতি শ্রীরামায়ণোক্তেঃ—ঐ. পৃ ১৪১।

১৩ অয়ং চ শ্রীরামায়ণশ্লোকচ্ছায়াযোনিঃ শ্লোকঃ।—ঐ. পৃ ১৬০

"বাহি বাত ! যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥"

দুর্ভাগ্যবশতঃ দক্ষিণাবর্তনাথ এবং পূর্ণসরস্বতী, এই উভয় টীকাকারের 'মেঘদূত' ভিন্ন কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের উপর রচিত কোনও টীকা আজও পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যদিও উভয়েই কালিদাসের কাব্যত্রয়ের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে। নতুবা অন্যান্য বহুস্থলেও আমরা কালিদাসের কবিকল্পনার আকরের সন্ধান পাইতাম। কিন্তু পূর্বোক্ত টীকাকারদ্বয়ের প্রদর্শিত শৈলী অবলম্বন করিয়া যখন ঔৎসুক্যভরে রামায়ণী কথা আদ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন কালিদাসের বর্ণনার সহিত রামায়ণীয় বর্ণনার এমন ঘনিষ্ঠ সাম্য আমার দৃষ্টিতে পড়িতে লাগিল, যে সত্যই মহর্ষি বাল্মীকির নিকট কালিদাসের ঋণ পর্যালোচনা করিয়া আমি বিস্ময়বিহ্বল হইয়া গেলাম। সাধারণ পাঠকসমাজ যে সকল উপমাকে আজও পর্যন্ত কালিদাসের কবিপ্রতিভার অনন্যসাধারণ স্ফুর্তি বলিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে রামায়ণের অফুরন্ত কাব্যভাণ্ডার হইতে সমাহৃত, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। আমি নিম্নে সেইজাতীয় কয়েকটি উপমা পাশাপাশি উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

(১) তাড়কাবধের পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিছনে পিছনে রাম ও লক্ষ্মণ চলিয়াছেন, রাজর্ষি জনকের রাজধানী বিদেহনগরীর অধিবাসিগণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া বিস্মিতলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাবিতেছে—বুঝি বা পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয় স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিয়া আসিল !—

"তৌ বিদেহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্ব্বসূ ।
মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ॥"—রঘু ১১. ৩৬

রামায়ণে, যখন বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণসমভিব্যাহারে বামনাশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে পুনর্বসুনক্ষত্রদ্বয়সমন্বিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সে-শ্লোকটি এইরূপ—

"প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ।
শশীব গতনীহারঃ পুনর্ব্বসুসমন্বিতঃ ॥"—আদি ২৯. ২৫-২৬

কালিদাস বিশ্বামিত্রের পক্ষে উপমাটুকু বাদ দিয়া শুধু রামলক্ষ্মণকে পুনর্বসুদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এবং প্রকরণটির ব্যত্যয় সাধন করিয়াছেন মাত্র।[১৪]

(২) অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত রামচন্দ্র যখন মহর্ষি জাবালির আশ্রমপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহর্ষি তাঁহাকে সেই নির্বাসনদুঃখ ত্যাগকরতঃ রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। মহর্ষি রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

"সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয় ।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥"—অযোধ্যা ১০৮. ৮

---

১৪ ইহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কালিদাস তাঁহার কাব্য বা নাট্যের আর কোনও স্থলে দ্বিতীয়বার এই উপমাটি প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের উপমাসূচী বিষয়ে বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত K. Chelleppan Pillai কর্তৃক সংকলিত *Similes of Kalidasa* শীর্ষক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

"তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যান্তে রাজপদে অভিষিক্ত হও, বিরহিণীর ন্যায় একবেণীধরা নগরী তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।"

রঘুবংশে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র নির্বাসনের পর অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আজ অযোধ্যা উৎসবপূর্ণা। চতুর্দিকে হর্ম্যশিখর হইতে কালাগুরুধূমলেখা আকাশে উত্থিত হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন আজ বিরহদুঃখের অবসানে অনাথা অযোধ্যানগরী রাঘবহস্তমুক্ত আপন কৃষ্ণবেণী পুনর্বার প্রসাধনের জন্য এলাইয়া দিয়াছে—

"প্রাসাদকালাগুরুধূমরাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে॥"—রঘু ১৪. ১২

মহাকবি কালিদাস রামায়ণের সূক্ষ্ম সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন!

(৩) রামায়ণে, হেমন্ত ঋতুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন:

"সেবমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥"—আরণ্য ১৬. ৮

মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে মহাদেবের সমাধি-প্রস্থে অকালবসন্তের আবির্ভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিঃশ্বাসমিবোৎসসর্জ॥"—কুমার ৩. ২৫

ইহা কি রামায়ণেরই প্রতিবিম্ব নহে?

(৪) রামচন্দ্র সীতার সহিত বিজন অরণ্যভূমিতে পর্ণশালার মধ্যে আসীন রহিয়াছেন, মনে হইতেছে যেন চন্দ্রমাঃ চিত্রা তারকার সহিত সংগত হইয়া শোভা পাইতেছেন—

"স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া।
বিবরাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব॥"—আরণ্য ১৭.৩-৪

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে রামায়ণের এই উপমাটি গ্রহণ করিয়াছেন[১৫]—যখন মহারাজ দিলীপ পত্নী-সুদক্ষিণাসমভিব্যাহারে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমপদে প্রবেশ করিতেছেন—

"কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রা-চন্দ্রমসোরিব॥"—রঘু ১. ৪৬

(৫) রামায়ণে, লক্ষ্মণকর্তৃক খড়্গ দ্বারা বিরূপীকৃতা শূর্পণখাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ রাবণ বলিতেছে—

"কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্।
তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া॥"—আরণ্য ২৯.৩ [১৬]

রঘুবংশের একাদশসর্গে রামচন্দ্রের বিক্রম-শ্রবণে জ্বলিতমন্যু ভার্গবের উক্তিতে কি আমরা রামায়ণের উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই না?—

১৫ মাত্র একটিবারের জন্য। দ্রষ্টব্য: *Similes of Kalidasa.*

১৬ পুনশ্চ "উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো দণ্ডাহত ইবোরগঃ।"—লঙ্কা ৫৪.৩৩;
"সর্পং সুপ্তমহো বুদ্ধা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি।"—লঙ্কাঃ ৬৪.১৪

"ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্ রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ॥"—রঘু ১১.৭১

(৬) রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাক্ষসশরীরসমূহের দ্বারা পরিকীর্ণ পৃথিবীকে যেন কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রামায়ণে দেখি—

"তৈর্মুক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
বিস্তীর্ণা বসুধা কৃৎস্না মহাবেদিঃ কুশৈরিব॥"—আরণ্য ২৬.৩৩

কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে সজাতীয় উপমার আশ্রয় লইয়াছেন।—

"ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব॥"—রঘু ৪.৬৩

উপমাদ্বয় অভিন্ন না হইলেও যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবাপন্ন—তাহা অবশ্যই স্বীকার্য।

(৭) অশোকবনে রাক্ষসীপরিবৃতা সীতাদেবীকে কালিদাস বিষবল্লীপরিবৃতা মহৌষধীর সহিত তুলনা দিয়াছেন—

"দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা।
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ॥"—রঘু ১২.৬১

'রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতান্বেষণতৎপর ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কণ্ঠগতপ্রাণ মুমূর্ষু জটায়ু বলিতেছেন—

"যামোষধীমিবায়ুষ্মন্! অন্বেষসি মহাবনে।
সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্॥"—আরণ্য ৬৭.১৫

রঘুবংশের উপমাটি যে রামায়ণ শ্লোকেরই ঈষৎ পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

(৮) বসন্তসমাগমে রামচন্দ্র সীতাবিরহে নিরতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, চারিদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজি তাঁহার বিরহদুঃখকে শতগুণে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্নকোশ পদ্মকোরকগুলিকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে সীতার আরক্তিম নয়নদ্বয়ের স্মৃতি উদিত হইতেছে।—

"পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ১.৭১

'রঘুবংশে'ও দেখি, পুষ্পকরথে উপবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আকাশমার্গ হইতে নিম্নদেশবর্তী বিভিন্ন জনপদের পরিচয় দিতেছেন, নানা পূর্বানুভূতির কথা সীতাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। একটি শ্লোকে তিনি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাদ্
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥"—রঘু ১৩.২৯

ইহা কি রামায়ণেরই প্রতিধ্বনি নহে?

(৯) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেই, রামচন্দ্র বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছেন, গিরিসানুদেশে লোধ্রদ্রুম পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে—

"লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশরপিঞ্জরাঃ।"—কিষ্কিন্ধ্যা ১.৭৬

কালিদাসের সুনিপুণ কবিদৃষ্টি রামায়ণের এই একটি মাত্র শ্লোকার্ধের মধ্যে যে চমৎকারিতা নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। তাই দেখি, মায়াসিংহ যখন পুত্রকাম মহারাজ দিলীপের বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর প্রতি ভক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার আকপিল পৃষ্ঠদেশে হঠাৎ আপন পিঞ্জরকেশরভার ছড়াইয়া উপবেশন করিল, তখন বিস্মিত মহারাজ দিলীপ দেখিলেন, যেন কোনও এক গিরির ধাতুময়ী অধিত্যকাভূমিতে এক প্রফুল্ল লোধ্রদ্রুম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!—

"স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্দ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥"—রঘু ২.২৯

কালিদাস রামায়ণের উপমাটির মধ্যে যেটুকু অনুক্ত অংশ ছিল, তাহা পূরণ করিয়া উপমাটিকে হেতুযুক্ত করিয়া তাহার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিয়াছেন।

(১০) বানররাজ বালি যখন সুগ্রীবকর্তৃক কপটযুদ্ধে আহূত হইয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রামচন্দ্রকর্তৃক তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল, তখন মুনিবেশধারী রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বালি বলিতেছে—

"স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥[১৭]—কিষ্কিন্ধ্যা ১৭.২২

"তুমি ধর্মধ্বজ, অধার্মিক, পাপসমাচার; তৃণাবৃত কূপের মত তুমি অবিশ্বসনীয়!"

মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজসভায় নরপতি দুষ্যন্তের প্রতি প্রত্যাখ্যানকুপিতা শকুন্তলার উক্তিতে রামায়ণের এই উপমাটি নিবেশ করিয়াছেন—

"অণজ্জ! অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুকপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্স তব অণুকিদং পড়িবজ্জিস্সদি"।—

মহাকবি কালিদাস শুধু রামায়ণের উপমাটিকে ভাষান্তরিত করিয়া তাহার মধ্যে কেমন এক অপূর্ব রমণীয়তার আধান করিয়াছেন![১৮]

(১১) বালির প্রাণত্যাগে শোকার্তা মহিষী তারা—

"জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং
মহাদ্রুমং ছিন্নমিবাশ্রিতা লতা॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ২২. ৩২

'কুমারসম্ভবের' রতিবিলাপেও আমরা ইহারই ছায়া দেখিতে পাই—

---

১৭ রামায়ণের আর এক স্থলে এই উপমাটি প্রযুক্ত হইয়াছে—

"সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ॥"—সুন্দর ৪৭.২০

১৮ মহাকবি রাজশেখরের মতে ইহা শব্দার্থাহরণের 'নটনেপথ্য' নামক প্রকারভেদ। তুলনীয়: "অন্যতমভাষা-নিবদ্ধং ভাষান্তরেণ পরিবর্ত্যতে ইতি নটনেপথ্যম্।"

"বিধিনা কৃতমর্ধবৈশসং ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥"—কুমার ৪. ৩১

(১২) বর্ষাকাল সমাগত, ঘনকৃষ্ণমেঘরাজি আকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, স্তরে স্তরে মেঘমালা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র এই দৃশ্য লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন—

"শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ ॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ২৮. ৪

'মেঘদূতে'র যক্ষসন্দেশেও দেখিতে পাই যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

"হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥"—পূর্বমেঘ ৬০

(১৩) সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বানরপতি সুগ্রীব রাবণকর্তৃক হ্রিয়মাণা সীতাদেবীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় ও আভরণ রামচন্দ্রকে যখন দেখাইলেন, তখন রামচন্দ্র—

"ততো গৃহীত্বা বাসস্তু শুভান্যাভরণানি চ।
অভবদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ৬. ১৬

'রঘুবংশে' দেখি, লক্ষ্মণ যখন সীতাদেবীকে বনভূমিতে রাখিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবীর সন্দেশবাণী নিবেদন করিতেছেন, তখন সেই করুণ বর্ণনারাজি শ্রবণ করিয়া—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥"—রঘু ১৪. ৮৪

কালিদাস রামায়ণের উপমাটি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু একটি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন মাত্র—"সহস্যচন্দ্রঃ", কেবল 'চন্দ্রমাঃ' নহে।

(১৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥" [১৯]—কিষ্কিন্ধ্যা ২৮. ১২

"এই নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়া আমার রাবণাঙ্কবর্তিনী তপস্বিনী সীতাকে মনে পড়িতেছে।"

'বিক্রমোর্বশী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীবিরহিত পুরূরবা উন্মত্তের মত চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, বিদ্যুৎপ্রভাকে দেখিয়া উর্বশী বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাঁহার ভ্রান্তি মিলাইয়া যাইতেছে—

---

১৯ পুনশ্চ "সূর্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্।
অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বিদ্যুদিবাম্বরে ॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ৫৮, ১৭

"নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন তস্য শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া ন মমোর্বশী ॥"

কালিদাস রামায়ণের উপমাটিকেই পরিবর্ধিত করিয়া 'নিশ্চয়'[২০] অলঙ্কারের আকারে পরিণত করিয়াছেন মাত্র।

(১৫) বর্ষাসমাগমে বনভূমি হরিদ্বর্ণ নবশাদ্বলরাজিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটসমূহ ক্রীড়া করিতেছে। রামচন্দ্র এই দৃশ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন ॥''—কিষ্কিন্ধ্যা ২৮.২৪[২১]

"যেন কোনও রমণীর শুকপ্রভ হরিদ্বর্ণ অলক্তকবিন্দুলাঞ্ছিত অংশুক শোভা পাইতেছে।"

কালিদাস 'বিক্রমোর্বশী'র চতুর্থ অঙ্কে রামায়ণের এই বর্ণনাটি হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে দেখি, বিরহোন্মত্ত পুরূরবা বলিতেছেন—

"(পরিক্রম্য অবলোক্য চ সহর্ষম্) উপলব্ধমুপলক্ষণং যেন
তস্যাঃ কোপনায়া মার্গোঽনুমীয়তে।
"হৃতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভি -
র্নিমগ্ননাভে-র্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং রুষা ভিন্নগতেরসংশয়ং
শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাংশুকম্ ॥
"(বিভাব্য) কথং, সেন্দ্র-গোপং নবশাদ্বলমিদম্।"—৪র্থ অঙ্ক. ৭

(১৬) সুগ্রীব যখন বিশাল বানর-অক্ষৌহিণী সীতান্বেষণের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা সমগ্র মেদিনীকে শলভকুলের মত ছাইয়া ফেলিল—

"তদুগ্রশাসনং ভর্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ।
শলভা ইব সঞ্ছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে ॥"[২২]—কিষ্কিন্ধ্যা ৪৫.২

"অভিজ্ঞানশকুন্তলে"ও এই উপমাটি দেখিতে পাই—

"তুরগখুরহতস্তথাহি রেণুর্বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥"—১ম অঙ্ক. ২৭

---

২০ "অস্যন্নিষিধ্য প্রকৃতস্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ"—সাহিত্যদর্পণ ১০. ৩৯

২১ পুনশ্চ "সশক্রগোপাকুলশাদ্বলানি…বনান্তরাণি"—কিষ্কিন্ধ্যা ২৮. ৪১

২২ অপিচ
"অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তত্র বানরসৈন্যানাং শলভানামিবোদ্গমঃ ॥"—লঙ্কা ৪১,৪৯

(১৭) হনূমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া অশোকবনে রাক্ষসীপরিবৃতা সীতাদেবীকে দেখিল, যেন—

"দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্।"—সুন্দর ১৫.১৯

'মেঘদূতে'র বিরহিণী যক্ষপত্নীও—

"প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।"

(১৮) হনূমান্ অশোকবনে সীতাদেবীকে সান্ত্বনা দিতেছে—

"পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি! মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে।
যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী॥
কথয়ন্তীব শশিনা সঙ্গমিষ্যসি রোহিণী।
মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তদাকাশং মহার্ণবম্॥"[২৩]—সুন্দর ৩৭. ২৬-৭

'শকুন্তলাতে'ও মারীচাশ্রমে উপনীত হইয়া মহারাজ দুষ্যন্ত 'নিয়মক্ষামমুখী' শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

"স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি!
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥"—(৭ম অঙ্ক.২২)

(১৯) লঙ্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হনূমান্ রামচন্দ্রের সমীপে সীতাদেবীর বিরহক্ষাম অবস্থার বর্ণনা দিতেছে—

"রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা।
মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা॥"[২৪]—সুন্দর ৫৯.২৩

মেঘদূতেও যক্ষপত্নীর বর্ণনায় ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা—
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি॥"—উত্তরমেঘ. ২৭

(২০) লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যাঃ পদ্মমিবাননম্।
ঈষদুন্নম্য পাস্যামি রসায়নমিবাতুরঃ॥"—লঙ্কা ৫.১৩

'শকুন্তলা'র তৃতীয় অঙ্কে মদনাতুর দুষ্যন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন—

"মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।
মুখমংসবিবর্ত্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু॥"—৩য় অঙ্ক. ২২

২৩ অপিচ 'ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী'—সুন্দর ৪০.৪৫ ; ৫৬.২০.

২৪ পুনশ্চ "শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ।
আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্॥"—সুন্দর ৬৬.১৩
"চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্।"—সুন্দর ১৭.২২

কালিদাস এখানে রামায়ণের উপমাটুকু বাদ দিয়া তাহার ভাবটুকু গ্রহণ করিয়াছেন।[২৫]

(২১) সুগ্রীবের আদেশে নল যখন বিশাল সেতু নির্মাণ করিল, তখন সেই সেতুকে দেখিয়া মনে হইল যেন সীমাহীন আকাশের মধ্যে 'স্বাতীপথ' (ছায়াপথ) শোভা পাইতেছে—

"স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে ॥[২৬]—লঙ্কা ২২.৭০

'রঘুবংশে'র একটি অতিপ্রসিদ্ধ উপমা যে রামায়ণের উদ্ধৃত শ্লোকটিই উপজীব্য করিয়া রচিত সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও লেশই থাকিতে পারে না। রামচন্দ্র যখন সীতাকে লইয়া পুষ্পকযানে আকাশ-মার্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, তখন বানরসেনাকৃত সেই সুদীর্ঘ সেতু দেখাইয়া বলিতেছেন—

"বৈদেহি! পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥"[২৭]—রঘু ১৩.২

(২২) রামচন্দ্র সুবল-গিরিশৃঙ্গে আরোহণকরতঃ গোপুরশৃঙ্গস্থ গাঢ়-রক্তাম্বরপরিবৃত ঘন-কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতেছেন—

"শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসসা।
সন্ধ্যাতপেন সংচ্ছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে ॥"—লঙ্কা ৪০. ৬

'মেঘদূতে' যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

"পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্তারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥"—পূর্বমেঘ ৩৮

আর কত দেখাইব? আমরা কালিদাসের উপমার অজস্রতা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু প্রাচেতসকবির "রামায়ণী কথা" উপমার 'রত্নাকর' বিশেষ। ঋষিকবি যাহাই বলিয়াছেন, তাহারই

---

২৫ রাজশেখরের মতে এই পদ্ধতিকে 'বিভূষণমোষ' বলা যাইতে পারে। দ্রষ্টব্য: "অলঙ্কৃতমনলঙ্কৃত্যাভিধীয়তে ইতি বিভূষণমোষঃ"।—কাব্যমীমাংসা পৃ. ৬৯

২৬ পুনশ্চ "অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।" — লঙ্কাঃ ২২. ৭৬। রামায়ণের আর এক স্থলে স্বাতীপথের সহিত এই উপমাটি দেখিতে পাই। হনুমান্ বলিতেছে: "লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপানাঞ্চ সর্বশঃ। অনুযাস্যতি মামদ্য প্লবমানং বিহায়সা। ভবিষ্যতি হি মে পন্থাঃ স্বাতেঃ পন্থা ইবাম্বরে ॥"—কিষ্কিন্ধ্যা ৬৭, ১৯-২০

২৭ রামায়ণের একস্থলে মহর্ষি বাল্মীকি একটি বিস্তৃত রূপকের সাহায্যে আকাশ এবং সমুদ্রের মধ্যে সাদৃশ্য সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সেই বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্বতঃ। ভুজঙ্গযক্ষগন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥ স চন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্। তিষ্যশ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্ ॥ পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্। ঐরাবতমহাদ্বীপম্ স্বাতীহংসবিলাসিতম্ ॥ বাতসঙ্ঘাতজালোর্মিচন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ। হনুমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্ ॥—সুন্দর ৫৭ ১-৪.

মধ্যে উপমার চারুত্ব নিহিত হইয়া রহিয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক হোমারের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মহর্ষি বাল্মীকি সম্বন্ধেও আমরা সেই কথাই বলিতে পারি :

"It seems as if he had but to open his mouth and speak, to create divine poetry; and it does not lessen our sense of his good fortune when, on looking a little closer, we see that this is really the result of an unerring and unfailing art, an extraordinarily skilful technique......It seems the art of one who walked through the world of things endowed with the senses of a god, and able, with that perfection of effort that looks as if it were effortless, to fashion his experience into incorruptible song; whether it be the dance of flies round a byre at milking time, or a forest-fire on the mountains at night."[২৮]

শুধু উপমাই নহে, কাব্যবস্তুর পরিকল্পনা, ভাব এবং বর্ণনার জন্যও কালিদাস যে তাঁহার পূর্বগামী ঋষিকবির নিকট কতখানি ঋণী তাহা আমরা পরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

২৮ *The Epic* : Lascelles Abercrombie. পৃ. ৭৪-৭৫
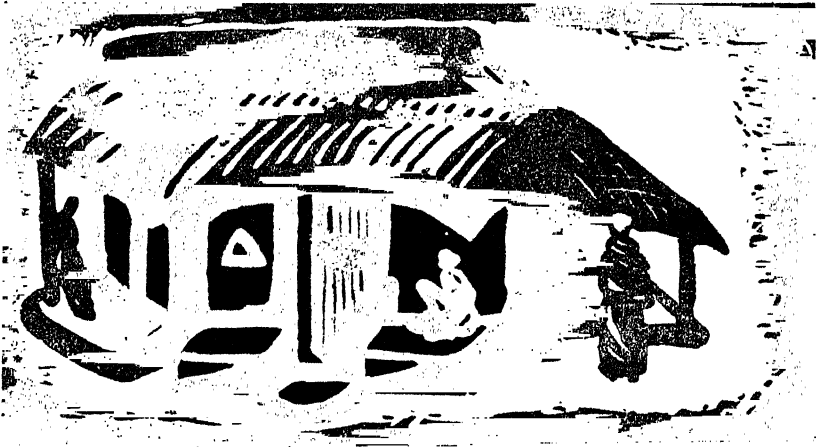
মরিস মেটারলিঙ্ক

১৮৬২ - ১৯৪৯

মরিস মেটারলিঙ্ক

১৮৬২ - ১৯৪৯

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১৮৬২ খৃস্টাব্দের ২৯শে অগস্ট বেলজিয়মের অন্তর্গত ঘেণ্ট (Ghent) শহরে মরিস মেটারলিঙ্কের জন্ম। তাঁর শৈশব ও যৌবন এই শহরের পরিবেষ্টনেই অতিবাহিত হয়। এই শহরের মধ্যযুগীয় পরিবেশ—প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ ও উচ্চমিনার, স্রোতহীন কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রণালী, মধ্যযুগীয় তোরণ-শ্রেণী, প্রাচীর বেষ্টিত সন্ন্যাসীদের মঠ, নিস্তব্ধ ম্লানান্ধকার গির্জা, বহু প্রাচীন জীর্ণ প্রাসাদশ্রেণী, নিরানন্দ হাসপাতাল—এবং বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ জলাভূমি, পাইন বনানীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরবতা, বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন রাজপথের জনকোলাহলহীন নিস্তব্ধ সৌন্দর্য, সামুদ্রিক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির ঘুমন্তভাব এবং অশ্রান্ত সমুদ্রকল্লোলের রহস্যময় ভাষা মেটারলিঙ্কের মানসজীবনের উপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মেটারলিঙ্কের সাত বৎসর কাটে জেস্যুইট পাদ্রী পরিচালিত সাঁবার্ব কলেজে। এখানকার সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্কীর্ণতা তাঁর স্কুলজীবনকে নিতান্ত নিরানন্দ শুষ্ক এবং কঠোর করে তুলেছিল, কারণ এখানকার কর্তৃপক্ষ শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা বিষবৎ অনিষ্টকর বলেই মনে করতেন। এখান-কার সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ শাসনের অত্যাচার স্মরণ করেই মেটারলিঙ্ক বলতেন যে যদি প্রথম জীবনকে ফিরে পেতে হলে সেই সঙ্গে স্কুলের সেই সাত বছরও ফিরে আসে তা হলে সেজীবনকে আমি চাই না। কিন্তু এই কলেজের দূষিত বাতাবরণ সত্ত্বেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এই কলেজেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লের্বের্গ ও গ্রেগোয়ার ল্যরয় নামক দুজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মেটারলিঙ্কেরই সহপাঠী ছিলেন।

মেটারলিঙ্কের যৌবনকালে বেলজিয়ান সাহিত্যের নবজাগৃতির কাল; নবজাগ্রত সাহিত্য তখন জাতির অন্তরে এক নূতন উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করতে আরম্ভ করেচে। মেটারলিঙ্ক ও তাঁর সহপাঠিরা এই সাহিত্যের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগস্থাপন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি পিতামাতার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি যখন আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে পারী নগরীতে আসেন তখন তিনি অল্পস্বল্প সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছেন বলা যায়। পারী আসার ফলে মেটারলিঙ্ক সেখানকার কয়েকজন সাহিত্যিকের সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে এঁরা লা প্লিয়াদ্ নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মেটারলিঙ্কের প্রথম রচনা *Massacre of the Innocents,* এবং অন্য প্রতীকপন্থী কবিতা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রতীকপন্থীদের প্রভাব মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ওপর গভীর রেখাপাত করে তা সকলেই জানেন।

মাস ছয় আইন শিক্ষার পর মেটারলিঙ্ক ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ঘেণ্টে ফিরে এসে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৮৮৯ খৃস্টাব্দেই তাঁর আইনজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে, সহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে মৌমাছিপালন, নৌকাবিহার, বাইসিকেল

ও মোটরভ্রমণ ইত্যাদি শারীরিক ব্যায়াম চর্চাও চলতে লাগল। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মেটারলিঙ্কের *La Princess Maleine* নাটক খানি প্রকাশিত হয় এবং প্রসিদ্ধ *Figaro* পত্রিকায় ফরাসী সমালোচক মেটারলিঙ্ককে 'বেলজিয়ান শেকসপীয়'র নামে সম্বর্ধিত করেন। ফলে অকস্মাৎ মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধে সারা ইউরোপ উৎসুক হয়ে উঠল। এর পর বছর পাঁচেকের মধ্যে *Intruder, The Sightless, Seven Princesses, Pelleas and Melisanda, Alladine and Palomides, Interior, Death of Tintagiles* এইসব নাটক প্রকাশিত হয়। এগুলির মাঝে রহস্যবোধের ফলে মানবচিত্তের ভীতিপূর্ণ অস্বস্তিই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে মেটারলিঙ্ক দেশত্যাগ করে পারী নগরীর অধিবাসী হন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নাটক, প্রবন্ধ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা-মূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে মেটারলিঙ্ক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মেটারলিঙ্ক পারীর জর্জেট লেঁব্লা নাম্নী একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধপুস্তক *Treasure of the Humble* বইখানি ১৮৯৫ সালে এবং *Wisdom and Destiny* বইখানি ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং এই দুখানি বইই লেব্লাঁকে উৎসর্গ করা হয়। শোনা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর মেটারলিঙ্কের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটে। এর কারণ অজ্ঞাত। মেটারলিঙ্কের বহুবিধ রচনার তালিকা দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুরাগী রহস্যবাদী মেটারলিঙ্কের অপূর্ব মনীষা বহু বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েচে। একদিকে যেমন তিনি মক্ষিকা পিপীলিকা উইপোকা এবং পুষ্প জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করেছেন, অন্য দিকে রহস্যবাদ অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদির গভীর অধ্যয়নেও তিনি তন্ময় হয়েছেন। তাছাড়া শেষজীবনে তিনি জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আপেক্ষিকবাদ নিয়েও গভীরভাবে আলোচনায় রত হয়েছেন। *Mountain Paths, Great Secret, Our Eternity, The Life of Space* ইত্যাদি পুস্তক পড়লে তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা আমাদের এতই মুগ্ধ করে যে তিনি যে আবার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপূর্ণ নাটকের রচয়িতা, একজন আশ্চর্য সূক্ষ্মানুভূতিপূর্ণ শিল্পী সে কথা কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। গভীর মননশীলতা ও সুন্দর কবিপ্রতিভার এমন সমাবেশ জগতের অল্প সাহিত্যিকের মধ্যেই দেখা যায়।

২

মেটারলিঙ্কের লেখার সর্বত্রই আমরা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ের প্রতি মর্মান্তিক আকর্ষণ দেখতে পাই। তাই অপরিসীম রহস্যবোধ মেটারলিঙ্কীয় অনুভূতির একটি বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের মতো মেটার-লিঙ্কের জীবনও দুটি পরস্পরবিরোধী পর্বে বিভক্ত; জীবনের প্রথম পর্বে ইনিও নিরাশাবাদী, জীবন এঁর কাছে ব্যর্থতা এবং হতাশায় পরিপূর্ণ; দ্বিতীয় পর্বে প্রভাত-সংগীতের সঙ্গে যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে আশা আনন্দের নির্ঝর নেমে এসেছে, তেমনি এঁর জীবনেও *Treasure of the Humble*এর পর থেকেই আনন্দ ও আশার আবির্ভাব হয়েচে দেখতে পাই। বাস্তবিক পক্ষে এ দুইটি পর্বই বিকাশের দুটি পরস্পরসম্বন্ধ স্তর মাত্র।

মেটারলিঙ্কের জীবনের প্রথম পর্বটি ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত প্রসারিত বলে ধরা যেতে পারে। এই যুগের লেখায় এক নির্মম অদৃষ্ট-রহস্যের বোধ যেন তাঁর চিত্তের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে

রয়েছে দেখতে পাই; এক অসহনীয় তাপের অবরুদ্ধতা ও মৃত্যুবিভীষিকায় তাঁর সমগ্র চেতনা সমাচ্ছন্ন। এই সময়ের কবি-চেতনার চতুর্দিকের বাধা যেন অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠেছে এবং আপন অন্তরের বিকাশ-পথে যেন এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে হয় ঘেণ্টের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের মধ্যযুগীয় দৃশ্য যেমন তাঁর চিত্তে অবসাদ ও ভীতি বিস্তার করছিল, তেমনি অপর দিকে জেসুইট সম্প্রদায়ের মৃত্যুভীতিগ্রস্ত ধার্মিকভাবনা এবং শপেনহয়ের ও হার্টম্যানের দার্শনিক নিরাশাবাদও তাঁর তরুণ চিত্তের ওপর বিষময় প্রভাব বিস্তার করছিল।

তাই মেটারলিঙ্কের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনার নাম *Serres Chaudes* (রুদ্ধ তাপ): এই ক্ষুদ্র কবিতাসংগ্রহের মধ্যে চির অবরুদ্ধ মানব অন্তরের বিকারগ্রস্ত যাতনার অসম্বদ্ধ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে; এই কবিতাগুলির ভাবকেন্দ্র দুঃসহ অবরুদ্ধতার মধ্যে মানবাত্মার মর্মন্তুদ অসহায়তা। পরবর্তী রচনায় মেটারলিঙ্ক ভাষার যে-প্রতীকীপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং যে-অপূর্ব প্রতীকী ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য অর্জন করেন, তার অক্ষম প্রয়াসও সর্বপ্রথম এই কবিতার মাঝ দিয়েই প্রকাশ পায়।

এই অবরুদ্ধতার যুগে মেটারলিঙ্ক পরপর 'রাজকুমারী মেলাইন' 'অনাহূত' (*L' Intruse*) 'দৃষ্টিহারা' (*Avengles*) 'সপ্তরাজকুমারী' 'পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা' 'আল্লাদীন ও প্যালোমিডিস' 'অন্দরে' এবং 'তিন্তাজিলের মৃত্যু' প্রকাশিত হয়। এখানে এই নাটকগুলির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নয়। পারস্পরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই নাটিকাগুলির মধ্যে মানব নিয়তির এক নির্দয় ভীষণ রূপ ফুটে উঠেছে, এই জন্যই তাঁর সৃষ্ট মানবচরিত্রে আমরা ব্যক্তির একান্ত অসহায়তা ও শক্তিহীনতাই লক্ষ্য করি। এই নাটকগুলির মাঝ দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষকে অদৃষ্টের তাড়নায় বাধ্য হয়ে মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করতেই হবে। জগতের অমঙ্গল ও দুঃখরাশি যেন নিয়তির অনুচর, এরা মানবজীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবার জন্য নিয়ত উদ্যত। তাই এই যুগের মেটারলিঙ্কীয় চরিত্রগুলি যেন এক অজ্ঞাত বিষাদে (শেলির antenatal gloom) নিদ্রাচ্ছন্নপ্রায় স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সূর্যের আলোক যেন সে-জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত; প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু, ফুলের মধুর আবেশময় সুগন্ধ আশ্বাস, পাখির উচ্ছ্বসিত আনন্দসংগীত এসবই যেন ভয়ার্ত হয়ে কোন্ বিস্মৃত যুগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এরা যেন বিষাদপুরীর দিকহারা অন্ধকারে ভীষণ নিয়তির কবলে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে— মুক্তি এখানে পাগলের স্বপ্ন, নিয়তি এখানে অমোঘ।

এইসব নাটকের মাঝ দিয়ে মেটারলিঙ্কীয় নাট্যরীতির দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে— একটি হচ্ছে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মাঝ দিয়ে একটা অব্যক্ত ভীতি ও বিষাদের আবহাওয়াটিকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলার আশ্চর্য শক্তি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর অদ্ভুত কথোপকথনরীতি। কথোপকথনের অসমাপ্তি ও পুনরুক্তির মাঝ দিয়ে মানবচিত্তের বিস্মিত ও ভীতিগ্রস্ত পক্ষাঘাতটিকে মেটারলিঙ্ক যে আশ্চর্য কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনব বলতে পারা যায়। 'অনাহূত' 'দৃষ্টিহারা' 'অন্দরে' 'পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা' নাটকগুলি না পড়লে মেটারলিঙ্কীয় প্রতীকী-নাট্যরীতির এই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য বোঝানো সম্ভব নয়।

নিরাশা এবং অসহায়তার অনুভূতিই অত্যন্ত প্রবল হলেও, মেটারলিঙ্কের অনুভবে আরেকটি সত্যও ধীরে ধীরে ধরা দিতে আরম্ভ করেছে দেখতে পাই, সে হচ্ছে মানবাত্মার গভীর প্রেমতৃষ্ণা।

নিদারুণ মৃত্যুর সমুখে দাঁড়িয়েও মানবাত্মা যে একমাত্র প্রেমকেই চায়, প্রেমের মধ্যেই যে মানবাত্মার অন্তরতম সার্থকতা, একথাটি মেটারলিঙ্কের পরবর্তী নাটকে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে প্রবল সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেচে। তারই প্রথম প্রকাশ 'পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা'য়। এ নাটকেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা তেমনি আছে, কিন্তু যুগলপ্রেমের পরম পরিচয়ের মাঝ দিয়ে আত্মার মৃত্যুবিজয়ী শক্তিকেও স্বীকার করা হয়েছে।

ভালবাসার যুগলতত্ত্ব সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের একটি বিশেষ ধারণা এইসময় থেকেই তাঁর নাটকে ফুটে উঠতে আরম্ভ করে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানের বাইরে এমন-একটি দেশ আছে, যেখানে কেউই আমাদের অপরিচিত নয়, সেই স্বদেশে আমরা সকলেই যেতে পারি ও পরস্পরের পরিচয়টিকে পেতে পারি······সেখানেই আমাদের নিত্যকালের প্রিয়াকে আমরা বরণ করে নিয়েচি। এইজন্যই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তারাও যেমন ভুল করতে পারে না আমাদেরও তেমনি ভুল করা অসম্ভব।······আমাদের জীবনের সকল কর্মকে ঘিরে যে-মায়াচক্র আঁকা হয়ে আছে, তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে আমরা আমাদের অন্তর-নেতা সহজ-বোধটিকে (intuition) বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তবু আমাদের ভাগ্যনির্দিষ্ট প্রণয়িণীকে ত্যাগ করবার শত চেষ্টা করলেও অবশেষে সেই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হবে।"

'পাত্রী নির্বাচন' (১৯১৮) নাটকে আমরা এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখতে পাই, কিন্তু মনে হয় শেষজীবনে মেটারলিঙ্ক এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

সমালোচক জেমসন তাঁর *Modern Drama in Europe* পুস্তকে মেটারলিঙ্কের প্রথম যুগের এইসব নাটক সম্বন্ধে বলেন যে "যদি ভাষার অতুলনীয় ছন্দ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাশক্তি ও সুন্দর মানব অন্তরের অস্ফুট সৌন্দর্যের বিকাশ নিয়েই তৃপ্ত হতে চান তাহলে নিখুঁত শিল্প-সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ জটিলতাহীনতা এদের মধ্যে পাবেন। অধিকন্তু এদের মধ্যে একটি অভিনব নাটকীয় রীতি দেখতে পাবেন যার সাহায্যে অন্তরাত্মার গভীরতম অনুভবগুলি সংগীতে বিকশিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এদের মধ্যে শক্তির সন্ধান, জীবনে গৌরববোধের সন্ধান, অতীন্দ্রিয় বিশ্বসত্তায় গভীর বিশ্বাসের সন্ধান অথবা কোনো গভীর দার্শনিকতার সন্ধান করবেন না, কারণ এসব নাটকে তার কিছুই নেই।"

কিন্তু আমার মনে হয় যে মেটারলিঙ্কীয় চরিত্রের এই বিষাদ শক্তিহীনতার পরিচয় নয়: বৃহত্তর জীবনের মধ্যে একটি গভীরতম আত্ম-পরিচয়ের সন্ধানে অজ্ঞাত পথের অন্ধকারে মানবাত্মার যে ক্রন্দন ও সাময়িক হতাশা তাই এইসব নাটকীয় চরিত্রের এবং চরিত্র স্রষ্টার বিষাদের মৌলিক কারণ।

৩

জীবনসাধনার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁদের আমরা মিস্টিক মরমিয়া রহস্যবাদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকি। মিস্টিকের সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে একটি গোপন অতীন্দ্রিয় বিশ্বব্যাপ্ত চেতনশক্তির প্রতি হৃদয়ানুভব থেকে উদ্ভূত একান্ত এবং অপরিসীম বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাস শুধু সেই অস্তিত্বের ওপর নয়; সেই অনন্ত শক্তি যে পরম মঙ্গলময়, মানবাত্মা যে সে শক্তি থেকে মূলত অভিন্ন এবং তার সঙ্গে একাত্ম হওয়াই যে মানবাত্মার চরম ও পরম সার্থকতা এটিও মিস্টিকের একান্ত অবিচলিত বিশ্বাস। মিস্টিকদের এই অনুভূতির জগতে প্রবেশ করবার আকুলতা সত্ত্বেও মেটারলিঙ্ক যেন এ জগতে

কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিলেন না। প্লোটিনাস, রুইসব্রোক, নোভালিস, এমার্সন, কার্লাইল ইত্যাদি লেখকদের প্রতি অনুরক্তির মূলেও তাঁর এই মিস্টিক প্রবণতাই কাজ করছিল এবং একটি বিশ্বাসও গড়ে উঠছিল যে নিশ্চিত সত্যের সন্ধান একমাত্র মিস্টিকদের নিকটই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম যুগের নিরাশাবাদ তাঁকে কিছুতেই মিস্টিকদের পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে দিচ্ছিল না। অবশেষে তিনি যেন একটি শুভ মুহূর্তে সেই পরম সত্যের স্পর্শ লাভ করলেন এবং সেই মুহূর্তের অপরিসীম আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন তাঁর অন্তরের সকল সংশয় নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে 'দীনের সম্পদ' পুস্তকে প্রবন্ধাকারে মেটারলিঙ্ক তাঁর সেই নবজীবনলব্ধ অনুভূতিকে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। এর পর থেকে মেটারলিঙ্ক আমাদের সমুখে একজন রহস্যপূজারী প্রবল আশাবাদীর বেশেই দেখা দিয়েছেন: নিয়তির রুষ্ট প্রভাবটিকে এর পরও বহুকাল তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি বটে, তবু এখন থেকে তাঁর লেখায় সর্বত্র মানবাত্মার একটি বলিষ্ঠ রূপই আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যায়। পরবর্তী জীবনে যেসব ভাব ও ভাবনা আরো বিকশিত হয়ে উঠেচে তাদের অঙ্কুর এই পুস্তকেই বিদ্যমান। এই কারণেই একমাত্র 'দীনের সম্পদ' বইখানি পাঠ করলেই আমরা রহস্যানুরাগী আশাবাদী মেটারলিঙ্কের পরিচয় পেতে পারি।

যদিও এ পুস্তকেও তিনি স্বীকার করছেন যে অদৃষ্ট মানুষের জন্য কখনও সুখ আনে না, সে দুঃখ নিয়েই আসে, যদিও তাঁর বিশ্বাস যে মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম, তবু এইসব উক্তির মধ্যে আর সেই অসহায় আর্তনাদের সুর নেই। তাই তিনি বলেন যে প্রত্যেক দুর্ঘটনার মাঝে নিমেষের জন্য হলেও, আমাদের অন্তরের সহজবোধ বলে যে অদৃষ্ট আমাদের প্রভু নয়, আমরাই অদৃষ্টের প্রভু। 'দীনের সম্পদে' মেটারলিঙ্ক মানবাত্মাকে অপূর্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তিনি কেবল আন্তর অনুভূতিকেই এই উপলব্ধির আধার বলে স্বীকার করেচেন, যুক্তিমূলক কোনো ভিত্তিই আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁর মতে মানব-জীবনের যেটুকু অভিব্যক্ত তাই তার একমাত্র এবং যথার্থ জীবন নয়: মানবাত্মা তার চিন্তা এবং স্বপ্নরাশি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জীবনের একটা গভীরতর দিক আছে যা কোনোকালেই প্রকটিত হতে পারবে না, কিন্তু সেটাই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতম, পবিত্রতম দিক। মানবাত্মার অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারলেই মানবাত্মা যে চিরপবিত্র চিরসুন্দর ও মঙ্গলময় তা বুঝতে পারা যায়। মেটারলিঙ্কের মতে একটি পরম নীরবতার মাঝ দিয়েই আমাদের পক্ষে সেই গভীর অন্তর্লোকে প্রবেশ করা সম্ভব। এই কারণেই মেটারলিঙ্ক তাঁর নাটকে নীরবতাকে একটি মহত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

মেটারলিঙ্কের সমগ্র রচনা যেসব তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েচে, তাতে প্রেমই বোধ হয় সর্বপ্রধান। মানুষের যে-গভীরতর জীবনের কথা বলা হয়েছে, মেটারলিঙ্কের মতে সেই জীবনে প্রবেশলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় প্রেম। এই জীবনে ও জগতে যাকিছু পরম সুন্দর মহীয়ান ও পরম মঙ্গলস্বরূপ মেটারলিঙ্ক তাকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন এবং মানবজীবনের গভীরতর সত্তাকেও তাই সেই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন বলেই স্বীকার করেচেন। প্রেমভালোবাসাকে তাই মেটারলিঙ্ক সেই অনন্ত রহস্যশক্তির সহিত 'পরম ঐক্যের স্মৃতি' (a recollection of great primitive unity) বলে বর্ণনা করেচেন। সুতরাং একমাত্র গভীর জীবনের জাগরণের মাঝ দিয়েই মানুষ নিজের পরমানন্দময়

সুন্দর সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মেটারলিঙ্কীয় দৃষ্টিতে তাই কোনো মানুষই হেয় নয়। প্রত্যেক মানবাত্মাই এক পরম গৌরবের অধিকারী। 'দীনের সম্পদ' পুস্তকে মেটারলিঙ্কের নৈরাশ্যভীতি ও বিষাদমুক্ত জীবনের অপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাসিত 'প্রভাতসংগীত' ধ্বনিত হয়ে উঠেচে।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে ত্রয়ীর সমস্যা একটি অতি পুরাতন সমস্যা; মেটারলিঙ্ক 'আল্লাদীন ও প্যালোমিডিস' 'পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা' এবং 'দীনের সম্পদে'র সমকালিক 'এগ্লাভেন ও সেলীসেট' নাটকে এই সমস্যাকেই গ্রহণ করেছেন। মেটারলিঙ্ক কিন্তু এই ভালোবাসাকে সাধারণ স্থূল হিংসাদ্বেষ-প্রবণ মানবস্বভাবের স্তর থেকে সরিয়ে আরো উচ্চতর মানবস্বভাবের ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সাধারণের ক্ষেত্রে ভালবাসার পাত্রকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করার দুর্জয় বাসনাই ট্রাজিডির কারণ হয়ে ওঠে, মেটারলিঙ্কীয় নাটকের পাত্রপাত্রীরা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর হাতে সমর্পণ করার পথই সন্ধান করে এবং এই অপূর্ব দুঃখবরণই ট্রাজিডির কারণ হয়ে ওঠে। এগ্লাভেন ও সেলীসেট দুটি নারীই মিলীয়াণ্ডারের ভালোবাসায় প্রতিদ্বন্দ্বিনী, অবশেষে ত্যাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরলা সেলীসেটই মৃত্যুবরণ করে বিজয়িনী হল। এ নাটকেও মেটারলিঙ্ক মৃত্যুর নিদারুণতা এবং অনিবার্যতাকে স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে নাটকের মাঝে এই বোধটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে যে মৃত্যুর ভীষণতাও প্রেমের পথে মানবাত্মার গতিরোধ করতে সক্ষম নয়। 'দীনের সম্পদে'র মধ্যে মেটারলিঙ্কের যে ভাবদৃষ্টি ফুটে উঠেছে, এ নাটকেও তা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাতে নাটকের সৌন্দর্যহানিও হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি অতীন্দ্রিয় রহস্যময় আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে তিনি অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং মেটারলিঙ্কের স্বকীয় নিগূঢ় ব্যঞ্জনাত্মক প্রতীকী কথোপকথনভঙ্গীর অপরূপ বিশেষত্বও এই নাটকে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

৪

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *Wisdom and Destiny* গ্রন্থে আমরা মেটারলিঙ্কীয় ভাববিকাশের আরেক স্তরে উপনীত হই; প্রথমযুগে ছিল অজ্ঞানজনিত রহস্যবোধের বিভীষিকা আর অশক্তিজনিত নৈরাশ্য ও বিষাদ। দ্বিতীয় যুগে মেটারলিঙ্কের জীবনে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের এক অপূর্ব আনন্দজ্যোতির বিকাশ দেখতে পাই 'দীনের সম্পদে'। মেটারলিঙ্ক কিন্তু বেশিদিন যৌবনের অনুভূতিপ্রবণতাকে আশ্রয় করে থাকতে পারেন নি। তাই কেবল কতকগুলি অনুভূতির দ্বারা নয়, বুদ্ধিবিচারের পথে এবার মেটারলিঙ্ক তার অনুভূতিলব্ধ জীবনদর্শনের সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত। দীনের সম্পদে লেখক যেন আপনাকে এই বাস্তব জগৎ থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্তরের নিভৃত স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন; কিন্তু 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্টে'র দার্শনিক মেটারলিঙ্ক জগতের কর্মপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেচেন এবং প্রেমলোকের কর্মহীন নিভৃত অবসরের মধ্যে যিনি জীবনের চরম ও পরম সার্থকতার সন্ধান করছিলেন, আজ তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন যে নৈতিক জীবনের প্রকৃত বিকাশই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই; তাই যে-ভাবুকতা কর্মে আপনাকে বিকশিত করতে পারে না, তা জীবনের বিকাশে কোনো সহায়তাই করতে পারে না। জীবনে কর্মপ্রাধান্যের মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রচণ্ড পরিবর্তন নিহিত রয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

একদিন মেটারলিঙ্কীয় দৃষ্টিতে নিয়তি নিদারুণ এবং অলজ্ঘ্য ব'লেই প্রতিভাত হয়েছিল। 'দীনের সম্পদে'র পর প্রেমের শক্তিকে মৃত্যুর ওপরে স্থান দেওয়া সত্ত্বেও নিয়তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। এবার মেটারলিঙ্কের মন থেকে কিন্তু নিয়তির অখণ্ড প্রভাবের ওপর যে বিশ্বাস ছিল তা তিরোহিত হতে আরম্ভ হয়েচে। 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্টে'র মূল কথাই এই যে মানুষ অদৃষ্টের অধীন নয়; বহির্জগতের ঘটনার ওপর অদৃষ্টের অমোঘ শাসন অব্যাহতভাবেই চলে একথা তিনি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেটারলিঙ্ক এই কথাও বলতে আরম্ভ করেচেন যে অন্তর্জগতের ওপর অদৃষ্টের নিয়ন্তৃত্ব নাই: ঘটনাকে মানুষ হয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, কিন্তু ঘটনাকে আপন অন্তরে ইচ্ছানুরূপ রূপ দিয়ে মানুষ তার প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বলা বাহুল্য যে বাস্তব জগতের বৈপ্লবিক নিয়ন্ত্রণ মেটারলিঙ্কের কাছে সম্ভব মনে হয় নি বলেই আদর্শবাদী উপায়ে আপন অন্তর্লোকে সকল সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। অদৃষ্টের ওপর অন্তরের এই প্রভুত্ব-সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার ফলে মেটারলিঙ্ক জীবনকে আনন্দদৃষ্টি দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছেন এবং এই সময় থেকেই জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবিচারের প্রাধান্যকেও স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। তাই এর পর তিনি মক্ষিকাজীবন সম্বন্ধে যে আশ্চর্য সুন্দর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণপূর্ণ আলোচনা করেন তাতে তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে "অনেক দিন হয়ে গেছে, আমি এ জগতে সত্যের চেয়ে— অন্ততঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হবার যথাসাধ্য চেষ্টার চেয়ে বেশি সুন্দর অথবা চিত্তাকর্ষক বস্তুর সন্ধান পরিত্যাগ করেচি।" মক্ষিকাজীবনের আলোচনার মাঝ দিয়েও তাই তাঁর জীবনের উপর দৃঢ়তর বিশ্বাস ফুটে উঠেচে দেখতে পাই: তিনি বলেন, "জীবন আমাদের কোনো নিশ্চিত ভরসা না দিতে পারলেও বিপরীত কোনো সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য হচ্ছে জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখা।" 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্টে' মেটারলিঙ্ক অন্তর্জীবনের ওপর অদৃষ্টের প্রভাবকে অস্বীকার করেছিলেন, মক্ষিকাজীবনে তিনি আরো অগ্রসর হয়ে বলতে চেয়েছেন যে নিয়তি বলে কোনো কিছুই নেই, ওটা আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত একটা সংস্কার মাত্র। আছে একটি অজ্ঞাতশক্তি— একদিন জ্ঞানের দ্বারা তাকে আয়ত্ত করে মানব-মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠতম শক্তির পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারবে বলে মনে করা যায়। অতীন্দ্রিয় ভাবুকতার মুগ্ধ আবেশ কাটিয়ে মেটারলিঙ্ক পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী প্রবল আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের বেশে দেখা দিয়েছেন।

মেটারলিঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলে আমরা তাঁকে জীবনের নৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট দেখতে পাই। *Buried Temple* বইখানি পরে প্রকাশিত হলেও এর রচনাগুলি *Wisdom and Destiny* এবং *Life of the Bee*র মধ্যবর্তী, এর চারটি দীর্ঘ আলোচনার মাঝ দিয়ে আমরা তাঁর চিন্তাধারার একটি সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। মেটারলিঙ্ক বলেন যে প্রথমত আমাদের জীবন যে ঘোর রহস্যাবৃত থাকে তা আমাদের অজ্ঞানেরই ফল, কিন্তু জ্ঞানবিকাশের ফলে যদিও মিথ্যা রহস্যবোধ কেটে যেতে থাকে এবং বুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের বহু ব্যাপার জ্ঞানগম্য হতে থাকে, তথাপি রহস্যবোধ যে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে একথাও তিনি সত্য মনে করেন না। তাই দেবলোক অথবা অদৃষ্টলোক দিয়ে মানুষের নীতিবোধের ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও ন্যায়-রহস্যের শেষ হয়ে যায় না। তাঁর মতে মানব-অন্তরের মধ্যেই ন্যায়বোধ নিহিত রয়েছে এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে

কর্মজগতের সাধনার দ্বারা এই ন্যায়বোধ ক্রমশ বিশুদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকবে। বর্তমান সমাজে যেসব কর্ম নৈতিক বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে তা যে যথার্থত নৈতিক নয় মেটারলিঙ্ক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেচেন যে আমরা জীবনে আজ যেসব অধিকার ভোগ করচি তাদের প্রত্যেকটি আমাদের কোনো-না-কোনো নৈতিক পাপের সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা আজ জানতে পারছি যে বিশ্বব্যাপী অন্যায় অবিচার এবং অমঙ্গলের মূলে অদৃষ্ট নাই, আছে মানবজাতির কর্ম। মেটারলিঙ্ক কিন্তু একথা বলতে পারেন নি যে মানবজাতি সচেতনভাবেই এই অমঙ্গলের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তাঁর বিশ্বাস মানবজাতির গোপন চেতনাই যুগে যুগে মানুষকে উচ্চতর নৈতিক বিকাশের পথে নিয়ে চলেচে। প্রতি মানবের অন্তরেই নৈতিকবোধ বিদ্যমান, প্রত্যেক মানবকে বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যের সহিত যোগ রেখে অগ্রসর হতে হবে। কি ভাবে যে মানবজাতি সমগ্রভাবে উচ্চতর নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করবে তা বলতে না পারলেও তিনি একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে বিশ্বমানব একটি অখণ্ড সত্তা। সমগ্র জগৎ নিম্নস্তরের নৈতিক হাওয়ায় বিচরণ করবে আর কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তি উচ্চস্তরের নির্মলতা উপভোগ করবে— এটা অসম্ভব। তাঁর বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রাণধারণের জন্য মানবজাতিকে অত্যন্ত অল্প পরিশ্রম করতে হবে এবং মানবজাতি একটি আশ্চর্য অবসরের যুগে উপনীত হবে। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারাই যে মানব সমাজ যথার্থ ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তা না বুঝতে পারায় মেটারলিঙ্ককে বলতে হয়েছে যে এখনও মানবজাতি অবসর যাপনের কোনো পথ পায় নি, এখন দেখা যায় কর্মের চেয়ে অবসরই মানবকে অসুস্থ করে তোলে ; আশা করা যায় মানবজাতি এ সমস্যাকেও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা মেটাতে সক্ষম হবে।

৫

'এগ্লাভেন ও সেলীসেট' প্রকাশিত হওয়ার চার বৎসর পরে ১৯০০ খৃস্টাব্দে মেটারলিঙ্কের *Sister Beatrice* নামে যে নাটকখানি প্রকাশিত হয় সেখানি যে খুব সার্থক সৃষ্টি হয়েছে তা বলা চলে না। 'দীনের সম্পদে' মেটারলিঙ্ক মানবাত্মার অন্তর্নিহিত নিত্য সৌন্দর্য ও বহির্জীবনের সহস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও গভীরতর জীবনের দিক দিয়ে তার চির পবিত্রতার কথা প্রচার করেন। এ নাটকেও যেন তিনি সেই কথাটিকেই নাটকের মাঝ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেচেন। খৃস্টমাতার সেবিকা বিয়াট্রিস মানবিক প্রেমের আকর্ষণে মঠ ত্যাগ করল এবং ঘটনাচক্রে তার জীবনের পঁচিশটি বৎসর ব্যভিচারের মধ্যে অতিক্রান্ত হল। সংসারের নিয়ম আছে, সে নিয়মভঙ্গের শাস্তিও আছে। বিয়াট্রিসকেও সে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু তবু মেটারলিঙ্কের মনে প্রশ্ন এই যে বিয়াট্রিসের জীবন কি চিরতরেই ব্যর্থ হয়ে গেল ? মেটারলিঙ্ক উত্তরে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানবাত্মার গভীর সত্তাকে পাপ কখনও চিরকালের জন্য নষ্ট করতে পারে না, ক্ষণকালের জন্য ছায়াম্লান করতে পারে মাত্র।

Ardiane and Barbe Bleu নাটকখানির আবির্ভাব ১৯০১ সালে হলেও একে আমরা ভাবের দিক দিয়ে তিন্তাজিলের মৃত্যুর পরবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। এই নাটকে তিনি আবার অদৃষ্ট-রহস্যের সমুখে মানবাত্মার অসহায়তা, ভীতি ও বিষাদের চিত্রকে অঙ্কিত করেছেন। অবশ্য এ নাটকে তিনি শক্তিময়ী আর্দিয়ানী চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন এবং নীলদাড়ির দুর্গে পঞ্চ বন্দিনীকে

মুক্ত করতে গিয়ে সে যে ব্যর্থ হল তার মাঝ দিয়ে একথাই বলতে চেয়েচেন যে স্বকীয় আন্তর শক্তির সাহায্যেই অদৃষ্টের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, এ মুক্তি বাইরে থেকে দেওয়া অসম্ভব।

ইতিমধ্যে মেটারলিঙ্কের জীবনে যে ভাবগত পরিবর্তন হয়েচে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েচে। তাই মেটারলিঙ্ক নাটকের মাঝ দিয়েও নৈতিক সমস্যা আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হয়েচেন দেখা যায়। 'মোনা ভানা' নাটকখানিই মেটারলিঙ্কের সর্বপ্রথম নাটক যার মধ্যে বাস্তবজগতের সামাজিক মানুষকে নিয়ে নাট্যসৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এখানে এটুকুই বলা যেতে পারে যে নানাস্থানে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অবতারণা সত্ত্বেও নাটকখানি বিশেষত্বহীন ও অস্বাভাবিক হয়েছে। বাস্তব চরিত্রচিত্রণে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

'মোনা ভানা'র সৃষ্টিতে মেটারলিঙ্ক সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু মোনা ভানারই কয়েকটি তত্ত্বকে নিয়ে যখন তিনি বাস্তবজগতের বাইরে এসে, কল্পলোকে নাট্যসৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হয়েচেন সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মেটারলিঙ্ক সার্থক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েচেন। *Joyzelle* নাটকখানি শেক্সপীয়রের *Tempest* নাটকের আখ্যানাংশকে নিয়ে রচিত হলেও জয়জেল মেটারলিঙ্কীয় বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল। এই নাটকের মাঝে মেটারলিঙ্ক মানবাত্মার সেই ত্যাগের বর্ণনা করেচেন যা প্রেমের প্রেরণায় ভালবাসার পরম নিষ্ঠায় আপনাকে নষ্ট করেও অপর একটি ব্যক্তিত্বকে সার্থক করবার চেষ্টা করে। জয়জেল নাটকে মেটারলিঙ্কীয় ট্র্যাজিডির বিশেষত্বটুকু লক্ষণীয়। এই ট্র্যাজিডি কোনো নৈতিক দুর্বলতাপ্রসূত নয়, কোনো নৈতিক নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্ঘাতেরও ফল নয়। এই ট্র্যাজিডির সঙ্ঘাত ব্যক্তির মহত্ত্বের সহিত রহস্যময় বিশ্বশক্তির সঙ্ঘাত।

'জয়জেলে'র পরবর্তী নাটক *Miracle of St. Anthony* কিন্তু মেটারলিঙ্কের অন্য সমস্ত নাটক থেকে স্বতন্ত্র। যদি বর্তমান শতাব্দীর সভ্যসমাজে প্রাচীন যুগের সাধু অ্যান্টনী তাঁর সেই প্রাচীন যুগের বেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন তাহলে তাঁর কী দশা হতে পারে তারই চিত্র এই নাটকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সভ্যসমাজের বসনভূষণের মোহ, দরিদ্রের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার, যাকিছু অসাধারণ তার প্রতি বিচারহীন অশ্রদ্ধা—এ সবের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তু হিসাবে নাটকখানির বিশেষ গুরুত্ব না থাকলেও, এই নাটকের মধ্যে বার্তালাপ ও পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ করেছে এবং বাস্তব চরিত্র রচনায় যে মেটারলিঙ্ক দক্ষতা অর্জন করচেন তা প্রমাণিত হয়েছে।

৬

'গোপন মন্দিরে'র দুবছর পরে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে মেটারলিঙ্কের *Double Garden* নামে যে প্রবন্ধসংগ্রহটি প্রকাশিত হয় তাকে মেটারলিঙ্কীয় গদ্যরচনার মধ্যে একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলা যেতে পারে। ইতিপূর্বে গদ্য আলোচনায় মেটারলিঙ্ক যে ধীরে ধীরে নানা সমস্যা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করতে আরম্ভ করেচেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং বোধ হয় এটাও পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তার সঙ্গে এঁর চিন্তাধারারও সাদৃশ্য রয়েচে। রবীন্দ্রনাথের মতোই মেটারলিঙ্কও অসাধারণ সৌন্দর্যপূজারী: উভয়েরই এই সৌন্দর্যপিপাসা তাঁদের ভাষায় আশ্চর্যভাবে ফুটে

উঠেচে। রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বের অতি সাধারণ বস্তুর মধ্যেও মেটারলিঙ্ক যে গভীর সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে সক্ষম তা রহস্যোদ্যানের পাঠক দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবেন। পরবর্তী জীবনে 'বিশ্বপরিচয়' রচনায় কিংবা ইতিপূর্বেও নানা দার্শনিক নৈতিক অথবা সামাজিক রাষ্ট্রিক আলোচনায়ও সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা তাঁর ওই সৌন্দর্যবোধের অজস্র পরিচয় পেয়েচি। মেটারলিঙ্ক এদিক দিয়ে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্পৃহা, সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও জীবজগতের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেই সব অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের কাব্যের মত সুন্দর অথচ তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনার সমাবেশ মেটারলিঙ্কের রচনায় যে-ভাবে ফুটে উঠেচে, তেমনটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। মক্ষিকাজীবনকে যে-হিসাবে একখানি সুন্দর মহাকাব্য বলা চলে, সেই হিসাবেই রহস্যোত্থানের রচনাগুলিকে অতি সুন্দর খণ্ডকাব্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানকে যে মেটারলিঙ্ক কতখানি মহত্ত্বপূর্ণ মনে করেন তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যেতে পারে। তিনি বলেন, "প্রকৃতির মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। যিনি একটি ফুলকে, একটি ঘাসের পাতাকে, প্রজাপতির পাখাকে, পাখির বাসাকে, একটি ঝিনুককে ভালোবেসেচেন, তিনি এমন একটি ক্ষুদ্র বস্তুকে ভালোবেসেছেন যার মাঝে নিত্যকালই একটি পরম সত্য নিহিত রয়েচে। বলতে চাও তো বলতে পার যে, কোনো ফুলের রূপ পরিবর্তন করতে পারাটা খুবই সামান্য, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই এ অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে দেখা দেবে···এ থেকেই আমাদের আশা হয় যে হয়ত একদিন অন্যান্য বহুকালাগত প্রাকৃতিক নিয়মকেও— (যাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়োজনের সম্পর্ক রয়েচে)— অতিক্রম করতে কিম্বা এড়িয়ে যেতে শিখব···একটি ফুলের ব্যাপারে সামান্য বিজয় একদিন আমাদের নিকট সেই অকথিতের অসীম রহস্যকে প্রকাশ করিতে পারে।"

বিশ্বরহস্যকে মেটারলিঙ্ক কখনো অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে ধার্মিক যুগে আমরা অজ্ঞানবশত এই বিশ্বরহস্যের একটা কাল্পনিক রূপ তৈরী করেছিলাম, কিন্তু এবার বস্তুবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বরহস্য কাল্পনিকতাযুক্ত হয়ে আরো বিশালরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, ফলে মানুষ এক দিক দিয়ে এই অসীম বিশ্বে আপনাকে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে বুঝতে পারছে। কিন্তু এরই ফলে মানবাত্মার একটি গৌরবময় নবজন্মও হয়ে চলেচে। তাই তিনি বলেন, "যতই বেশি আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারছি, ততই যে-শক্তির দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারচি সে-শক্তি বিপুলতর হয়ে চলেচে।" তাই মানুষ আজ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে যে 'অন্তরে আমরা গভীরতম ও মহত্তম রহস্যের সমগোত্রীয়'; তাই মানবাত্মা আজ ভীতচিত্তে পরমরহস্যের সমুখে কম্পমান নয়, আজ সে পরম সাহসে তার সমগোত্রীয় বিশ্বরহস্যকে আবিষ্কার করতে অগ্রসর হয়েছে।

১৯০৭ সালে প্রকাশিত *Life and Flowers* শীর্ষক প্রবন্ধ পুস্তকেও তাই মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনায়, বর্তমান যুগের নৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং পুষ্পজগতের মধ্যে বুদ্ধিশক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে মেটারলিঙ্কের বিপুল আশা আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেচে। মৃত্যুসমস্যা মেটারলিঙ্কের রচনায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল এই পুস্তকের 'অমরতা' প্রবন্ধে নয় পরে আরো বিস্তৃত ভাবে ১৯১১ সালে 'মৃত্যু' পুস্তকে এবং এই পুস্তকেরই পরিবর্তিত রূপ 'আমাদের নিত্যতা'য় (১৯১২) তিনি মানবিক ব্যক্তিত্বের নিত্যতা, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করেচেন এবং নানা

যুক্তির সাহায্যে এই কথাই বলতে চেয়েচেন যে ব্যক্তিজীবনের যে এখানেই চরম বিলুপ্তি তা নাও হতে পারে এবং জন্মান্তরবাদ নিতান্ত অমূলক নাও হতে পারে। অন্তত থিওরি হিসাবে তিনি এই "মতবাদের চেয়ে সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত, পবিত্র, নৈতিক, ফলপ্রসূ, সান্ত্বনাময় এবং কতক পরিমাণে সম্ভবপর মতবাদ আর নেই" বলে স্বীকার করেচেন।

মেটারলিঙ্ক একজন প্রবল আশাবাদী, ভবিষ্যতের ওপর তাঁর আস্থা অপরিসীম। প্রাকৃতিক জগতে অসমতা আছে বলেই যে মানুষও তার সমাজব্যবস্থায় এই বিসমতাকেই স্বীকার করতে বাধ্য একথা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে আমাদের অন্তরতম নীতিবোধ মানবসমাজের বিসমতাকে প্রতিনিমেষে অস্বীকার করে, উন্নতির পথে বাধা যেখানে বিপুল, সেখানে চরম আদর্শের প্রবলতাই বাঞ্ছনীয়, এটিই তাঁর মূল কথা। যাকিছু অন্যায় তাকে বিনা দ্বিধায় ধ্বংস করাই আমাদের কর্তব্য, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস এই যে জাতির প্রাণশক্তিকে সৃষ্টির অবসর দিলে অবিলম্বেই সে ধ্বংসের মাঝে নূতন সৃষ্টিকে জাগ্রত করে তুলবে।

৭

ইতিপূর্বেই দেখা গেছে যে মেটারলিঙ্কীয় নাটক আর স্বপ্নলোকের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। তাই ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'মেরীমেডলীন' নাটকেও আমরা কী চরিত্রসৃষ্টিতে, কী বার্তালাপ-পদ্ধতিতে, কোথাও পূর্বেকার রহস্যময় আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাই না; এখানে বাস্তবজগতের বাস্তব-চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই। এই নাটকে খৃস্টকে অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ রূপে স্বীকার করে নেওয়া হলেও নাটকের ভিত্তি এই অলৌকিকতার ওপর নয়। খৃস্টীয় ধর্মনীতির ওপর মেটারলিঙ্ক যে আস্থাবান নন তা তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় নানা স্থানেই অভিব্যক্ত হয়েচে। তাই মৃত্যুবিজয়ী খৃস্টকে এই নাটকের চরিত্রহিসাবে গ্রহণ করায় অনেকেই বিস্মিত হয়েচেন এবং নাটকখানিকে খাপছাড়া বলতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু মেটারলিঙ্ক এই নাটকে অলৌকিকত্বের মহিমা প্রচারে উদ্যত নন, বরং এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে দেবত্ব বলতে কোনো অসাধারণ আশ্চর্য শক্তির বিকাশ বোঝায় না, মনুষ্যত্বের চরম নৈতিক বিকাশই মানুষকে যথার্থ দেবত্বে উন্নীত করে। খৃস্টের অলৌকিকতা নয়, তাঁর অপূর্ব প্রেমই মেডলীনকে কামনালোকের বহু উর্ধ্বে নিয়ে গেল। তাই যখন ভীরুসের নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে খৃস্টের ভৌতিক জীবন রক্ষা করার সমস্যা উপস্থিত হল মেডলীনের সম্মুখে, তখন সে তার পরমপ্রিয়ের ভৌতিক মৃত্যুকেই স্বীকার করে নেয় এই ব'লে যে, "দেবতা আমার,...আমি কি? কিছুই না; আমি তো সর্বরকমেই কলুষিত; তোমাকে জীবন দিতে গিয়ে আরেকটা পাপে আর আমার কী আসে যায়!" কিন্তু এভাবে যে খৃস্টকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সে বলে, "তোমরা যে-মূল্য দিয়ে আমাকে তাঁর প্রাণ ক্রয় করতে বলচ, যদি আমি সে মূল্য দিই, তাহলে তিনি যা-কিছু চান, যা-কিছু ভালোবাসেন সবই ধ্বংস হবে...এই হচ্চে একমাত্র মৃত্যু যা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। এ মৃত্যু আমি তাঁকে দিতে পারব না।" তাই চারদিকের লোকেরা যখন মেডলীনকে খৃস্টের হত্যাকারিণী ব'লে ধিক্কার দিচ্ছে, তখনই মেডলীন তার পবিত্র প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, মানবাত্মার অন্তর্লোকের

চিরসুন্দর খৃস্টকে রক্ষা করচে, তাঁর ভৌতিক নশ্বর জীবনকে নয়। অন্তিম দৃশ্যে মেডলীনের নিষ্ক্রিয় নীরবতা কী তীব্র ও করুণ, তা মেটারলিঙ্ক আশ্চর্য নিপুনতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এর পরই মেটারলিঙ্ক *Blue Bird* নামে যে নাটক লেখেন তা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। জাতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী ও মেটারলিঙ্কের নীলপাখী একই ধরনের রূপকনাট্য। ফাল্গুনী যেমন মানব-প্রাণের বসন্তসন্ধান, চির নবীন সবুজপ্রাণের সন্ধান, নীলপাখীও তেমনি মানববুদ্ধির সাহায্যে আনন্দের অন্বেষণ। ফাল্গুনীর চরিত্রগুলি যেমন বিশেষ 'ব্যক্তি' নয়, তারা যেমন বিশ্বের বিশেষ বিশেষ সত্তার প্রতীকমাত্র, নীলপাখীর চরিত্রগুলিও এক-একটি জাতিগত সত্তার প্রতীকমাত্র। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে নীলপাখী বালক বালিকাদের উপযোগী একখানি ক্রিস্টমাসের সুন্দর স্বপ্ন মাত্র, অপর দিক দিয়ে এই নাটক পাঠকের নিকট একটি নিগূঢ় অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েচে। এই অর্থটি নাটকের প্রত্যেক চরিত্রের কথাবার্তা ও আচরণের মাঝ দিয়ে এমনি স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে যে এর কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয় না। বাহিরের গল্পরূপটি, ভিতরের তত্ত্বরূপের সঙ্গে এমন ক'রে মিশে গেছে যে চমৎকৃত হতে হয়। রূপকনাট্যের এমন আশ্চর্য সাফল্য বিশ্বসাহিত্যে আর কেউ অর্জন করতে পেরেচেন বলে মনে হয় না।

নাটকটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, এখানে শুধু এই নাটকের রূপকটি কি তাই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। নাটকের পরীটি হচ্ছে জীবন, এই জীবনের সাহায্যেই টিলটিল ও মিটিল (মানবাত্মার দুটি দিক) যাত্রা করে আনন্দের অন্বেষণে, হীরকখণ্ডটি হচ্ছে মানবের বুদ্ধিশক্তি পুরুষের মধ্যেই এর প্রাধান্য। এই শক্তির সাহায্যে মানুষ স্মৃতির দেশে যাত্রা করে, বস্তুজগতের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করে, বিশ্বরহস্যের অজস্র মিথ্যামূর্তিকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে, প্রাণিজগতের স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারে, নানা প্রকার আরাম ও আনন্দের রূপ দর্শন করতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি চালনা করতে পারে। আলোক চরিত্রটি হচ্ছে মানবের অন্তর্দৃষ্টি যার সহায়তা বিনা মননশক্তি পথ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে আমরা দেখতে পাই যে টিলটিল যথার্থ নীল পাখীটিকে নিয়ে আসতে পারল না। মানুষের যথার্থ আনন্দ এখনো রহস্যলোকে গোপন রয়ে গেছে, নাটকের এইটিই সিদ্ধান্ত।

প্রায় আট বৎসর পরে (১৯১৮) মেটারলিঙ্ক এই নাটকেরই উপসংহারস্বরূপ *Betrothal* নাটক রচনা করেন। মগ্নচৈতন্য সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা, পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানা আলোচনার ফলে মেটারলিঙ্ক মগ্নচৈতন্যের রহস্য দিয়েই মানবজীবনের বহু ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আবদ্ধ, তাই যে-কোনো একটি ঘটনার অন্তরে অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। যে-কোনো ব্যক্তির অন্তরসত্তায় তার অতীত অনন্ত পিতৃবংশ এবং তার ভাবী অনন্ত সন্ততিধারা বর্তমান। তাই মগ্নচেতনা-লোকে যাত্রা ক'রে মানুষ তার যথার্থ সম্ভাবনাটিকে জানতে পারলেই তার জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। এইসব তত্ত্বকেই মেটারলিঙ্ক অতি সুন্দরভাবে 'পাত্রীনির্বাচন' নাটকে রূপায়িত করে তুলেচেন। মানবজ্ঞানের ও অন্তর্দৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফলে ভবিষ্যতে মানবজীবনে অদৃষ্ট যে নিতান্ত শক্তিহীন হয়ে পড়বে নাটকে এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েচে।

৮

মেটারলিঙ্কীয় চিন্তার একটি মৌলিক প্রবৃত্তিই রহস্যানুসন্ধান। তাই মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর অপরিসীম ঔৎসুক্য নানালেখায় অভিব্যক্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপে থিওসোফিস্ট ও স্পিরিচুয়ালিস্ট সম্প্রদায় ভূতপ্রেত পরলোক জন্মান্তর ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন। 'আমাদের নিত্যতা' পুস্তকখানি মেটারলিঙ্কের এই ঔৎসুক্যেরই পরিণাম। আলোচনার ফলে মেটারলিঙ্ক অনেক আশ্চর্যজনক তথ্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যথাসম্ভব সতর্ক বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য যে মানবব্যক্তিত্বের একটা অবশেষ থেকে যায় এবং তার সঙ্গে যে বার্তালাপও চলতে পারে তা সত্য। কিন্তু এইসব মানবজীবনের বিলীয়মান অস্তিত্বের অন্তিম নিদর্শন অথবা কোনো নবজীবনের মাঝে প্রবেশোন্মুখ অবস্থার নিদর্শন, তার কোনো নিশ্চয়তাই পাওয়া যায় নি। মেটারলিঙ্ক মনে করেন যে প্রেতাত্মা পরলোক ও জন্মান্তর ইত্যাদির মীমাংসা হয়ত মানুষের মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই নিহিত আছে। তাঁর বিশ্বাস যে এই সচেতন আমির পশ্চাতে একটি মগ্নচেতন আমি আছে যা অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। *Unknown Guest* (১৯১৫) নামক পুস্তকে মেটারলিঙ্ক এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আশাবাদী মেটারলিঙ্ক বার বার এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানুষ অসীমেরই একটি অংশমাত্র। সুতরাং অসীম যখন কখনো আপনার মধ্যে অসীম দুঃখকে নিয়ে থাকতে পারে না তখন অসীমের স্বরূপ আনন্দময় হতে বাধ্য; তাই মানবের ভবিষ্যৎও কখনো দুঃখময় হতে পারে না। *The Wrack of the Storm* (১৯১৬) বইখানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রবন্ধসমষ্টি; এসব লেখার মধ্যে বেলজিয়মের অসাধারণ আত্মত্যাগ ইত্যাদির বর্ণনা করে মেটারলিঙ্ক এই সত্যটিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেচেন যে মানবজাতির মধ্যে পশুসুলভ স্বার্থপরতা ও নৃশংসতা তেমনি উগ্র থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিশ্বকল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ ব্যাকুলতারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই ওই মহাধ্বংসের অবসানে, এই বিপুল কল্যাণশক্তিই যে প্রাণের প্রাচুর্যে আবার দিকে দিকে বিকশিত হয়ে উঠে মহাশ্মশানের বিকট শূন্যতাকে আনন্দসংগীতে ভরে তুলবে এ বিশ্বাস আজও তাঁকে আশাবাদী ভবিষ্যপ্রেমিক করে রেখেচে। *Mountain Paths* (১৯১৯) বইখানির মাঝেও মেটারলিঙ্ক মৃত্যু, বংশানুক্রম, জন্মান্তর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেতাত্মার লোকান্তরিত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হতে পারলেও জীবিতের মগ্নচেতনায় মৃতের অস্তিত্ব আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান থাকে বলে মেটারলিঙ্ক মনে করেন। মেটারলিঙ্ক যুক্তির সাহায্যে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন যে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে চিরতরে বাঁধা, তাই অতীতের সমস্তই যেমন বর্তমান জীবনের মধ্যে সঞ্চিত ও সঞ্জীবিত হয়ে আছে তেমনি যা কিছু ভাবী তা এই বর্তমানকে আন্দোলিত করছে। মানুষের পূর্বজ জীবের মধ্যে যেমন মানুষের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, বর্তমানের মধ্যেও তেমনি ভাবীকালের সমস্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই জীবনধারার বর্তমান গতি শুধু অতীত জীবনের সঞ্চিত প্রেরণারই রূপ নয়, তার মধ্যে অসীম ভবিষ্যতের শক্তিরও প্রেরণা বিদ্যমান।

পার্বত্যপথের অধিকাংশ রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের প্রতি, বিশেষত হিন্দু দর্শনের প্রতি মেটারলিঙ্ক সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করেছেন। 'পরম রহস্য' (১৯২২)

পুস্তকের 'ভারত' অধ্যায়টিতে এ কথা আরো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই পুস্তকে তিনি ভারতীয় প্রাচীন অধ্যাত্ম বিদ্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং একথা স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষ একদিন বুদ্ধির আশ্চর্য বিকাশের দ্বারাই নানা গভীর সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানকালের metapsychistগণ বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে যে গবেষণা আরম্ভ করেছেন তার ফলে মানবজাতি যে প্রাচীন অধ্যাত্মবাদীদের হারানো জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করে আরো গভীরতর জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করবেন মেটারলিঙ্ক এই পুস্তকে সেই আশাই ব্যক্ত করেছেন।

৯

'পার্বত্য পথে' 'বীরত্রয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়মের নানাস্থানে জার্মানি যে ভীষণ হৃদয়হীন উন্মত্ত হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করছিল তার মধ্যে তিনটি বেলজিয়মবাসী যে-আশ্চর্য আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেখায় এ প্রবন্ধে তাই বর্ণিত হয়েছে। *Burgomaster of Stilemonde* (১৯১৮) নাটকখানি উক্ত ঐতিহাসিক সত্যকে আশ্রয় করেই রচিত হয়েছে। এই নাটকের মধ্যে একদিক দিয়ে জার্মানির নৃশংস যুদ্ধনীতির অমানুষিক বীভৎসতা ফুটে উঠেছে, অপর দিক দিয়ে বর্গোমাস্টারের মধ্যে মেটারলিঙ্কেরই নৈতিক আদর্শ ও জীবনের প্রতি কতকটা আসক্তিহীন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচঞ্চল ঔদাসীন্য এবং চিত্তের নৈতিক আদর্শটিকে মৃত্যুর সমুখেও অতি সহজ অবিচলতার সঙ্গে স্বীকার করার শক্তি— এই দুটি বস্তুই বর্গোমাস্টারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বর্গোমাস্টার নাটকের ক্রটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। এই নাটকে বর্গোমাস্টারের এত বড় ত্যাগের মহিমাটি সুপ্রত্যক্ষ না হওয়ার আসল কারণ এই যে বর্গোমাস্টারের জীবনের বিকাশ ও সংগ্রামকে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয় নি। কোনো মহৎ চরিত্রের মূল্য এবং মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে হলে তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। এই নাটকের আত্মত্যাগটি যেন শুষ্ক কর্তব্যবোধের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, হৃদয়ের ক্ষেত্রে যে এর একটি সত্যকার ব্যথানন্দময় রসমূর্তি আছে তা এই নাটকের মধ্যে ফুটে ওঠে নি বলেই মনে হয়।

The Cloud that Lifted (১৯২৯) নাটকখানিকে এদিক দিয়ে মেটারলিঙ্কের একটি সুন্দর এবং সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে। মেটারলিঙ্ক পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডায়, এগ্লাভেন ও সেলীসেটের স্বপ্নলোকে প্রেমের যে অপূর্ব রসমূর্তির অনুসন্ধান করেছিলেন, এবার মেটারলিঙ্ক সেই রসমূর্তিকে একেবারে রক্তে-মাংসে গড়ে তুলে বাস্তবলোকের মধ্যে সত্য করে তুলেচেন। পূর্বেকার রহস্যরচনায় মেটারলিঙ্ক যে-গভীর জীবনের সন্ধান করেচেন, সেই উন্নততর গভীরতর নৈতিক জীবনের রসময় প্রকাশ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েচে মেঘাপসরণে। স্বপ্নলোকের যাত্রা যেন অবশেষে বাস্তবলোকে এসে পরিসমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব নাট্যের মাঝ দিয়ে জীবনের ট্র্যাজিডিকে এমনভাবে মেটারলিঙ্ক আর কোথাও দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ঘটনাসমাবেশের অপূর্ব কৌশলের সাহায্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তঃসত্ত্বাতটিকে মেটারলিঙ্ক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং মেটারলিঙ্কীয় নাটকের উচ্চতর ট্র্যাজিডিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেচে।

The Power of the Dead (১৯২৩) নাটকখানি কিন্তু অন্য ধরনের। মেটারলিঙ্ক আধুনিক মনস্তত্ত্বের

মগ্নচেতনা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা নিবন্ধে আলোচনা করেছেন এবং সেই সম্বন্ধে একটা মতবাদও গড়ে তুলেচেন। তাঁর বক্তব্য এই যে আমাদের মগ্নচেতনার জগতে প্রতিনিয়ত পূর্বজগণের কল্যাণেচ্ছার সঙ্গে আমাদের স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনার একটা সংগ্রাম চলেচে। 'মৃতের দাবী' নাটকে যেন এই তত্ত্বটিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েচে। নাটকটির মধ্যে একটি নিদ্রিত যুবকের স্বপ্নকেই রূপায়িত করে তোলা হয়েচে এবং তার বাস্তবজীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম অন্তর্জগতে মগ্নচেতনায় যে আলোড়ন তুলেচে তাকে নাট্যকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত এ নাটকখানিকে আমরা পাত্রীনির্বাচনের বাস্তব সংস্করণ বলে ধরে নিতে পারি, কারণ মূলত উভয়ের সমস্যাই এক। মেটারলিঙ্ক এর মাঝ দিয়ে একটি মতবাদকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচেন বলে নাটকখানির রচনাকৌশল খুবই উপভোগ্য হলেও এ থেকে যথার্থ নাটকের আনন্দ পাওয়া যায় না।

১০

মেটারলিঙ্কের শেষদিককার বিশ-বাইশ বৎসরের রচনাবলী অধ্যয়ন করবার এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগসুবিধা না হওয়ায় সে সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না। এ পর্যন্ত যেসব পুস্তকের আলোচনা করা হয়েচে, তারপর মেটারলিঙ্কের 'প্রাচীন মিশর' (১৯২৫), 'উইপোকার জীবন' এবং 'আকাশের জীবন' (১৯২৮) শীর্ষক তিনখানি বই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। মিশর সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষে দেখতে পাই যে মিশরের সভ্যতার আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে তেমন বিস্ময়বোধ আর তাঁকে বিহ্বল করচে না, যদিও ইতিপূর্বে মিশরের সভ্যতার সম্বন্ধেও তিনি অনেক বিষয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেচেন। 'উইপোকার জীবন' বইখানিও নাকি মক্ষিকাজীবনের মতই পর্যবেক্ষণপূর্ণ গবেষণা হলেও, অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত। বইখানি পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। 'আকাশের জীবন' বইখানির মধ্যে আধুনিকতম আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক আলোচনা করা হয়েছে এবং সাধারণের বোধগম্য না হলেও এই দার্শনিক আলোচনায় মেটারলিঙ্কের গভীর মনীষা ফুটে উঠেচে। মনে হয় শেষজীবনে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই মেটারলিঙ্ক নিমগ্ন ছিলেন। এর পর তিনি আর কোনো নাটক রচনা করে গেছেন কি না তা লেখকের ঠিক জানা নেই।

[বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই মরিস মেটারলিঙ্কের সাহিত্যসাধনার প্রতি বাংলার যুবক সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচকের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়, এবং তার নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত নাটক "দৃষ্টিহারা," প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬; অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত "দৃষ্টিহারা," তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; "মেটারলিঙ্ক," তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২০; "আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি," প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ইত্যাদি, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত "মেটার্লিঙ্কের বাণী," তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৩২০; সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত নাটক "পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা," প্রবাসী, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩২১; ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের কবিতারও অনুবাদ করেন ("শীতের হাহাকার," "চোখের চাহনি," মণিমঞ্জুষা, ১৩২২)। ব্লু বার্ড-এরও একাধিক অনুবাদ (অনুবাদক শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক দীর্ঘকাল মেটারলিঙ্কের সমগ্র রচনাবলী অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থেকে ১৩৩২-৩৩ সালের প্রবাসীতে 'মেটারলিঙ্কের নাটক' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন; ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গবাণী ও ১৩৩৮-৩৯ উত্তরাতে মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭ - ১৯১৯

ঔপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের বিশেষ গুণ কি, আবার তাহার দোষই বা কি—রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে চরিত্র-স্জনে, গ্রাম্য পরিবেশকে সমবেদনার আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে, ঘটনাপ্রবাহ ও নরনারীর জীবনের উপরে কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরসের কিরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে শিবনাথের জুড়ি নাই। আর তাঁহার দোষ—রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শোনা যাক— "…এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। …গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। ঘটনাপ্রবাহের নশিপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তর উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।" উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই— আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি।……কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া একসঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।" খুব সম্ভব এই আক্ষেপ মিটাইবার আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে ভারতীর জন্য লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"এক্ষণে অবসরমতো ভারতীর জন্য কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।" পূর্বোক্ত সমালোচনা এবং বর্তমান পত্র দুই-ই ১৩০৫ সালে লিখিত।

এখন, শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তর সম্বন্ধীয় মন্তব্য মনে রাখা আবশ্যক— আর তাহা মনে রাখিয়াই আমরা অগ্রসর হইব। তাঁহার প্রধান বক্তব্য দুটি, প্রথমত শিবনাথের মতো সহৃদয়তাপূর্ণ চরিত্র-সৃষ্টিক্ষমতা বিরল; দ্বিতীয়ত আপনার অজ্ঞাতসারে ঔপন্যাসিক শিবনাথ কখন যেন ঐতিহাসিক ও নীতিপ্রচারক হইয়া ওঠেন, এবং তাহার ফলে উপন্যাসের অখণ্ডতা নষ্ট হইয়া যায়। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শিবনাথের সাহিত্যবুদ্ধিকে অধিকতর

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭ - ১৯১৯

চিত্রাধিকারিণী শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্যের সৌজন্যে
শশিকুমার হেস অঙ্কিত চিত্র
শ্রীপরিমল গোস্বামী গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

সজাগ করিয়া দিয়াছিল, কারণ তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যুগান্তরে অনুষ্ঠিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে। যুগান্তর উপন্যাস বাস্তবিকই যেন দুইখানি পৃথক গ্রন্থের সমবায়— একখানি ঔপন্যাসিকের রচনা, একখানি নীতিপ্রচারকের রচনা। শিবনাথের পরবর্তী উপন্যাস তিনখানিতে (বিধবার ছেলে ও উমাকান্তকে একখানা বলিয়া ধরিলে দুইখানা উপন্যাস) এই ত্রুটি বর্জিত হইয়াছে। এগুলির শিল্পগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, গল্পের ধারাও অবিকল আছে। নীতিপ্রচারক নিজেকে কিছুটা যেন সংযত করিয়াছেন, আগের মতো তিনি আর তেমন করিয়া ঔপন্যাসিকের কলমটা কাড়িয়া লন নাই। কাজেই দেখিতে পাই যুগান্তরের প্রধান ত্রুটি হইতে পরবর্তী বইতিনখানা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আর-এক সংকট ঘটিয়াছে। শিবনাথের মধ্যে তিনটি সত্তা ছিল, ঔপন্যাসিক, নীতিপ্রচারক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলি নীতিপ্রচারকের কলমের খোঁচা হইতে অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া গেলেও ঐতিহাসিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে শিবনাথের গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ইতিহাসে পরিণত হয়— এ অভিযোগ হইতে তিনি সম্পূর্ণ রেহাই পান নাই। রবীন্দ্রনাথের অপর অভিযোগ শিবনাথের গল্পের আনন্দনিকেতন কখন্ যেন পাঠশালা হইয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী উপন্যাসগুলি অবশ্য ঠিক পাঠশালা হয় নাই— কিন্তু পাঠশালার নীতিপ্রচারকের পক্ষে একেবারে স্বভাববর্জন সম্ভব নয়— তাঁহার স্বভাবের কিছু রেশ রহিয়া যাইবেই। তাই বলা চলে যে যুগান্তরে যিনি ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয় পরবর্তী উপন্যাসে আসিয়া তিনি হইয়াছেন ছুটির সময়ের গুরুমহাশয়। অবকাশযাপনের গুরু যতই নীচু হোন, একেবারে অগুরু হইতে পারেন না, তবে প্রভেদটা দেখি এই যে যিনি পাঠশালার আটচালাতে নামতা পড়াইতেছিলেন এখন তিনি ছায়ঢালা আমবাগানে বসিয়া গল্পের আসর জমাইয়াছেন। গল্পের আসর, তবে সে গল্প গুরুমহাশয়কথিত; যতই মনোহর হোক না কেন, তবু তাহা শেষ পর্যন্ত নীতিবাদের ফ্রেমে বাঁধানো। শিল্পের দাবিতে গল্পের যতদূর যাওয়া দরকার, নীতির দাবীতে তাহাকে অনেক সময়েই ততদূর যাইতে দেওয়া হয় নাই। ইহাকেই বলিতেছি গুরুমহাশয়ের গল্প— তবে রক্ষা এই যে পাঠশালার এখন ছুটি, পাঠশালা চলিতে থাকিলে তাঁহাকে গল্প বলিবার অনুরোধ করিতে ভরসা পাইত কে? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইঙ্গিতের ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক শিবনাথের যুগান্তর-পরবর্তী উপন্যাসগুলি শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে অধিকতর নিখুঁৎ। কিন্তু তেমনি আবার যুগান্তরের সরস, প্রাণময় নরনারীরও দেখা পাই না পরের গল্পগুলিতে।

২

যুগান্তর শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম উপন্যাস নয়— কিন্তু প্রথমেই যে তাহার উল্লেখ করিলাম তার একাধিক কারণ। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পূর্বসূত্র একটা কারণ। আরও কারণ এই যে এক হিসাবে শিবনাথের সমস্তগুলি উপন্যাসেরই যুগান্তর নামকরণ চলিতে পারে। বাঙালীসমাজের একটা যুগান্তর-পর্বকে উপন্যাসসমূহের ঘটনার কাল বলিয়া তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-লেখকের পক্ষে ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়াছে, তখন আর সভ্য হইবার দুরাশায় খৃস্টান ধর্ম কেহ গ্রহণ করে

না, বা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখিবার সংকল্পও পোষণ করে না। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করিয়া যে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে বাঙালী লেখকগণ তখন সে আশাও পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন আমাদের সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর। অক্ষয় দত্ত তখন বালীর বাগানে বাস করিতেছেন। তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইয়া একটি-দুটি বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সে সময়ে হিন্দুসমাজের কোনো লোক কোনো সংস্কারবর্জন করিলেই সকলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিত। ওদিকে আবার বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির কৃপায় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি আবার ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ায় একদল শিক্ষিত হিন্দু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়টা তখন যুগান্তর ছিল। বর্তমানে আমরা যেসব সুফল ও কুফল ভোগ করিতেছি তখন তাহাদের কারণ ঘটিতেছিল। এই সময়টাকে শিবনাথ ভালো করিয়া জানিতেন, প্রধানত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন, তিনি সেই সময়ের লোক, তাহা ছাড়া সেই যুগনাট্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন, আর যেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত ছিল— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের লেখক হিসাবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব ছিল না। এই সময়টাকে তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, সকল লেখকই সুবিধামতো সময় বাছিয়া লয়। কাজেই দেখিতে পাই তাঁহার সবগুলি উপন্যাসেই যুগান্তরের হাওয়া বহমান।

"ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে ধুধূপের ন্যায় মধুসূদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সমবেত হইয়া রঙ্গকাব্যের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ দেখা দিল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বৎসর। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ অলংকার বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইবে। এই বৎসরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মেলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক দলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানাস্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিল। এই সকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন— পঞ্চু, এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্ম সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল।" —যুগান্তর

"উমাকান্ত আসিয়াই তাঁহার আদর্শ পুরুষ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তিনবার দেখা করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু তখন গঙ্গার সন্নিকটস্থ বালীগ্রামে একটি উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিলেন। উমাকান্ত সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, একজন কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল, উদারচেতা মানুষ জীবনের অবসানকাল কিরূপে যাপন করিতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে তিন দিন আলাপ হইয়াছে সে তিন দিন সমুদায় কেবল নব নব জ্ঞানের কথাতে অতিবাহিত হইয়াছে।...তৎপরে দত্তজা মহাশয় নিজের অর্ধলিখিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকার কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছেন।...গড়ের উপরে অক্ষয়বাবুকে দেখিয়া তাঁহার আদর্শ, চিন্তাশীল পুরুষের ভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই;...কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ধোঁকা লাগিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের দিন অপরাপর কথার মধ্যে অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন, আমি যখন বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ লিখি, তখন আমার যে জ্ঞান ছিল না, এখন সে জ্ঞান হইয়াছে, আমি দেখিতেছি যে, ইউরোপীয়দের ন্যায় মানসিক শ্রম করিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় থাকিতে হইবে।" —উমাকান্ত

আবার—

"অক্ষয়বাবু অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত উমাকান্তের ঘনিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছিলেন।"

—তদেব

অন্যত্র—

"উমাকান্ত রাজারামবাবুর সুপারিশপত্র লইয়া পাবলিক লাইব্রেরি লাইব্রেরিয়ান বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইয়াছেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।" —তদেব

পুনশ্চ—

"শ্যামাকান্ত কেবলমাত্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, গীতার একটি নূতন এডিশন বাহির করেন, এবং 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম' নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।...ইহার পরে তিনি নিজে এক বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিলেন এবং বহুদিনের পরে কোশাকুশি লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক আরম্ভ করিলেন।" —তদেব

শিবনাথের উপন্যাসের আবহাওয়া বুঝিবার পক্ষে উদ্ধৃত অংশগুলি সাহায্য করিবে। উপরের অংশগুলিকে ইতিহাস বলা চলে— এখন এই ইতিহাস উপন্যাসকে কিভাবে সংক্রামিত বা প্রভাবিত করিয়াছে দেখা যাক্।

এই ঐতিহাসিক যুগান্তরের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মনের উপরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিতেছিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিতেছিল একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, কারণ নামতঃ ব্রাহ্ম না হইয়াও অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কারের ও জীবনসংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উমাকান্ত উপন্যাসের উমাকান্তকে লওয়া যাইতে পারে। সে গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান, তাহাকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বলিবার উপায় নাই— কিন্তু সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যখন ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করে নাই এবং বিধবাবিবাহ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। শেষের কাজটিতে পাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব। উমাকান্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। শিবনাথের উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলির অনেকেই উমাকান্তের ছাঁচে ঢালাই করা। নয়নতারা উপন্যাসের কালীপদ রায় এই ছাঁচে গড়া লোক।

উমাকান্ত উপন্যাসের অন্যতম নায়ক নরেশ একটি অনুতপ্ত পতিতাকে বিবাহ করিয়াছে, এবিষয়ে উমাকান্ত তাহার প্রধান সহায়। আবার চারু, সে-ও উক্ত গ্রন্থের অন্যতম ব্যক্তি, একটি বিধবা বিবাহ করিয়াছে— বলা বাহুল্য উমাকান্ত তাহারও প্রধান সহায়। যে-কালে দুর্গামোহন দাস আপন বিমাতার বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন, খোদ শিবনাথ পঠদ্দশাতেই সহপাঠী যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত বিধবা-বিবাহের কর্তা সাজিয়াছিলেন— এবং অমিতকর্মী বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছিলেন— সেকালের ঘটনা লিখিতে বসিলে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? উপায় না থাকিলেও কাজটি বড় সহজ ছিল না, বাস্তবে তো বটেই এমন কি উপন্যাসেও। শিবনাথের প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ,' তাহাতে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিধবাবিবাহ ঘটাইবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখক শেষ পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই। পরবর্তী উপন্যাস যুগান্তরে ও 'উমাকান্তে' এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 'উমাকান্ত'র উপরে অক্ষয় দত্তর প্রভাবের বিষয় আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

সে সময়ে আর-একটি প্রভাব অনেকের মনে পড়িয়াছিল— সে হইতেছে জ্ঞানবাদের পরিণাম-জাত সংশয়বাদের প্রভাব। উমাকান্ত উপন্যাসের যে অন্যতম নায়ক নরেশের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহাকে প্রথমে দেখি সংশয়ীরূপে। সে সংশয়বাদ-ঘেঁষা শিক্ষিত লোক, আমিষ আহার করাই যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতির বিধান ইহাই তাহার বিশ্বাস; পরিমিত সুরা পান এবং বাইনাচ দেখা অকর্তব্য নয়— ইহাও সে প্রমাণ করিতে চায়। এ বিষয়ে বন্ধু উমাকান্তর সঙ্গে তাহার মতে মেলে না— অথচ সে নিজে সুরাপায়ী বা দুশ্চরিত্র নয়— সে গম্ভীর প্রকৃতির বিবেচনাশীল ব্যক্তি। নরেশ-চরিত্র তখনকার শিক্ষিত সমাজের একটি টাইপ, যেমন একটি টাইপ উমাকান্ত নিজে। আর-একটি টাইপ হইতেছে উমাকান্তর ভাই শ্যামাকান্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে বৈজ্ঞানিক হিন্দু, নিজে বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিয়াছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিয়াছে— রবীন্দ্রনাথ এই টাইপ-এর কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

"পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্‌শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।"

এটা বোধ করি শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবের ফলে। শ্যামাকান্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দু হইলেও,

কিম্বা খুব সম্ভব হইবার ফলেই সুরা পান করে, বাইনাচ প্রভৃতি দেখে, প্রথমা পত্নী থাকিতেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে— কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়— সে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকে।

শিবনাথ স্পষ্টত নূতন হাওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন পন্থা বা প্রাচীনপন্থীগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হইতে পারে যে শ্রদ্ধার অভাব হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে এবং পিতা হরানন্দকে যে দেখিয়াছে, প্রাচীন পন্থার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা হইতেই পারে না। নয়নতারার বিদ্যার্ণব, এবং উমাকান্ত উপন্যাসের রামগতি প্রাচীন পন্থার প্রতিনিধি, তাহাদের প্রতি পাঠকের যে শ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ লেখকের নিজেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

যুগান্তরের হাওয়ায় সমাজে যেমন নূতন টাইপ দেখা দিতেছিল তেমনি ঘটনাস্রোতও অপ্রত্যাশিত পথে চলিতেছিল। যুগান্তর উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুখানি স্বতন্ত্র উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে তাহার কারণ ইহাই। একদিকে নশিপুরের প্রাচীন সমাজ আর একদিকে কলিকাতায় নবীন সমাজ— নশিপুরের জীবনপ্রবাহ কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া পূর্বতন পথচিহ্ন হারাইয়া ফেলিয়াছে। শিবনাথের সৃষ্টি আরও শক্তিসম্পন্ন হইলে তিনি এই দুই বিরুদ্ধমুখী স্রোতের মধ্যে নৌকাকে ফেলিয়াও তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন— কিন্তু যথাযথ শক্তির অভাবে তাহা হইয়া ওঠে নাই, নশিপুরের সুন্দর নৌকাখানি শেষ পর্যন্ত বানচাল হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের কারণ রহিয়াছে তখনকার সামাজিক হাওয়ার এলোমেলো গতির মধ্যে।

শিবনাথের উপন্যাসের আর্থিক কাঠামো স্মরণ করিলে মন ঈর্ষায় ভরিয়া ওঠে— ইহার উপরেও তৎকালের ছাপ মারা। তখন কোনো রকমে একটা পাশ করিলেই চাকুরি জুটিত, পাশ করিতে না পারিলেও চাকুরির অভাব হইত না। উমাকান্ত পাশ-করা লোক নয়, গ্রামের পাঠশালায় পাঁচ টাকা বেতনে তাহার জীবনের সূত্রপাত তাহাকে দেখিতে পাই ৬০০৲ টাকা বেতনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া পেন্সন লইতেছে। তখন যে কেবল শহরে আসিলেই চাকুরি জুটিত এমন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট সুদূর গ্রামে নিজের চাপরাশি পাঠাইয়া দিয়া উমেদারকে খুঁজিয়া বাহির করিত। শিবনাথের উপন্যাসে যা-কিছু দারিদ্র্য তাহা পল্লীসমাজে, শহরের সমাজে, অর্থাৎ শহরের শিক্ষিত সমাজে দারিদ্র্যের বড় চিহ্ন নাই, আর থাকিলেও তাহা ক্ষণিক, কারণ আজ যে দরিদ্র, কাল সকালবেলাকার গেজেটে তাহার চাকুরি ঘোষিত হইতে পারে, কিংবা তেমন বরাত-জোর থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেটের চাপরাশি আসিয়াও দরজার কড়া নাড়িয়া উমেদারের ঘুম ভাঙাইতে পারে। কিন্তু অনেকদিন হইল সুলভ চাকুরির সে সত্যযুগ অপসৃত। এখন সে-সব কথাকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব মনে হয়।

৩

ঔপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রধান গুণ চরিত্রসৃষ্টিতে। চরিত্রসৃষ্টি দুই উপায়ে হইতে পারে, পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা, আর কল্পনাশক্তির দ্বারা। দুইয়েরই জন্য প্রচুর সমবেদনার আবশ্যক। সমবেদনাজাত পর্যবেক্ষণশক্তির বলেই শিবনাথ চরিত্রসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য, সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁহার সমবেদনা? যে-সব নরনারী নূতন জীবনপন্থাকে সার্থকভাবে গ্রহণ

করিতে পারিয়াছে তাহাদের প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল, আবার যাহারা প্রাচীন পন্থাকে নিষ্ঠার সহিত আঁকড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রতিও লেখকের যথেষ্ট সহানুভূতি। কেবল যাঁহারা মধ্যবর্তী, নূতন শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে পারে নাই, আবার পুরাতন ধারাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে লেখক তাহাদের দেখিতে পারেন না। দৃষ্টান্তচ্ছলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যুগান্তরের বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে; নূতন ধারার সার্থক গ্রহীতাদের অনেকেরই নাম করা যায়। নূতন ধারার নরনারীর সঙ্গেই লেখকের সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন ধারার সার্থক গ্রহীতাগণও যে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই, তাহাতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শিবনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

শিবনাথের অঙ্কিত নরনারীর মধ্যে নারীচরিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও সার্থক। ইহার প্রধান কারণ নারীচরিত্রে নিষ্ঠা ও আদর্শবাদপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। 'পতি-দেবতা' ভাবটির বাড়াবাড়ি হয়তো ভালো নয়। কিন্তু 'পতি-দেবতা' ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই এদেশের নারী-সমাজ নিজেদের অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠার চর্চা করিয়া আসিয়াছে। সেই নিষ্ঠা ঘটনাচক্রের অনুরোধে যে ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছে— সেই ভাবটিই নারীর চরিত্রে 'পতি-দেবতা'র বিকল্প হইয়া সজীব হইয়া তাহাকে এমন একপ্রকার দৃঢ়তা দিয়াছে, পুরুষচরিত্রে যাহার অনুরূপ পাওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্থল 'নয়নতারা'। নয়নতারা নূতন ধারার অন্তর্গত নারীচরিত্র। তাহার আচরণ ও কথাবার্তায় কোথাও কোথাও নীতিগ্রন্থের গন্ধ থাকিলেও — শিবনাথের উপন্যাসে অনেকস্থলেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে— সে একান্ত সজীব ও বাস্তব। শেষ পর্যন্ত তাহার বিবাহ যখন ভাঙিয়া গেল, সে নিজে ভাঙিয়া পড়িল না; মহত্তর জীবনের আদর্শকে অপ্রাপ্য প্রণয়ীর আদর্শরূপের সহিত মিলাইয়া লইয়া একক জীবন যাপন করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল। তাহার দুঃখে পাঠকের সহানুভূতি হয়, আবার তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মে।

শিশু ও বালক-বালিকা চরিত্র অঙ্কনেও লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। এত বালকবালিকার চরিত্রসৃষ্টি অল্প বাঙালী লেখকেই করিয়াছে। ইহারা নবীন ও প্রাচীন দুই ধারারই বাহিরে; কোনো বিশেষ মতের অনুরোধে নয়, কেবল মানবচরিত্রের আকর্ষণেই সার্থক বালকবালিকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়।

শিবনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার সহানুভূতি কেবল মানবসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়— পশুপাখীর প্রতিও তাঁহার দরদ গভীর। কুকুর, বিড়াল, খরগোস, টিয়া, ময়না, হরিণ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীকে এমন সহৃদয়তার সহিত দেখিয়াছেন যে তেমন আর কোনো বাংলা লেখকের রচনায় দেখিতে পাই না। তাঁহার সমবেদনাগুণের সহকারী গুণ হাস্যরস। হাস্যরসের চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন— তাহাতে পথের দূরত্ব কমে নাই বটে, কিন্তু পথ চলার কাজটা অনেক সহজ হইয়াছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে শিবনাথের প্রধান ত্রুটি এই যে চরিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা তাঁহার যেমন প্রচুর, গল্প-গ্রন্থন বা প্লট-সৃষ্টির ক্ষমতা তেমনি অল্প, সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই। অনেক সময়েই গল্পের মূলধারাকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চরিত্র ব্যাখ্যা, নয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে বসেন। এই রকম একটি অনবধানতার সুযোগেই যুগান্তর-কাহিনী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কাহিনী নরনারীর চরিত্র-

বেগে অগ্রসর হইতে জানে না, তাই লেখককে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মতবাদের শুষ্ক ডাঙায় ঠেকিয়া যাওয়া কাহিনীকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে হয়— তবে সব সময়েই যে এমন ঘটিয়াছে তাহা নয়।

আর-একটি ত্রুটি, যে-সব ঘটনার বিবরণ তিনি শুনিয়াছেন বা যে-সব বাস্তব লোক দেখিয়াছেন তাহাদের অনেকগুলিকেই শিল্পসম্মত উপায়ে সংশোধিত করিয়া না লইয়াই কাহিনীর অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন— এমন প্রক্রিয়া ইতিহাসরচনায় চলিতে পারে, উপন্যাসরচনায় চলা উচিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে শিবনাথের রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নটিতে আসিয়া পড়িলাম। শিবনাথ স্বভাবত ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক নহেন। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। তাঁহার উপন্যাসগুলিও নামান্তরে সামাজিক ইতিহাস— এগুলিতে ঔপন্যাসিকের ও ঐতিহাসিকের যুগল দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তাঁহার লেখনী দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব না থাকায় তাহা স্বাধীনভাবে স্বকার্যসাধন করিতে পারিয়াছে। আর যে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, যে হাস্যরস তাঁহার সহজাত, সে দুটি গুণও উক্ত গ্রন্থে কাজে লাগিয়া গিয়া এমন এক একনিষ্ঠ সার্থকতা লাভ করিয়াছে উপন্যাসে যাহা বিরল।

তাঁহার সবগুলি উপন্যাসই 'রামতনু লাহিড়ী'র আগে লিখিত। বিধবার ছেলে ও তাহার বিকল্প উমাকান্ত পরে প্রকাশিত হইলেও লিখিত হইয়াছে আগে। তাই মনে হয় যে তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলি তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের খসড়া। সেই কারণেই বোধ করি সামাজিক ইতিহাসখানা লিখিবার পরে তিনি আর সামাজিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাহিনী ও ইতিহাসের জোড় মিলাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিছক ইতিহাসরচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন— তখন তাঁহার কলম আর উপন্যাসরচনার পথে ফিরিতে চাহে নাই। ঔপন্যাসিক শিবনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা 'রামতনু লাহিড়ী'— ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার সত্য মিলিত হইয়া ইহাকে বাংলাসাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য

পৃথিবীতে বহু সত্যকার প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে সাহিত্য-জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বাংলাদেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে এই আত্মদান চরমে উঠিয়াছে। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গভারতীর সেবা করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পমালা' এবং উপন্যাস 'মেজবৌ'-'যুগান্তরে'ই পাই। সাহিত্যিকের হাতে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধও যে কতখানি সরস ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, তাঁহার 'ধর্ম্মজীবনে' তাহারও প্রমাণ আছে। মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

অন্যতম দিক্‌পাল মাত্র ছিলেন না, বাংলা-সাহিত্যেরও এক জন দিক্‌পাল ছিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' তাঁহার সেই পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সকল রচনার মধ্যে তাঁহার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সহজ অনাড়ম্বর জীবন তাঁহার আদর্শ ছিল এবং তিনি নিজে সত্যই "ছোট ঘরে বড় মন" লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। পরাধীনতার গভীর বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, তাঁহার অধিকাংশ কাব্যে এই বেদনার পরিচয় আছে।

শিবনাথের জন্ম ১৮৪৭, ৩১এ জানুয়ারি; মৃত্যু ১৯১৯, ৩০এ সেপ্টেম্বর। শৈশবাবধি তিনি মাতৃভাষার অনুরক্ত সেবক; যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র' তখন হইতেই মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' ও প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা লিখিতেন। ১৮৬৮ সনের শেষে, কুড়ি বৎসর বয়সকালে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডকাব্যখানি সম্বন্ধে তিনি 'আত্মচরিতে' এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রকাশিত হইবামাত্র উহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়। তদনুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম।··· ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্ত্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্ত্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।" শিবনাথের দ্বিতীয় পুস্তকও একখানি কাব্য— 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫ সন)। হৃদয় তখন যৌবন-জোয়ারে উদ্বেলিত, তিনি মনের আবেগে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন, "আমার রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।"

উপন্যাস-সাহিত্যভাণ্ডারেও শিবনাথের দান অসামান্য। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'মেজবৌ' (ইং ১৮৮০) সামাজিক চিত্র হিসাবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত 'স্বর্ণলতা'র পরেই স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'যুগান্তর' (ইং ১৮৯৫); 'সাধনা'য় সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।"

শিবনাথ বহু সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভেরও রচয়িতা। 'প্রবন্ধাবলি' পুস্তকে তাঁহার লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন।

জীবনী রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁহার রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত' বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌রূপে চিরদিন গণ্য হইবে।

এক কথায়, শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক।

পিতার রচনা সম্বন্ধে হেমলতা দেবী কয়েকটি বড় খাঁটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন; উহা প্রণিধানযোগ্য—

"একদিন পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হায় কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব্ব হইল।

এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।' যথার্থই তাহা হইয়াছিল। শিবনাথ ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন যে 'লেখনী চালনা করিয়াও যদি অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলেও সেই লেখার ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব।'...তাঁর কবিত্ব যে কারণে খর্ব্ব হইতেছিল, ঠিক সেই কারণে উপন্যাসের সৌন্দর্য্যও খর্ব্ব হইতে লাগিল, অর্থাৎ—পাঠকের হৃদয়ে ধর্ম্মানুগত আদর্শ জীবন যাপনের বাসনা যাতে প্রবল হয় এই উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নরহিতৈষণা তাঁকে চিত্রকরের সুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল।"*

বর্ত্তমান কালের পাঠককে বাংলা-সাহিত্যে শিবনাথের দান সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত।

১। **নির্ব্বাসিতের বিলাপ** (খণ্ডকাব্য)। ইং ১৮৬৮ (১৪ ডিসেম্বর)। পৃ ১০৮।

"এতদিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। 'নির্ব্বাসিতের বিলাপের' জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র-সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চিরজীবনের মত নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল ; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম। আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট অংশ চাহিলেন। তাঁহার মত লোকের সন্তোষ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত লিখিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলাম।...কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। সংবৎ ১৯২৫ ৩০এ অগ্রহায়ণ।"

২। **পুষ্পমালা** (পদ্য-সংগ্রহ)। ১২৮২ সাল (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ১০০।

উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত ভূমিকাসহ। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে "অনেক কবিতা পরিত্যক্ত এবং তৎস্থানে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত" হইয়াছে।

৩। **এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ**। বৈশাখ ১২৮৫ (১০ মে ১৮৭৮)। পৃ. ২৮।

কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ।

৪। **মেজ বৌ** (উপন্যাস)। (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৯৫।

"ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে [বাঁকিপুরে] পূরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে 'মেজ বৌ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।"—'আত্মচরিত'

৫। **গৃহধর্ম্ম**। (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৫।

৬। **ধর্ম্ম কি ?** (৮ আগষ্ট ১৮৮৪)। পৃ. ২০।

ইহা পরে 'বক্তৃতা-স্তবক' পুস্তকের অন্তর্গত হইয়াছে।

৭। **জাতিভেদ** (বক্তৃতা)। ১২৯১ সাল (১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৭।

* 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত', পৃ. ৩৪৮-৯, ৩৪৩

৮। **রামমোহন রায়**। (৬ নবেম্বর ১৮৮৬)। পৃ. ৯৩।

৯। **হিমাদ্রি-কুসুম** (কাব্য)। ইং ১৮৮৭ (২২ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭০।

১০। **বক্তৃতা-স্তবক**। ইং ১৮৮৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ১২৬।

"কলিকাতার ছাত্রসমাজে ও অন্যান্য স্থানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে যে-সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুদ্রিত করা হইল।"

সূচী— মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল, সমাজ-রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, ধর্ম্ম কি ?, ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ, অবরোধ প্রথা।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ—এই তিনটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১১। **পুষ্পাঞ্জলি** (কাব্য)। ইং ১৮৮৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ৮৪।

"এই সকল পদ্যের অনেকগুলি বহু বৎসর পূর্ব্বে নানাবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ইহাতে প্রকাশিত সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ, ভাইবোন্ ও প্রেমের মিলন কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

১২। **রঘুবংশ**, ১-৪ সর্গ (পাঠ্য)। (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২৩৬।

মূল ও টীকা, বাংলা-ইংরেজী অনুবাদসহ।

১৩। **ছায়াময়ী-পরিণয়** (রূপক কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (২৯ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৯।

১৪। **মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা**। (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)। পৃ. ১৬।

১৫। **যুগান্তর** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (৬ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৬৪।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬। **নয়নতারা** (পারিবারিক উপন্যাস)। ? (২০ এপ্রিল ১৮৯৯)। পৃ. ২৬২।

১৭। **মাঘোৎসবের উপদেশ**। ১৩০৮ সাল (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৩৭।

১৮০০-১৮০৬ ও ১৮০৮-১৮২২ শকের (ইং ১৮৭৯-১৯০১) ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবের উপদেশ-সমষ্টি।

১৮। **মাঘোৎসবের বক্তৃতা**। ১৩০৯ সাল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)। পৃ. ১৬০।

১৮০৫-৬ ও ১৮১৫-২৩ শকের মাঘোৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতা-সমষ্টি।

১৯। **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ**। ইং ১৯০৪ (২৫ জানুয়ারি)। পৃ. ৩৫১।

ইহা একখানি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ। ইহা প্রকাশের পর যে-সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ভাবী সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

২০। **প্রবন্ধাবলি**, ১ম খণ্ড। ১৩১১ সাল (২৪ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১৭২।

"রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থের সমুদয় প্রবন্ধ বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে 'প্রদীপ' 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

সূচী — পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নৈসর্গিক ধর্ম্ম, ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, নবযুগের নব প্রশ্ন, ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ, সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত ১ম ও ২য় প্রস্তাব, জাতীয় উদ্দীপনা ১ম ও ২য় প্রস্তাব, ঋষিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত্ব, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ ১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব।

২১। **উপকথা** (অনুবাদিত)। ? (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ৫৬।

"নীতি বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

২২। **নব্যভারতে ভুত ও ভবিষ্যৎ**। ? (ইং ১৯০৯)। পৃ. ২৪।

"১৩১৬।৬১১ই কার্ত্তিক পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।"

২৩। **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র**। ১৩১৭ সাল (২০ অক্টোবর ১৯১০)। পৃ. ৪৬।

"১৯১০ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার সারাংশ।"

২৪। **ধর্ম্মজীবন**।

১৮৯৫ সন হইতে কয়েক বৎসর শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ 'ধর্ম্ম-জীবন' নামে ছয়টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশকাল ইং ১৯০১। এগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়; প্রকাশকাল এইরূপ—

১ম খণ্ড ... ১৩২০ সাল (২০ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ৩৮০

২য় খণ্ড ... ১৩২১ সাল (৫ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৩৫৫

৩য় খণ্ড ... ১৩২২ সাল (২৩ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৯।

২৫। **বিধবার ছেলে** (উপন্যাস)। ১৩২২ সাল (২২ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৭।

"প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে 'বিধবার ছেলে' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎপরে শরীর রুগ্ন ভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলিয়া রাখি। কবে চলিয়া যাই, এই ভাবিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে তাহা প্রকাশ করা গেল।"—ভূমিকা।

'বিধবার ছেলে' তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা নিঃশেষিত হইলে, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পিতার উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 'উমাকান্ত' নামে ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২) প্রকাশ করেন; ইহার ১৯শ পরিচ্ছেদটি তাঁহার নিজের রচিত।

২৬। **সাহিত্য-রত্নাবলী** (পাঠ্য)। ইং ১৯১৭। পৃ. ১০০।

"কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সারগর্ভ উপদেশমালা সঙ্কলিত হইল। যুবকদিগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত মূল প্রবন্ধগুলি তাঁহার অনুমত্যনুসারে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।... শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত।"

সূচী— মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নৈসর্গিক ধর্ম্ম, আসল ও নকল, সাধুদের সাক্ষ্য, মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল, সক্রেটিসের মৃত্যু, মানব-জীবন।

২৭। **আত্মচরিত**। ১৩২৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ. ৪৪১।

১৯০৮ সনের ৫ই জুন পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বিবৃতি। ইহার প্রথম সংস্করণটি প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ (১৯২০, ১৯৪০) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারিত হয়।

ইহাকেই শিবনাথের রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা মনে করা সঙ্গত হইবে না। তিনি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ও মাঘোৎসব প্রভৃতিতে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে

প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তিকার যেগুলির উল্লেখ পাইয়াছি তাহার একটি তালিকা দিলাম—

১। প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা (ইং ১৮৮০)
২। জাতিভেদ, ১ম ও ২য় প্রবন্ধ ,,
৩। পরকাল (ইং ১৮৮০)
৪। ভারতক্ষেত্রে সংস্কারকার্য্য ও তৎসাধনের উপায় ,,
৫। সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি ('তত্ত্বকৌমুদী,' ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক, বিজ্ঞাপন)
৬। সামাজিক ব্যাধি
৭। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
৮। চিন্তামঞ্জরী (মাঘোৎসব ১৮০৭ শক)
৯। প্রার্থনা
১০। জীবন-কাব্য (অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্য সহ)
১১। ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন ?
১২। জাতীয় সাধনা
১৩। ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামালা (৩য় সং, ব্রাহ্মসংবৎ ৮৬)

বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনেও শিবনাথের কৃতিত্ব বড় কম নয়। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি—

'মদ না গরল' : শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়া গিয়াছেন :—"কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া …আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান-বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল [১৫ নবেম্বর ১৮৭০] তাহাতেও লিখিতাম।"

'মদ না গরল' মাসিকপত্র বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ইহা ১২৭৯ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭২) মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। 'সোমপ্রকাশে' (১ শ্রাবণ ১২৭৯) প্রকাশ—

> "২৭ আষাঢ়, বুধবার।—আমরা আহ্লাদিত হইলাম 'মদ না গরল' নামক পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।"

ইহা ১২৮০ সাল বা ১৮৭৩ সনেও জীবিত ছিল। 'সুলভ সমাচার' লিখিয়াছিলেন :—"এত দিনের পর কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ [১২৮০] মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায়

না, সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।... যদি জন্মভূমিকে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা থাকে তবে সকলে যত্ন করিয়া মদ না গরলকে রক্ষা করুন।" (৩০ বৈশাখ ১২৮১)

'সোমপ্রকাশ' : এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিরাট্ কীর্ত্তি। দ্বারকানাথ সম্পর্কে শিবনাথের মাতুল। তিনি ১৮৭৩ সনের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভাগিনেয়ের হস্তে পত্রিকা-সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বাস্থ্যান্বেষণে কাশী গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে (ইং ১৮৭৩-৭৫) শিবনাথ যত্নসহকারে 'সোমপ্রকাশ' পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আত্মচরিতে' প্রকাশ —

"আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, ও তাঁহার পরিবার পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।...আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব; সেখানে যাইবার কিছু দিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরে...দেড় বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছু দিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফর্মা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।"

'সমদর্শী' or *The Liberal* : ইহা ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেম্বর ১৮৭৪)। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to the theists of other presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, *an impartial Exponent of Theistic Opinion.*"

রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকবর্গের এবং সম্পাদকের গদ্য-পদ্য বহু রচনা 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

'সমালোচক' : শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন —"কুচবিহার-বিবাহের ঝটিকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুখান হইয়া গেল। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট্, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন।...তাঁহার মুখে

শুনিলাম যে কেশববাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।...ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল তাহাও প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্যার ও বরের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশববাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন; ইত্যাদি।...এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।...যে কেশব বাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্যার বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা?...আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য 'সমালোচক' নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই *Brahmo Public Opinion* নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম।...আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারি দিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া কন্যা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন।"

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সমালোচকে'র আবির্ভাব। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া 'এডুকেশন গেজেট' (১ মার্চ ১৮৭৮) লেখেন—

"সমালোচক— সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির স্থষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> 'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটী কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।'"

শিবনাথ অল্প দিনই 'সমালোচক' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি 'আত্মচরিতে' (পৃ. ২৪২) লিখিয়াছেন—"আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে 'সমালোচক' তুলিয়া লইয়া দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।"

'তত্ত্ব-কৌমুদী': কেশবচন্দ্রের দল ভাঙিয়া যে নূতন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাহার মুখপত্র-স্বরূপ এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন—"এই তত্ত্ব-কৌমুদীর প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'সমালোচক' নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যেভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার

মনে হইল— মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী'। আদিসমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী'; ভারতবর্ষীয় সমাজের কাগজের নাম 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে "তত্ত্ব" এবং রাজা রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, 'তত্ত্বকৌমুদী' তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন এরূপ হইত তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না।"

'তত্ত্ব-কৌমুদী' প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (২৯ মে ১৮৭৮)।

'সখা' : ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে প্রমদাচরণ সেন 'সখা' নামে বালক-বালিকাদিগের জন্য একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তিনি হেয়ার স্কুলে শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আড়াই বৎসর 'সখা' পরিচালনের পর ১৮৮৫, ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী জুলাই মাস (৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) হইতে শিবনাথ পত্রিকাখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৪র্থ বর্ষের (ইং ১৮৮৬) 'সখা'ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার এবং 'সখা ও সাথী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার অনেক শিশুপাঠ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

'মুকুল' : ১৩০২ সালের আষাঢ় মাস হইতে শিবনাথ স্বয়ং 'মুকুল' নামে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় "প্রস্তাবনা"য় পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

> "...আমরা মানব-মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে।...যাহাতে মুকুল হাতে লইয়াই বালক-বালিকার প্রাণ সৌরভে আমোদিত হয় যাহাতে তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসে, দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করে, "বাঃ কি মজার কথা শিখ্‌লাম ভাই!" বলিয়া আনন্দ করে, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। এই জন্য গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা, চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইবে।"

'মুকুলে'র দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের শিশুপত্রিকা ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষীবর্গের রচনা 'মুকুলে'র গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। শিবনাথ কয়েক বৎসর সযত্নে 'মুকুল' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু শিশুপাঠ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বার্ষিকীতে মুদ্রিত তাঁহার শিশুপাঠ্য রচনাগুলির একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যের এই বিভাগটি বিলক্ষণ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে আমি যেটুকু চিনিতাম, সে আমার পিতার সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া।

আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সুরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, সুরের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটে। আমার পিতার ধর্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার সাধনা খালকাটা জলের মতো ছিল না, সে ছিল নদীর স্রোতের মতো। সেই নদী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌঁছে। এই পথ হয়ত বাঁকিয়া চুরিয়া যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমুদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা মেলিয়া সূর্যালোককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া আপনার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিয়া তুলে। এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়া আপন আকাঙ্ক্ষাকে সূর্যালোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই আকাঙ্ক্ষা গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাঙ্ক্ষা।

তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্তু আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনেই পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে জীবনকে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমগ্র জীবনের সহজ ব্যাকুলতার স্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার নিজের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার এই সহজ বোধটি ছিল।

তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে যে-সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে; শুধু জন্মগত বিশ্বাসের বেষ্টন নহে। মানুষের সবচেয়ে প্রবল অভিমান যে ক্ষমতাভিমান সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ষা-দ্বেষ, কত যুদ্ধবিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়াও তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তমসো মা জ্যোতির্গময়— এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাঁহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্রনিহিত ছিল, এইজন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা।

জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্মসমাজের প্রধান শিক্ষার বিষয়। সাধকের মধ্যে ইহারই রূপটি ইহারই বেগটি যদি দেখিতে পাই তবেই সে আমাদের পরম লাভ হয়। মতের ব্যাখ্যা এবং উপদেশকে যদি বা পথ বলা যায় কিন্তু দৃষ্টি বলা যায় না। বাঁধা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খুঁজিয়া বাহির করে। এমনকি, পথ অত্যন্ত বেশি বাঁধা হইলেই মানুষের দৃষ্টির জড়তা ঘটে, মানুষ চোখ বুজিয়া চলিতে থাকে, অথবা চিরদিন অন্যের হাত ধরিয়া চলিতে চায়। কিন্তু প্রাণক্রিয়া প্রাণের মধ্য দিয়াই

সঞ্চারিত হয়। আত্মার প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা। মানুষের ভালোমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালোবাসিবার শক্তি খুব বড়ো শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল— এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোটো ও বড়ো, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন-একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জল ও সজীব ছিল, কোনো ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন— মানববাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁর মনে কেবলি জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর মিলন হইয়াছে সেখানে তার নানা ছোটোবড়ো কথা নানা ছোটোবড়ো ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মতো তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে।

অথচ এই তাঁর মানববাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াছেনই, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে বারবার তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মানবপ্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬

মলাট

শ্রীঅজিত দত্ত

সিণ্ডেরেলার কী ভাগ্য যে পরীর দয়ায় বেশে-ভূষায়-অলংকারে সে অপরূপ অভিজাত চেহারার অধিকারিণী হয়েছিল। জৌলুসে সে-চেহারা এমনি জমকালো হয়ে উঠেছিল যে তার বোনেরাও তাকে সিণ্ডেরেলা বলে চিনতে পারে নি। ভাগ্যিস দৃষ্টি-আকর্ষণ করবার মতো সর্বপ্রকার আভরণ দিয়ে পরী তাকে সাজিয়ে দিয়েছিল! তাইত সে নাচের সভায় ঢুকতে পেল! আর, সেখানে যেতে পেরেছিল বলেই তো রাজপুত্র তাকে বিয়ে করল। নইলে সিণ্ডেরেলা যত ভালো মেয়েই হোক, যত অপূর্বই হোক তার নাচের ভঙ্গি, রাজপুত্র কখনো কি তা জানতে পারত, না, রাস্তায় ঘাটে দৈবাৎ চোখে পড়ে গেলেও কখনো সিণ্ডেরেলার দিকে ফিরেও তাকাত?

জগৎ-সংসারের সবচেয়ে বড় সমস্যাই হচ্ছে এই যে যাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ, মনোহরণ বা চিত্তজয়ের উপর আমাদের ভালোমন্দ, জীবনমরণ, ইহ-পরকাল নির্ভর করে, আমাদের গুণাগুণ বিচারে তাদের প্রবৃত্ত করি কী উপায়ে! পরীক্ষার প্রকোষ্ঠে ঢোকবার প্রবেশপত্রটি পাই কোথায়? কী করে বোঝাই আমাদের ঘরেও আছে এক সিণ্ডেরেলা— যদি সে পরীর দয়ায় রাজপুত্রের সঙ্গে একবার নাচবার সুযোগ পায়?

তাই তো মেয়ে দেখবার সময় মানানসই শাড়ি গয়না পাউডার আর নির্দিষ্ট দিক থেকে মুখের উপর আলোটি চাই। নইলে মেয়েই বা পছন্দ হবে কেন, বিয়েই বা হবে কী করে? আর, বিয়েই যদি না হয়, তবে এই যে এতদিন ধরে মেয়ে লেখা পড়া সেলাই রান্না গান বাজনা ভদ্রতা ও আতিথেয়তায় অসামান্যা হয়ে উঠল, তার যোগ্য মর্যাদা সে কোথায় পায়? সেইজন্যই তো চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাবার সময় চাই নিখুঁত ভাঁজের স্যুট কিংবা ধোপদুরস্ত ধুতিপাঞ্জাবি। চাকরিটা যদি ফসকে যায়, তাহলে এত যে কাজে দক্ষ হলাম তার পরিচয় দিই কী করে? তাই তো ভালো একখানা বই লিখলে চাই জমকালো মলাট। নইলে কিনবে কে? কেউ যদি না-ই কিনল তবে এমন উৎকৃষ্ট একখানা বই লিখে লাভ হল কি?

অতএব আমরা যে কাজেই অগ্রসর হই, যে সওদা নিয়েই জগতের বাজারে উপস্থিত হতে চাই না কেন মলাটকে যেন কখনো না ভুলি। এমনকি যদি আমরা অকুশল ও নগণ্য হই, তবু এ যুগে মলাট সম্বন্ধে অবহিত হতে শৈথিল্য করা আমাদের উচিত নয়। কেননা, গোঁফ দেখলেই যেমন শিকারী বেড়াল চেনা যায়, মোড়ক দেখেই তেমনি বস্তুমূল্যের প্রাথমিক নিরূপণ হয়ে থাকে। ইংরেজিতে বলে শুরুটা ভালো হলেই অর্ধেক কার্যোদ্ধার। সে-হিসেবে প্রাথমিক বিচারের রায়টা একেবারে অবহেলার বস্তুই বা কেন হবে? আজকাল সাহিত্যকেও যখন গ্রন্থাকারে পণ্যরূপে জনমনোরঞ্জনের প্রাণান্তিক চেষ্টায় বাজারে বেরুতে হয়, তখন বইয়েরও দৃষ্টিমনোহর প্রচ্ছদে নিজেকে আবৃত করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। বিধাতাপুরুষ যেমন মানুষের ললাটে ভাগ্যলিপি লিখে দেন, তেমনি বইয়ের ভাগ্যলিপি লেখা থাকে তার মলাটে। সে-মলাট যত বর্ণাঢ্য, বই ততই বহু-কাঙ্ক্ষিত বহু-ক্রীত। যে-যুগে ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়-

সংখ্যার আপেক্ষিক বিচার দ্বারাই ভূভারতের যাবতীয় বস্তুর মর্যাদা নির্ণীত হয়, সে-যুগে চাকচিক্যের দিকে একটু নজর না রাখলে চলে কী করে? আর উদ্দেশ্য যেখানে যে-কোনো উপায়ে ক্রেতার মনোহরণ, সেখানে মলাটের চিত্রসন্নিবেশে পুস্তকের প্রকৃতি সম্বন্ধে খুব বেশি বাছবিচার করাও মুশকিল। ইতিহাস ভূগোল ভ্রমণকাহিনী পাঠ্য-পুস্তক প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প-উপন্যাস সব বইয়েরই বহুবর্ণ, দৃষ্টিমোহন, জমকালো মলাটে সুসজ্জিত হয়ে থাকা ভালো। কে জানে কোন ক্রেতার কোন রঙে মন মজবে?

যাঁরা বাংলা ছায়াচিত্রের নিয়মিত দর্শক তাঁরা জানেন যে নায়িকা অতি দরিদ্রা, এমনকি আহারাচ্ছাদনের অভাবক্লিষ্টা হলেও তাঁর শাড়ি ও অলংকারের পারিপাট্যের কখনো কোনো ত্রুটি দেখা যায় না, কেননা, যাঁরা অর্থ ব্যয় করে ছায়াচিত্র উপভোগ করতে যান তাঁরা নাকি নায়িকাকে সাদাসিদে ভাবে দেখতে চান না। সিনেমাদর্শকের তুলনায় বইয়ের ক্রেতাসংখ্যা যদিও সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের মতোই নগণ্য তবু উভয়ের পছন্দ ও রুচিতে যে বিশেষ তারতম্য আছে এ কথাই বা জোর করে বলা যায় কী করে?

আমরা মুখে যে যাই বলি না কেন, একটু তালিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় শিক্ষাই হচ্ছে প্রচ্ছদন। ছায়াচিত্রের ভাষায় মলাটই হচ্ছে অত্যুন্নত সভ্যতার সবচেয়ে বড় 'অবদান'। পূর্বকালে প্রচ্ছদপরিচ্ছদের দ্বারা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিজ্ঞাপিত করার প্রথা ছিল না, তাই লোকে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো সকল মানুষকেই সমান চোখে দেখত যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তির বিশেষ গুণাগুণের পরিচয় পেত। মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সেকালের সমাজে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রতাপশালী ছিলেন। অথচ, বেশভূষায় তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি উদাসীন। তখনো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দিগ্বিজয়ে বেরোয় নি, এমন কি তার জন্মই হয় নি তখনো। মলাটের মর্যাদা সম্বন্ধে তাই এত বড় দেশটার সব লোকই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কখনো বল্কল, কখনো স্বল্পপরিমিত বস্ত্র সম্বল করেই ঋষিব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রতাপপ্রতিপত্তি অখণ্ড এবং অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। যজ্ঞভূমি থেকে রাজসভা সবই তাঁদের কাছে ছিল অবারিত; কোনো স্থানে প্রবেশাধিকার লাভের জন্যই তাঁদেরকে অনভ্যস্ত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হতে হত না। কেবল মুনি ঋষি নয়, ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ দার্শনিক ও অধ্যাপকেরা অন্তগৌরবেই নিজেদের এতটা গৌরবান্বিত মনে করতেন যে বাইরের পারিপাট্য তাঁদের বিবেচনায় ছিল নিতান্তই অবান্তর। একজন সামান্য বৈয়াকরণ পর্যন্ত কিরূপ অকুতোভয়ে ও অপরিচ্ছন্নভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হতে পারত তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন—

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে,
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম
প্রখর মূর্তি অগ্নিশর্ম
ছাত্র মরে আতঙ্কে।

এ-যুগে সাধারণ বৈয়াকরণ তো দূরের কথা, স্বয়ং পাণিনি-পণ্ডিত এলেও ঐ বেশে রাজদরবারে

ঢুকবার হুকুম পাবেন না, একথা বালকেও জানে। মহাত্মাজীর মতো শ্রেষ্ঠ মানবকেও যে চার্চিলসাহেব 'নগ্ন ফকির' বলে অবজ্ঞা করতে পেরেছিলে, সে কেবল তিনি বেশমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলে। গান্ধীজি যদি আধুনিকতম কেতাদুরস্ত ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতেন, তবে চার্চিলের পক্ষে এরূপ উদ্ধত উক্তি করা সম্ভব হত কি না সন্দেহের বিষয়।

দুষ্মন্ত যে বল্কলভূষিতা শকুন্তলাকে দেখে 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, সেটা সদ্য প্রেমাহত রাজার উপযুক্ত উক্তি হলেও আধুনিক জাগতিক সত্য হিসেবে বিচারসহ নয়। তবু তো রাজা শকুন্তলার চেহারার সৌন্দর্য বা আকৃতিগত রূপের কথাই বলেছেন, অন্তরের মাধুরীর কথা ভেবে দেখবার অবকাশ পান নি। চেহারার সৌন্দর্যও একরকমের মলাটই। তবে সে যেন উচ্চাঙ্গ বইয়ের কাপড়ের বাঁধাই, জমকালো এবং বহুবর্ণ উপরের ডাস্ট জ্যাকেটটা ফেলে দিলেও তার মর্যাদার হানি হয় না। শুধু ভালো চেহারা নিয়েও জগতে তরে যাওয়া যায়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। আর্ষবাক্য মিথ্যা হতে পারে না। বাইরেটা দৃষ্টিমনোহর হলে যে জগতের বহু পরীক্ষাতেই পাশমার্কা পাওয়া যেতে পারে এ-বিষয়ে মনীষীরাও সংশয় করেন নি।

এই রকমই যখন সাধারণ নিয়ম, বাইরের পারিপাট্য ও চাকচিক্যই যখন সার্থকতার প্রতিযোগিতায় যাবতীয় মানব ও বস্তুর শ্রেষ্ঠ সহায় তখন বই সম্বন্ধে এর ব্যতিক্রম আশা করি কী করে? বিশেষত বাংলাদেশে যখন অধীত হওয়ার চেয়ে উপহৃত হওয়াই বইয়ের পক্ষে বৃহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর সার্থকতা। বই যতই বিক্রি হয়, ততই মঙ্গল। প্রকাশক ও সাহিত্যিকের তাতে লাভ এবং প্রকারান্তরে সাহিত্যেরও। কারণ, সেক্ষেত্রে প্রকাশক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা লাভজনক বলে মনে করবেন এবং সাহিত্যিক নতুন রচনার হাত দেবার অবসর ও প্রেরণা পাবেন। কিন্তু ক'খণ্ড বই পঠিত হল, এবং সেই মোট সংখ্যার মধ্যে আবার ক'খানা বিদগ্ধ জনের দ্বারা পঠিত হল সে প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, কেবলমাত্র রসিক-মনোরঞ্জনই উদ্দেশ্য হলে বই মুদ্রিত করা নিতান্তই অর্থহীন। বাংলাদেশে সাহিত্যবোদ্ধা ও সাহিত্যরসিক এত অসংখ্য নয় যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা মুদ্রণ ও গ্রন্থন ব্যয়ের একটা বৃহৎ অংশ উঠে আসতে পারে— গ্রন্থকারের বিড়ি দেয়াশলাইয়ের ব্যয় উপার্জিত হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব গ্রন্থকার যতই উচ্চস্তরের সাহিত্যিক হোন, তাঁর বই যতই উৎকৃষ্ট হোক, গ্রন্থাকারে বাজারে বেরোবার সময় সাহিত্যকে বেরোতে হবে বাজারের পোশাকেই— এইটাই আধুনিক সর্বজনস্বীকৃত রীতি। কেননা, এই উপায়েই বই সর্ব-উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বই যে শুধু পড়বার জন্যই একথাই বা কে বলেছে? জন্মদিনে বিয়েতে বিবাহবার্ষিকীতে বইয়ের চেয়ে সুষ্ঠু অভিজাত অনতি-ব্যয়সাপেক্ষ উপহার আর কী আছে? উপহারের দ্রব্য সব সময়ই শোভন ও দৃষ্টিসুখকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে কারণে ভালো মলাটের বইয়ের একটা চাহিদা আছে। ক্রেতাগণ উপহার হিসেবে গ্রন্থনির্বাচন করেন বলেই যে তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন সাহিত্যবিশারদ তা নাও হতে পারে। তিন-চারজন ঔপন্যাসিকের নামই হয়তো তাঁদের সাহিত্যজ্ঞান-ভাণ্ডারের আজীবন সঞ্চয়। কিন্তু তাই বলে বিবাহের উপহারে বই দিতে বাধা নেই। অল্প খরচে শোভন সুন্দর উপহারই শুধু নয়, গ্রন্থ উপহারের দ্বারা বিবাহবাসরে বহুজনসমক্ষে নিজেকে একটা সংস্কৃতিক দীপ্তিতে আচ্ছন্ন করা চলে। এইরূপ, উপহারদাতাও হয়তো তাঁর বিয়ের সময় বিস্তর বই পেয়েছিলেন। গল্পগ্রন্থগুলি তাঁর স্ত্রী পড়ে থাকবেন, তিনিও হয়তো কিছু পড়েছেন। বাকি-

গুলো কোথায় যে গেছে কে জানে! কিন্তু তাতে সেই লুপ্ত পুস্তকগুলির গ্রন্থজীবন ব্যর্থ হয় নি। তারা ক্রীত হয়েছে, সাহিত্যকে সুপ্রচারিত হতে সাহায্য করেছে, এমনকি হয়তো সাহিত্যিককে যৎকিঞ্চিৎ লভ্যাংশ প্রদান দ্বারা অনুপ্রেরিতও করেছে। বই-জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর সার্থকতা একটি মাত্র আছে—বিদগ্ধজনের দ্বারা পঠিত হওয়া ও তাঁদের মনে উপভোগ ও তৃপ্তি জোগানো। সেটা অধিকাংশ সাহিত্যিকই অপর সাহিত্যিকগণের মধ্যে গ্রন্থবিতরণ দ্বারাই সমাধা করেন; তার জন্য ক্রেতার মুখাপেক্ষী হয়ে, দৈবের দয়ার উপর নির্ভর করে, কবে কোন্ সাহিত্যরসিকের হাতে তাঁদের এই বই গিয়ে পৌঁছবে তার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে খুব কম সাহিত্যিকই সম্মত হবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যরসিকের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো সাহিত্যিকের মনে কোনো মোহ নেই; কোনো প্রকাশকের যদি থাকে তবে বুঝতে হবে যে তিনি অল্পদিন এ-ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছেন, এবং আর খুব অল্পদিনই মাত্র এ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকবেন। তাঁর ব্যবসায়ে গণেশ ওলটাতে বেশি দেরি নেই।

উপহারযোগ্যতাই যে গ্রন্থজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অর্থাৎ যে বই উপহার হিসেবে যত ভালো, সে বই যে তত বেশি সমাদৃত, একথা যে কোনো গ্রন্থকার প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা স্বীকার করবেন। একারণে অনেক বুদ্ধিমান প্রকাশক এমন বই বার করতেই বেশি উৎসাহী, পাঠযোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক উপহার হিসেবে যা নিখুঁত। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে যেসব বই সর্বাধিক বিক্রীত হত, তা হয় নববিবাহিতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ সংকলন, নতুবা রঙিন মলাটসম্পন্ন চিত্রে-রূপান্তরিত কোনো বিখ্যাত লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সেসব চিত্র যে চিত্র-হিসাবে ক্ষণমাত্রও দর্শনযোগ্য ছিল, তা নয়; আর খ্যাতনামা এসব বইয়ের যেটা প্রকৃত আকর্ষণ সেই রচনাই ছিল সেখানে অনুপস্থিত। তবু সেই-সব অপেক্ষাকৃত চড়াদামের বই হাজারে হাজারে বিক্রি হত। সংস্করণের পর সংস্করণ উঠে যেত। অথচ সে-সব বইয়ের পাঠযোগ্যতা ছিল না কণামাত্র। অতএব যাঁরা মনে করেন যে-বই যত উপভোগ্য, সে-বই তত বেশি বিক্রি হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। তাঁরা জানেন না যে পড়বার জন্য বাংলা বই কেনা বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি নয়। সন্ধান করলে এর ব্যতিক্রম হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সাধারণত কেবল মাত্র পড়বার জন্যই পয়সা খরচ করে বই কিনতে হলে ইংরেজি বই কেনাই সদ্ব্যয়, এটাই আমাদের দেশের প্রচলিত বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু, বিবেচনা করুন, তাহলে বাঙালি গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাঁচে কি করে? আর আমাদের বিরাট সাহিত্যসম্পদ সম্বন্ধে বক্তৃতার ও প্রবন্ধের উপাদানই বা জোটে কোথায়?

সকলেই জানেন, কাব্যগ্রন্থ সাধারণত বিক্রি হয় না। গল্প উপন্যাসের মিঠা স্বাদটুকু পাবার জন্য যদিও বা যৎসামান্য চাঁদা দিয়ে পাড়ার পাঠাগারের গ্রাহক হওয়া চলে, কিন্তু কাব্যপাঠের জন্য বাজে খরচা? নৈব নৈব চ। কিন্তু ভেবে দেখুন বাংলায় ক্রেতামহলে যে-ক'টি কাব্যগ্রন্থের অত্যধিক সমাদর সেসকল কাব্যগ্রন্থ বিচিত্র মলাট ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রশোভিত, এক কথায় উপহারযোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম। উপন্যাসের চেয়েও সেসব বইয়ের বেশি চাহিদা—বিশেষত বিবাহের মাস ক'টাতে। তার কারণ, লোকের ধারণা যে বিবাহের অব্যবহিত পরে নবদম্পতি মুখোমুখি বসে কাব্যপাঠ করতে খুবই উৎসুক। যদিও হয়তো কোনো লোকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এ বিশ্বাস সমর্থিত নয়, তবু এ বিশ্বাস লোকের ভাঙে না। যেমন কি না, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি স্বয়ং যদিও স্পষ্টই বলে

গেছেন 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমনি নয় গো,' তবু লোকের বিশ্বাস কবিরা সর্বদাই ঢুলু ঢুলু চোখে চাঁদের পানে চক্ষু তুলে বসে আছেন, কত চালে কত কাঁকর এসব খবর রাখা তাঁদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এ-কারণে পাঠের অযোগ্য কিন্তু বেশে-ভূষায় চকোলেটের বাক্‌স, বিবাহের অলংকার, অথবা তজ্জাতীয় চমক-লাগানো বেশে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থ যে ক্ষেত্রে উপন্যাসের চেয়েও বেশি আদৃত, সেখানে সত্যিকারের কাব্যগ্রন্থ

—লিখছে সবাই কিনছে নাকো কিন্তু কে'ই
কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারী কি সিন্ধুকেই।

বাংলাদেশে এ রীতির এখনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে-কোনো জিনিসেরই অন্তর্নিহিত তথ্য বা তত্ত্বকথার মর্মোদ্‌ঘাটন করবার মতো অবসর ও প্রবৃত্তি এ-যুগে লোকের নেই বললেই হয়। অতএব চাই জমকালো মলাট, চকমকে মলাট, নয়নহরণ মলাট— যার আকর্ষণটা ক্রেতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং উপহৃত বলে গ্রহীতারও হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। বর্তমান কালের মলাটমুখী মনোবৃত্তির যাঁরা নিন্দে করেন, তাঁরা যুগধর্মেরই নিন্দা করেন। যুগনায়কগণের বিবেচনায় তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হওয়া বিচিত্র নয়।

মলাটেরও প্রগতি লক্ষ্য করুন। কাগজের মলাট, রঙিন কাপড়ের মলাট, তদুপরি রঙিন হরফে নাম লেখা ; চিত্রশোভিত মলাট, তুলোর প্যাডের মলাট— যে বই ঘুমিয়ে পড়বার আগে বালিশের তলায় না রেখে উপরে রাখলেও অসুবিধে নেই ; বহুবর্ণ মলাট, জরি স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত মলাট এবং, প্রগতি বজায় থাকলে কোনো সুচতুর অগ্রগণ্য প্রকাশকের দ্বারা অদূরভবিষ্যতে হীরকখচিত মলাট সংবলিত গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করাও অসম্ভব মনে করবার হেতু নেই। প্রাচীন কালের কাষ্ঠখণ্ডে আবৃত পুঁথির থেকে আমরা আজ কত অগ্রসর হয়েছি ভাবলে বিস্ময় ও গৌরব বোধ হয়। এবং যদি এই গতির ইতিহাস অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই উন্নতি এসেছে ধাপে ধাপে। যখনই কোনো উদ্ভাবন প্রতিভাসম্পন্ন প্রকাশক কোনো নতুন ধরনের মলাট আমদানি করেছেন, তৎক্ষণাৎ যাবতীয় পুস্তক সেই নতুন ফ্যাশানের মলাট অঙ্গে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। যে কোনো এক সময়ে যুগপৎ প্রকাশিত সকল বাংলা পুস্তকই রূপসজ্জায় গড্ডলপ্রবাহের মতো একই পথের যাত্রী। যূথভ্রষ্ট হলেই বইটি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা একথা সাহিত্যযশঃপ্রার্থীর মতো প্রকাশকেরও সম্ভবত অজানা নেই।

আজ আমরা বহু উদ্ভাবন ও অসংখ্য অনুকরণের দুর্গম ও সময়সাপেক্ষ পথ অতিক্রম করে মলাট-জগতে যুগান্তর আনতে সমর্থ হয়েছি। এ কি কম আত্মপ্রসাদ, কম তৃপ্তির কথা ? আজ যে বাংলা উপন্যাস পাঁচ শ'র স্থলে এগারো শ' ছাপতে হয়, এরূপ মলাটপ্রগতি ভিন্ন কি কোনো দিন তা সম্ভব হত ?

তথাপি কোনো কোনো গ্রন্থপাঠক, যাঁদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থের ক্রেতা নন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে আধুনিক প্রকাশকদের মধ্যে মলাটসজ্জার অভিনবত্ব ও বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে যে প্রাণান্তিক প্রতিযোগিতা দেখা যায় এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে পঠিত হওয়া, সেই পাঠ্যাংশরূপী উপভোগ্য শাসের বদলে অবান্তর খোসাটার উপর বহুব্যয়সাপেক্ষ রং চড়িয়ে সং সাজানোর কোনো মানে হয় না। বলা বাহুল্য এঁদের এ-যুক্তি একেবারেই অচল। বইয়ের যারা সবচেয়ে বেশি দাম দেয় তারা দেখবার মতো, দোখবার মতো জিনিসেরই পক্ষপাতী। যারা সবচেয়ে কম দাম দেয় তাদের মতে চললে গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাঁচে কী করে ?

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

গত সংখ্যার অনুবৃত্তি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ব্যবহারাজীবের কার্য ও বাংলা আইনপুস্তক প্রণয়ন

কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্য করিবার পর প্রসন্নকুমারকে ব্যাবসা-কার্যে লিপ্ত দেখিতে পাই। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'Merchant and Zeminder'। প্রসন্নকুমার ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারাজীব হইলেন। কিন্তু শেষজীবন পর্যন্ত ব্যাবসা-কার্যও চালাইয়াছিলেন। আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং মোকদ্দমা পরিচালনায় দক্ষতার নিমিত্ত তিনি জনসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৪৪ সনের প্রথম দিকে তিনি এই আদালতে সরকারী উকীলের পদে নিয়োজিত হইলেন। ১৮৪৪ সনের ২১এ মার্চ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন—

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে কোম্পানী বাহাদুরের উকীলী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ হইবেক ঠাকুর বাবুর ঐ পদ প্রার্থনা সময়ে আমরা তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা কর্ম্মণ্যক্ষমতা ইত্যাদি যে সকল ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে সফল হইল যোগ্য পাত্রে যোগ্যানুযোগ্য পদ সমর্পিত হইলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মে অধুনা সদর আদালতে উক্ত বাবু স্বযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় নির্ব্বাহ্য কার্য্য সুসম্পন্ন দ্বারা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারদিগকে অবশ্যই সুখী করিবেন। পরন্তু কথিতব্য এই যে ঐ পদ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপযুক্ত হইয়াছে আমরা এমত জ্ঞান করি না যেহেতু তিনি বিচারোপযুক্ত কর্ম্মে স্বয়ং পারদর্শী তবে লভ্যাংশ যাহা থাকুক। অপর সংবাদপত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল গবর্ণর উক্ত বাবুকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন ইহাতে যদিও তাঁহার অনুরূপ পদ না হউক কিন্তু ঐ উপাধি দ্বারা তাঁহার সম্মানবৃদ্ধি সকলেই কহিবেন কেননা ঐ পদস্থ পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা তাদৃশ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই কিন্তু ঠাকুর বাবু সেই পদ প্রতিপ্রার্থী হওয়াতে তৎপদ ও যোগ্যোপাধি প্রদত্ত হইয়াছে অতএব আমরা কৌন্সেলের সুবিবেচনার সাধুবাদ করিলাম।"

প্রসন্নকুমার খাস আপীলের মামলাতেও উকীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে (১২ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশ—

"পৌষ [১২৫৪] — সদর আদালতের জজেরা খাস আপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আজিজ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন।..."

সরকারী উকীলের পদ হইতে প্রসন্নকুমার ১৮৫০ সনের আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থলে রমাপ্রসাদ রায় এই পদে নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার ওকালতী দ্বারা প্রচুর অর্থার্জন করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই জানিয়াছি যে, এইভাবে অর্জিত অর্থের দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ শোধ হইয়াও প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাহার দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

প্রসন্নকুমার মামলা-মোকদ্দমা লইয়াই শুধু ব্যস্ত থাকিতেন না, প্রাচীন হিন্দু আইন এবং তৎকালীন প্রয়োজনীয় আইনগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশেও নিজেকে লিপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতের দ্বারাও হিন্দু আইনের বহু পুস্তক সংকলন করাইয়া প্রকাশিত করেন। তাঁহার হিন্দু আইন সংক্রান্ত গৌড়ীয় দায়াবলীর সমালোচনা ১৮৪৩ সনের ২৫এ ডিসেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাইতেছি। চন্দ্রিকা লেখেন—

"গৌড়ীয় দায়াবলী। সম্প্রতি শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বহুতর বিজ্ঞ স্মৃতি-পণ্ডিত কর্ত্তৃক সমালোচিত গৌড়ীয় দায়াবলী নামক অপূর্ব্ব এক সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন সেই অমূল্য পদার্থ বিনামূল্যে আত্মীয়-স্বজন সজ্জনগণে প্রদত্ত হইতেছে আমরা এক প্রস্থ প্রাপ্ত হইয়া বিপুলানন্দ পুরঃসর অবলোকন করিলাম দৃষ্ট হইল তাহা অতি চমৎকৃত ও সর্ব্বজনাদরণীয় হইয়াছে ঠাকুর বাবু তাহাতে বিবিধ প্রকার বিদ্যাবুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার পাণ্ডিত্য নৈপুণ্য ক্ষমতা প্রতি সাধুবাদ পূর্ব্বক আমরা সাধারণের গৌরবার্থে তন্মর্ম্ম কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি পাঠক প্রণিধান করুন।..."

প্রসন্নকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন "বাদী বিবাদভঞ্জন" প্রণয়ন করেন (১৭৮৪ শক, ৯ই চৈত্র = ১৮৬৩, ২১এ মার্চ)। তাঁহার নিজস্ব "বিবাদ চিন্তামণি", "ব্যবস্থাপত্র" ও অন্যান্য ইংরেজী-বাংলা আইন পুস্তক সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—

"He wrote much and read more; and many portly volumes in Bengali and English, such as the translation of *Vivada Chintamani*, the commentary on the rent law, and his *Vyavastha Patra* attest the zeal and ability with which he laboured in the field of authorship."[১]

প্রসন্নকুমার বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থও পণ্ডিতদের দ্বারা প্রকাশিত করান। রাজেন্দ্রলাল আরও বলিয়াছেন যে, প্রসন্নকুমার বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। দূর-দূরান্ত হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট আইনঘটিত জটিল প্রশ্ন এবং মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯এ ডিসেম্বর, ১৮৫৪) হইলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋণপরিশোধ লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। পাওনা অনাদায় হেতু পাওনাদারেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে এবং অনেকে ডিক্রী পায়। কেহ কেহ তাঁহাকে কারাগৃহে প্রেরণেও উদ্যত হইল। এই সময় পিতৃব্য প্রসন্নকুমার তাঁহার সহায় হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তিনি [প্রসন্নকুমার] আমাকে বলিলেন যে, 'দেখ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা শোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।' আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনাফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম, এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে যাইতাম।"[২]

---

১ *Speeches of Rajendra Lala Mitra*, p. 26.

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ. ২১০

জমিদারসমাজ বা ভূম্যধিকারী সভা

প্রসন্নকুমারের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা বলিতে বলিতে আমরা তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখনও রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার যোগাযোগের বিষয় বলা একরকম কিছুই হয় নাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, সহমরণ নিবারণ আইন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাস সম্পর্কিত আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপারে রাজা রামমোহনের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের একযোগে কার্য করার কথা আগে বলা হইয়াছে। ১৮২৯ সন হইতে সরকার নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করিতে মনস্থ করেন। পরবর্তী দশকের মধ্যভাগ হইতে এই উদ্দেশ্যে কার্য সুরু হয়। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'য় বাঙালী প্রধানেরা এই বিষয়ের বিরুদ্ধে আলোচনা ও আন্দোলন করিতে থাকেন। এইসব আলোচনা ও আন্দোলন ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠে এবং তৎকালীন নেতাদের লইয়া ১৮৩৭ সনের শেষে একটি সোসাইটি বা সমাজ গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলে। ঐ বৎসর ১০ই নবেম্বর হিন্দু কলেজ গৃহে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য সভা হইল। এই সভায় ভাবী সোসাইটির 'পাণ্ডুলেখ্য ও বিধিসকল নিবদ্ধ করণার্থ' একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। প্রসন্নকুমার ইতিমধ্যেই নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অস্থায়ী কমিটিতে তিনিও গৃহীত হইলেন। ইহার অন্য তিন জন সভ্য ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, এবং তারিণীচরণ মিত্র। উক্ত প্রকাশ্য সভায় ভাবী সমাজের মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, "এই সমাজ জাতি কি দেশ কি ধর্ম্ম কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না"।[৩]

জমিদার সমাজের মূল উদ্দেশ্য হইল এই, যদিও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই ইহার কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিয়মাবলী গঠনের পর ১৮৩৮ সনের ২১এ মার্চ হিন্দু কলেজ গৃহে পুনরায় একটি সাধারণ সভা হইল। রাধাকান্ত দেব ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় জমিদার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইহার সম্পাদক হইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও উইলিয়ম কব্ হ্যারি। কার্য নির্বাহক সভায় ছিলেন থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাজনারায়ণ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, রাজা রাধাকান্ত দেব। এখানে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৮৩৩ সনের সনন্দে এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসতি স্থাপনের বাধা বিদূরিত হওয়ায় অনেকে এখানে জমিদারী ক্রয় করিয়া ভূমিতে স্বত্ববান হইয়াছিলেন সুতরাং জমিদার সমাজে তাঁহারাও যোগদান করিলেন। জমিদার সমাজ নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করায় সাধারণ প্রজাই উপকৃত হইল সবচেয়ে বেশী। আন্দোলনের ফলে একই গ্রামে অনধিক পঞ্চাশ বিঘা জমি নিষ্কর রাখিতে সরকার সম্মত হন।

এই কার্যটি ব্যতিরেকে জমিদার সভা ঐ সময়কার রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করিতে থাকেন। সরকার তৎকালীন জমিদার সমাজকেও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অনুরূপ মর্যাদা দান করিলেন। কোনো সরকারী আইন বা বিধি সম্বন্ধে ইহার মতামত আহ্বান করা হইত। প্রসন্নকুমার এই সমাজের জন্য নিজের শক্তি সময় ব্যয় করিতে মোটেই কুণ্ঠিত হইতেন না। নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত

৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃ, ৪০৫-৮) জমিদারসমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

করার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার এবং ইহার ফলে জনসাধারণের স্বার্থ যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে তাহার মূলে প্রসন্নকুমারের কৃতিত্ব বিশেষ স্মরণীয়। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত শোক-সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন,

"... the great agitation which Landholder's Association carried on anent the resumption operations of Government it benefited the owners of small holdings —the ryots—a great deal more than the big Zemindar ; and for that benefit the people of this country were largely indebted to the gentleman whose death they had assembled to mourn." [৪]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা

জমিদার সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চতুর্দশ বৎসর পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ, বিশেষত বেসরকারী ইংরেজ, এবং ভারতবাসীর মনোভাবে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শ্বেতাঙ্গ পাদ্রী-সম্প্রদায়, বণিকসমাজ প্রভৃতি শাসক শ্রেণীর এতই আপন হইয়া পড়িল যে, তাহারাও ভারতবাসীকে পরাধীন শাসিত বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল, নিজেদের স্বার্থকে ভারতবাসীদের স্বার্থ হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। যেসকল আইন বিধিবদ্ধ হইতেছিল তাহাতে এদেশীয়দের স্বার্থহানি ঘটিতেছিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার আবির্ভাব। সুতরাং ইহাতে এদেশবাসী ইংরেজ সভ্য একজনও ছিলেন না, এটি পুরাপুরিই ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান হইল। ইহার পূর্বে, নব্য বঙ্গের মুখপাত্রগণ কর্তৃক ১৮৪৩ সনের ২০এ এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু জমিদার সমাজের মত ইহাও ক্রমে নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠে। সাময়িক এবং জাতীয় প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হইয়া এতদুভয়ের নেতৃবৃন্দ জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে এই সভা গঠনের আয়োজন করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠার দেড় মাস পূর্বে কলিকাতায় "National Association" বা "দেশহিতার্থী সভা" গঠিত হইতে দেখি। 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে "Revival of Landholders Society" শিরোনামে এই সভা প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রদান করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর পাইকপাড়া রাজবাটীতে ইহা স্থাপিত হয় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার কর্মকর্তৃসভায় শুধু নহে, ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পেও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পূর্ব পূর্ব সভার মতো এ প্রতিষ্ঠানটি যে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বে উঠিয়া যাইবে না, বরং স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তাহার উল্লেখ করিয়া 'হরকরা' লেখেন—

"We have assurance that such men as Baboos Prosunno Coomar Tagore and Debendranath Tagore will never associate their names with an undertaking which they do not hope to carry out."

৪ *Speeches of Rajendra Lala Mitra,* p. 25.

অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লোক এমন কোন কাজে হাত দিবেন না যাহাতে তাঁহারা সিদ্ধিলাভের আশা না রাখেন।

এই দেশহিতার্থী সভা হইতেই ভারতবর্ষীয় সভার জন্ম। কারণ ইহার উদ্যোক্তাগণই দেড় মাস পরে ১৮৫১, সনের ২৯এ অক্টোবর একটি সভায় সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপন করিলেন। ঐ দিনের সভাতেই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী স্থিরীকৃত ও প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইল—

"That a Society be formed for a period of not less than three years under the denomination of the British Indian Association, and that the object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interest of Great Britain and India and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject territory."[৫]

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারের ভিতরে শাসনকার্য ন্যায়সংগতভাবে উৎকর্ষ করাইয়া ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ অটুট রাখা এবং ভারতীয় প্রজাবর্গের উন্নতি সাধনের উপায় নির্ণয় করা ভারতবর্ষীয় সভার উদ্দেশ্য বলিয়া ধার্য হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব হইলেন এই সভার সভাপতি এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। কর্মকর্তৃসভা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী প্রসন্নকুমার কর্মকর্তৃসভায় সদস্যের পদ লইলেন। ভারতবর্ষীয় সভার দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয় ১৮৫৪ সনের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে। এবারকার কর্মকর্তৃসভায়ও প্রসন্নকুমার একজন সদস্য নির্বাচিত হন।

ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত 'Crown Colony' বা উপনিবেশের আদর্শে শাসনকার্য নির্বাহার্থ একটি নিখিল-ভারতীয় আইন-সভা গঠনের প্রস্তাব করেন। এই সভায় আঠারো জন সদস্যের মধ্যে বারো জন থাকিবেন ভারতীয়। ১৮৫৩ সনে কোম্পানির সনন্দ প্রাপ্তির প্রাক্কালে ভারতবর্ষীয় সভা উক্ত প্রস্তাব এবং শাসন বিষয়ক অন্যান্য বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া একখানি স্মারকলিপি পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন। সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় গ্রাহ্য হইলেও বড়লাটের আইন-সভায় ভারতীয় গ্রহণের প্রস্তাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সম্মত হন নাই। এই আইন-সভার সঙ্গে প্রসন্নকুমার অন্য ভাবে যুক্ত হন।

প্রসন্নকুমার ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে বরাবর সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। ১৮৬৭ সনে ১৯এ এপ্রিল তিনি ইহার সহকারী সভাপতি হইলেন। কিন্তু এই বৎসরের ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইলে প্রসন্নকুমার তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত (মাত্র দেড় বৎসর কাল) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবধি ভারতবর্ষীয় সভার বিভিন্ন কার্যে প্রসন্নকুমার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। এই সভার বর্তমান স্থায়ী আবাস মুখ্যতঃ

---

৫ *The Friend of India,* November 27, 1851.

প্রসন্নকুমারেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল।[৬] তিনি ইহা ক্রয়ের জন্য নিজে দশ হাজার টাকা সভাকে দান করেন।

আইন-সভা বা ব্যবস্থা-পরিষদ

আইন-সভা বা ব্যবস্থা-পরিষদ বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষে তাহার সূচনা হয় ১৮৫৪ সনে। বারো জন সদস্য লইয়া এই সভা গঠিত হইল। এই সদস্যদের মধ্যে ভারতীয় একজনও ছিলেন না, বলিয়াছি। তবে আইন-প্রণয়নকালে ইউরোপীয় সদস্যগণকে দেশীয় আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বুঝাইয়া দিবার জন্য ভারত সরকার একজন সহকারীর পদ সৃষ্টি করেন। এই পদের নাম দেওয়া হয় ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার এই নিয়োগের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর' ২৪এ জুন, ১৮৫৪ তারিখে লেখেন—

"ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিভ অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সমাজ নিয়মিত মতে বিশেষ দক্ষতা পূর্ব্বক ব্যবস্থা সৃজন করিবেন সম্প্রতি তাহার সর্ব্বানুষ্ঠান হইয়াছে তদ্দলে নিতান্তদক্ষা বিধিজ্ঞ বহুদর্শী মহাশয়েরা লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারদিগের কার্য্য ধার্য্য করণার্থ তদ্রূপ সুযোগ্য সম্পাদকও নিয়োজিত করিয়াছেন। অল্প দিন গত হইল সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ একটিং মাষ্টার শ্রীযুত মরগেণ সাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তদন্তে প্রচার হইয়াছে যে আমারদিগের মিত্রবর বিধিদর্শী শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়কে তৎ সহকারিতা পদ গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ জানাইবার পর তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইংলিশম্যান সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে অতি ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত উক্তি উক্ত করিয়াছেন এবং সকলেই ঐক্য-বাক্য অবলম্বনে কহিবেন যে উক্ত বাবু এতদ্রাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা ও আচার ব্যবহারাদি যেমন বিজ্ঞাত ও কোন্২ ব্যবস্থা সংশোধন ও কোন্ প্রকরণে নবীন নিয়ম সংস্থাপন হইলে রাজ্যের দুঃখ মোচন হইতে পারে এবং কখন্ কোন্ বিষয়ের প্রয়োজন হওন সম্ভব ইত্যাদি প্রকরণে যে প্রকার সমন্ত্রণা করিতে পারিবেন তাহা অপর কর্ত্তৃক সম্ভবিবে না একারণ তিনি উল্লেখিত ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ হইলেই উচিত হইত কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপদ প্রদানে ক্ষমতাপন্ন নহেন একারণ যদিচ শ্রীযুত বাবু এক্ষণে ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ লইতে পারিলেন না তথাপি তৎসম্পাদকীয় কর্ম্মে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরিণামে বিলাতীয় প্রধানগণের নিকট পুরস্কৃত হইবেন সন্দেহ নাই…।"

১৮৬১ সনের আইন বলে নূতন আইন-সভা গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রসন্নকুমার এই পদে কার্য করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৮৫৭-৫৮ সনে সিপাহী বিদ্রোহের দরুন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, বিদ্রোহ দমন হইলে এরূপ ব্যাপারের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সরকার সে বিষয়ে সবিশেষ তৎপর হইলেন। আইন-সভায় কোনও ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতবাসীদের মনোভাব অবগত হওয়া সরকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা তাহার একটি প্রমাণ। ভারতীয় আইন-সভায় ভারতীয় সদস্য গৃহীত হইলে সিপাহীবিদ্রোহ আদৌ সম্ভব হইত না — সার সৈয়দ আহ্‌মেদ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ সনে বিধিবদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট' দ্বারা যে নূতন

৬ *Speeches of Rajendra Lala Mitra*, p. 26.

আইন-সভা গঠিত হইল তাহাতে সর্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়। এই আইন-সভায় প্রথম বারে কিন্তু একজনও বাঙালী সদস্য লওয়া হয় নাই। ১৮৬২ সনের প্রথমে বঙ্গীয় আইন-সভা গঠিত হইলে তাহাতে চারি জন বাঙালী সদস্য গৃহীত হইয়াছিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রসন্নকুমার ছিলেন একজন। ইঁহার পরে ভারতীয় আইন-সভায় প্রসন্নকুমার সদস্য মনোনীত হন। তিনিই বড়লাটের আইন-সভার প্রথম বাঙালী সদস্য। ১৮৬৮ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি আইন-সভার সদস্য ছিলেন। প্রসন্নকুমার সরকারের নিকট হইতে ১৮৬৬ সনে সি. এস্. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রসন্নকুমারের যোগাযোগের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সহিত প্রসন্নকুমারের সংযোগ ঘটে। ১৮৪৫ সনে কলিকাতায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষও ইহার পূর্ণ সমর্থন করেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্স তখন ইহাতে রাজী হন নাই। অবশেষে ১৮৫৪ সনের ১৯এ জুলাই বিলাত হইতে যে শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচ বা নির্দেশপত্র ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয় তাহাতে অন্যান্য প্রদেশের মত কলিকাতায়ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ প্রদত্ত হইল। এই আদেশবলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে স্থানীয় প্রয়োজনানুরূপ নিয়মাবলী রচিত হইবার পর সরকার ১৮৫৭ সনের ২৪এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের মধ্যেই সেনেট সভার সভ্যদের নাম সন্নিবেশিত করা হয়। প্রসন্নকুমার এই সভ্যদের মধ্যে একজন মনোনীত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারেও তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন, বলাই বাহুল্য।

একটি বিষয়ের জন্য প্রসন্নকুমারের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হইয়া আছে। প্রসন্নকুমার ব্যবহারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জাতির গৌরব ফিরাইয়া আনার পক্ষে ব্যবহারশাস্ত্রের চর্চা অত্যাবশ্যক — একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। ১৮৬২ সনের ১০ই অক্টোবর তিনি একখানি 'উইল' বা চরম স্বেচ্ছাপত্র করিয়া যান। এই উইলের বিষয় একটু পরেই বলিতেছি। উইল দ্বারা প্রসন্নকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে "Tagore Law Professor" বা ঠাকুর আইন অধ্যাপকপদ সৃষ্টির জন্য মাসিক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইহাতে এই সর্ত থাকে যে, ঠাকুর আইন অধ্যাপক বার্ষিক দশ হাজার টাকা বেতনে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। ছাত্র এবং জনসাধারণ বিনা দক্ষিণায় এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক অধ্যাপকের বক্তৃতা প্রদত্ত সম্পত্তির আয়ের অবশিষ্টাংশ হইতে মুদ্রিত হইবে এবং অন্যূন পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। এইসকল ব্যয় বহন করিবার পরও যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা আইনের প্রামাণিক পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ করাইতে হইবে। আর এসকল কার্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এক বৎসরের শেষ দিকে এতদনুযায়ী কার্য আরম্ভ করিতে হইবে — প্রসন্নকুমার 'উইলে' এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রসন্নকুমারের দান সানন্দে গ্রহণ করিয়া এই উদ্দেশ্যে নিয়মকানুন প্রস্তুত

করিলেন, হার্বার্ট কাউয়েল ১৮৭০ সনে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "The Hindu Law, being a Treatise on the Law administered exclusively to Hindus"। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক হন শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার (১৮৭৩)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগীয় আর একটি কার্যের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের নাম বিজড়িত হইয়া আছে। প্রতি বৎসর জুন এবং ডিসেম্বর মাসের আইনের শেষ পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া ছয় মাসের জন্য একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। এই বৃত্তিটির নাম "Prasannakumar Tagore Law Scholarship" বা 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন বৃত্তি'।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিয়া রাখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসের বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি উপবিষ্ট মূর্তি রহিয়াছে। এটি প্রসন্নকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 'উইলে' স্বত্বাধিকার-প্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন। বড়লাট লর্ড রিপন কর্তৃক এই মূর্তিটি ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও 'উইল'

প্রসন্নকুমার-কৃত 'উইল'[৭] বা চরম স্বেচ্ছাপত্রের একটি ধারার বিষয় এই মাত্র বলিয়াছি। উইলের কথা বলিতে গেলে পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথাও আসিয়া পড়ে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমারের একমাত্র পুত্র (জন্ম ২৪ জানুয়ারি, ১৮২৬)। তিনিও হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র, কিছু দিন মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার বলিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্রবে আসেন এবং ১৮৫১ সনের ১০ই জুলাই তাঁহারই দ্বারা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার বৎসরখানেক পরেই তিনি কৃষ্ণমোহনের প্রথমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৫১ সনে আবার ভারতবাসীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া 'লেকস লোসাই' অর্থাৎ 'ধর্মান্তরীয়দের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দান' মূলক আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। প্রসন্নকুমার বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিলেও এই আইনের ভীষণ বিপক্ষ হইলেন। পুত্র খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া স্বভাবতই ব্যাকুল হন। ১৮৬২ সনে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যে তাঁহার বাৎসরিক আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। এই আয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

প্রসন্নকুমার পুত্রের বিবাহকালীন দান বা যৌতুক বাদে তাঁহাকে আর কিছুই দিলেন না। ১৮৬২ সনের ১০ই অক্টোবরের উইলে পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পরিবর্তে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার একটি ট্রাস্ট বোর্ডের উপর অর্পণ করিলেন। ইহাতে ছিলেন — রমানাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আত্মীয় স্বজন পরিজন দেব-বিগ্রহ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য মাসহারা বা দান ব্যতিরেকে যাবতীয় সম্পত্তির রক্ষী স্বরূপ

৭ এই উইলটি পাওয়া যাইবে — "Ganendra Mohan Tagore *vs.* Upendra Mohan Tagore and others", *4 Bengal Law Reports* (1869), O.C., p. 103. এবং *Weekly Reports* (1869), Sup. Vol. I, p. 423.

যতীন্দ্রমোহনকেই তিনি নির্দিষ্ট করিয়া যান। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহা দ্বারা যতীন্দ্রমোহনই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন।

প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিন্তু এই উইল স্বীকার করেন নাই। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই হাইকোর্টে মামলা রুজু করিলেন। হাইকোর্ট হইতে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত মামলা গড়াইল। ১৮৭২ সনের ২০, ২২ ও ২৩এ ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই জুলাই শুনানী হইয়া মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। জজেরা এই মর্মে রায় দিলেন যে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব পাইবেন। তাহার পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইহা ভোগদখলের অধিকারী হইবেন। প্রসন্নকুমার উইলে যে-সমুদায় দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন জীবৎকালে তদনুযায়ী কার্য করিয়া যাইবার অধিকারী হইলেন।

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে এই মোকদ্দমাটি আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। 'ঠাকুর বনাম ঠাকুর' (*Tagore vs. Tagore*) মোকদ্দমা নামে এটি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

দান

প্রসন্নকুমারের দান অতুলনীয়। উইলে যে সকল দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠে সবিস্তারে জানিতে পারিবেন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করিব। প্রসন্নকুমার ইতিপূর্বে জনহিতে অল্পবিস্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে হিন্দু-কুলললনাদের জন্য গঙ্গাতীরে একটি স্বতন্ত্র স্নানের ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ২৮এ জানুয়ারী এই সংবাদে লিখিলেন, "...এ পর্য্যন্ত কলিকাতার গঙ্গায় অন্য কেহ স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র স্নান ঘাট নির্ম্মাণ করাইতে পারেন নাই, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় তাহা করাইয়া দিলেন...।"

উইলে বর্ণিত 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' বিষয়ক দানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রসন্নকুমার আত্মীয়-স্বজন কাহারও জন্য অর্থের সংস্থান করিয়া যাইতে ভুলেন নাই। এসব বিষয় এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ব্যাবসা ও জমিদারী উভয় বিভাগের ভৃত্যসমেত কর্মীমণ্ডলী প্রত্যেকের জন্যও অর্থের বরাদ্দ করিয়া যান। উভয় বিভাগের যে সকল কর্মী দশ বৎসর বা ততোধিক কাল কার্যে রত তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ মাসিক বেতনের প্রতি টাকায় একশত টাকা এবং যে-সব কর্মী পাঁচ বৎসর বা তদূর্ধ্ব এবং দশ বৎসরের নিম্নে কার্যে রত তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতনের প্রতিটাকায় পঞ্চাশ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত রূপে দেয় টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ এই নিয়মে হইবে— "আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পাঁচ বৎসরে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত মাহিনা সমষ্টিকৃত করিয়া (totalled) তাহাতে গড়ে যে টাকা মাসিক দাঁড়ায় সেই টাকার প্রত্যেকটির উপর উপরোক্ত ভাবে একশত বা পঞ্চাশ টাকা হইবে।" প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁহার মৃত্যুর পর দেয়। মূল উইলে মুলাজোড় শিব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজার্চনার জন্য পিতা গোপীমোহন ঠাকুর প্রদত্ত অর্থ-বরাদ্দ ব্যতিরেকে নিজ সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি মাসে হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। প্রসন্নকুমার মূলাজোড়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবমন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সংস্কৃত কলেজের জন্য ১৮৬৮ সনের ৫ই জুলাই পূর্বেকার উইলের শিবমন্দির সংক্রান্ত

অংশ বাদ দিয়া নূতন করিয়া একটি উইল করিলেন। ইহাতে তিনি এই তিনটি ব্যাপারের ব্যয়নির্বাহার্থ জমিদারীর অংশ বিশেষ এবং গবর্ণমেণ্টের কাগজ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। সংস্কৃত কলেজ গৃহ নির্মাণের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ইহাতে আলাদা করিয়া রাখা হয়। যতীন্দ্রমোহন এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপর স্বতন্ত্রভাবে এই তিনটি পরিচালনার ভার অর্পিত হইল।

ইহা ছাড়া প্রসন্নকুমারের উল্লেখযোগ্য দান — ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটি এবং নেটিভ হাসপাতাল প্রত্যেকটির জন্য দশ হাজার টাকার বরাদ্দ। প্রসন্নকুমার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ আরম্ভ হয় ১৮৩৩ সন হইতে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রসন্নকুমার ১৮৬৮ সনের ৩০এ আগস্ট পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু সাধারণ আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নিজ বাটীতে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান করেন পরবর্তী ২৯শে অক্টোবর তারিখে। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসন্নকুমারের গুণপনার উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ অথচ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহা হইতে কিয়দংশ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। বক্তৃতার উপসংহারে রাজেন্দ্রলাল বলেন—

"Baboo Prosunno Coomar was so to say a liberal conservative or a moderate progressionist. He wished and laboured hard to move onwards, and did advance pulling his countrymen along with him. He knew that reformation to be real should proceed from within, and not from without, he knew that it should emanate from the mind, and not to be superposed on the body ; he knew that it should be a revolution of feeling, and not of dress, and to effect it he remained with the people, and tried to leaven the whole mass by his precepts and example, which operated with all the greater force and effect because they came from one of the people."[৮]

রাজেন্দ্রলালের মতে প্রসন্নকুমার সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রতিনিয়ত স্বদেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণ সাধারণে গ্রাহ্য হইয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত তাহাদেরই একজন তাহাদের জন্য এইরূপ প্রচেষ্টায় লিপ্ত। প্রসন্নকুমার উদার এবং প্রগতিশীল ছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়েই উগ্র মতবাদ পোষণ করিতেন না। তিনি মনে করিতেন — বহিরাবরণের পরিবর্তনে জাতির বা সমাজের কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, এজন্য চাই তাহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন। বাহির হইতে চাপানো জিনিস দ্বারা এই মনোভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়, মানুষের অন্তর হইতে উদ্ভূত তাগিদ হইতেই এইরূপ পরিবর্তন সংঘটন সম্ভব।

রামমোহনের আদর্শে প্রসন্নকুমার যৌবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সারাজীবন চিন্তা ও

৮ *Speeches of Rajendra Lala Mitra,*

কর্মের মধ্য দিয়া তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইলেন। রাজনীতিতে বেসরকারী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কার্য করিলে স্বদেশের সর্ববিধ — সুতরাং রাষ্ট্রীয় উন্নতিও সম্ভব এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর বিবিধ কর্মে অগ্রসর হন। প্রসন্নকুমারও যৌবনে তাঁহাদের সকল কর্মেই সহযোগী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে সরকারী নীতির রদবদল হওয়ায়, যে বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সমাজ এক সময় ভারতবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়া সরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল তাহারাই ক্রমে ভারতবাসীর বিরোধী হইয়া উঠিল। ভারতবাসী এবং ইউরোপীয় সমাজের স্বার্থ-সংঘাতের ফলে জাতি-বৈরের উৎপত্তি হইল। প্রসন্নকুমারের জীবিতকালেই ইহা সংঘটিত হয়। তিনি বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের মনোভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তবে এই সময় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ব্যতীত স্বদেশবাসীর হিতসাধন সম্ভব নয় বুঝিয়া বিভিন্ন বিষয়ে নিজ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খ্রীস্টান পাদ্রী কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ উৎপাত অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই সময় পাদ্রীদের কার্যের প্রতি সরকার কতকটা সহানুভূতি দেখাইতেছিলেন। প্রসন্নকুমার ইহার প্রতিবাদে কিছুকালের জন্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। একমাত্র পুত্রের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে প্রসন্নকুমার যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তৎকৃত উইলই তাহার প্রমাণ। প্রসন্নকুমারের জীবনে কোমলতা ও কঠোরতা, উদারতা ও রক্ষণশীলতার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই।

সংশোধন ও সংযোজন

১। গত সংখ্যা 'বিশ্বভারতী'তে (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫, পৃ. ১৭১) আমি লিখিয়াছিলাম যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "কন্যা বালসুন্দরী ইংরেজ গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন।" বালসুন্দরী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্যা নহেন, পুত্রবধূ; এবং একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রথমা পত্নী।[১] শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী 'বালসুন্দরী' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহাতে এই ভ্রমটি সংশোধনের সুযোগ পাইয়া তাঁহার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২। প্রসন্নকুমারের প্রথমা কন্যা যে বিদুষী ছিলেন, সমসাময়িক একাধিক পুস্তক ও পত্রিকায় সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত *A Prize Essay on Native Female Education* (পুরস্কার-রচনা হিসাবে প্রদত্ত ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে এবং প্রকাশকাল ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে) হইতে ইহার সপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর'ও এসম্পর্কে লেখেন—

"আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে২ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলাম, এসময়ে ঐ কন্যা বর্ত্তমানা থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা

---

১ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত *Family Tree of Darpanarayan Tagore* দ্রষ্টব্য

প্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, যাহা হউক, গত সূচনায় শোক বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন নাই··· ।"

৩। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত পুস্তকের যে অনুচ্ছেদটি (পৃ. ১১৪-৫) হইতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার আরম্ভে আছে—

"The admission of European teachers for the education of *male* children has actually been often allowed by the most respectable members of the native community, who considered it fashionable at one time to employ private tutors for their boys ; and if an equal interest could be excited in behalf of girls, many Baboos would doubtless realise of their own accord the idea of female instruction in the Zenana. In one instance at least, we know such a course had been pursued with considerable success. The provision which Baboo Prosunno Coomor Tagore had made for the education of his late-lamented daughter···" ইত্যাদি।

ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রসন্নকুমার 'জেনানা'য় অর্থাৎ নিজ অন্তঃপুরে কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা-লাভোদ্দেশ্যে ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে যুগে কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানীকে হেদুয়ার পূর্বপার্শ্বস্থ সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মিসেস উইলসন তাঁহার ভবনে গিয়া পড়াইতেন।[২]

৪। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিবাহ হয় যশোহরের নরেন্দ্রপুর নিবাসী রামধন বক্সীর কন্যা উমাতারা দেবীর[৩] সঙ্গে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে। নিম্নের বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এই—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং—

খবর দেওয়া জাইতেছে—যে শ্রীযুত বাবু গোপিমোহন ঠাকুরের [২৫০০০ টাকা মূল্যের] হিরা বসান যে অঙ্গরী তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিবাহ রাত্রে [১০ই মার্চ্চ] হাতে হইতে হারাইয়া ছিলো জাহার খবর এই আপিসের কাগজে দেওয়া গিয়াছে সেই অঙ্গরী সামবাজারের শ্রীছিদাম রাজমিস্ত্রী অদৃষ্ট ক্রমে পাইয়া পুলীস আপিসে উপস্থিত করিয়া ছিলো, পরে সেই অঙ্গরী ও মিস্ত্রী সমেত শ্রীযুত বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়া ছিলো এবং ঐ মিস্ত্রীকে শ্রীযুত বাবু ১০০০ এক হাজার টাকা বকৃশিষ দিয়াছেন ইতি—"—Supplement to the *Government Gazette*, March 20, 1817.

৫। 'গৌড়ীয় সমাজ' অনুচ্ছেদে (বিশ্বভারতী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৫, পৃ. ১৬৭, নিম্ন হইতে পঞ্চম পংক্তি) "কাশীকান্ত ঘোষালের ব্যবহারমুকুর" স্থলে "কালীশঙ্কর ঘোষালের ব্যবহারমুকুর" হইবে।[৪]

২৫-৬-৪৯ **শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল**

---

২ *Hindoo Female Education*. Priscilla Chapman. 1889. p 88.

৩ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত *Family Tree of Darpanarayan Tagore* দ্রষ্টব্য

৪ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪

স্বরলিপি

মিশ্র কালাংড়া—খেম্‌টা

গান ॥ এত ফুল কে ফোটালে

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　**স্বরলিপি** ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

॥ [-া]

গা | পা সা -া II { গা -া -মা | পা ণদা -পা I মপা -া -া | -া -া -মা I
এ ত ফু ল্‌ কে ০ ০ ফো টা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I (গা -া -মা | পা -ণদা -পা I মা -পা মা | জ্ঞরা সা -া)} I
কা ০ ০ ন ০ ০ নে ০ "এ ত০ ফু ল্‌"

I { -া -া দা | দা না -র্সা I র্সঋর্া -া -র্সা | না র্সা -া I
০ ০ ল তা পা ০ তা ০ য়্‌ এ ত ০

I -া -না র্সা | র্সগর্া ঋর্া -র্সা I না -র্সা না | ণদা পা -া } I
০ ০ হা সি ত ০ র ০ ঙ্গ ম রি ০

I মগা -া -মা | পা ণদা -পা I মা -পা মা | জ্ঞরা সা -া II
কে ০ ০ ও ঠা ০ লে ০ "এ ত০ ফু ল্‌"

II { -া -া দা | দা না -র্সা I র্সঋর্া র্সা -ঋর্সা | না র্সা -া I
০ ০ স জ নী র্‌ বি য়ে ০০ হ বে ০

I -া -না র্সা | র্সগর্া ঋর্া র্সা I র্সনা র্সা -না | দা পা -া } I
০ ০ ফু লে রা শু নে ছে ০ স বে ০

I -া -া র্সা { র্সা সা -া I গা -া -মা | পা ণদা -পা I
০ ০ সে ক থা ০ কে ০ ০ র টা ০

I (মপা -া র্সা) } | মপা -া -া | -া -া -মা I মগা -া -মা ।
লে ০ সে লে ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ০

। পা ণ-দা -পা I মা -পা মা | জ্ঞরা সা -া II II
ন ০ ০ নে ০ "এ ত০ ফু ল্‌"

"সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে"

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি** ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

{ সা সা II রা -সা রা রা | গা -রা গা গা | মা -ধা পা মা | -গা -া } -মা -রা I
সু খ হী ন্ নি শি দি ন্ প রা ধী ন্ হ য়ে ০ ০ ০ ০

॥

I -া [র]পা মা -গা | [গ]মা -রা -া সা | -া রা [স]ন্া -া | সা সা সা সা I
০ ভ্র মি ০ ছ ০ ০ দী ০ ন প্রা ০ ণে স ত ত

I [র]মা -রা -া মা | মা মা পা পা | পা পা ণা ধা | পা [প]ণা ধা পা I
হা ০ য়্ ভা ব না শ ত শ ত নি য় ত ভী ত পী

I মগমা রা মা রা | মা পা ধা র্সর্সা | ধা পধপা -া মা | গরা -গা সা সা II
ড়ি০০ ত শি র ন ত শ ত০০ | অ প০০ ০ মা নে০ ০ "সু খ"

-া পা পা II [প]না -ধা -া -র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সনা -র্রা র্সা -া | -া র্সা র্সা র্সা I
০ জা নো না ০ ০ ০ রে ০ অ ধো উ০ ০ ধের্ব ০ ০ বা হি র

I র্সনা -র্রা র্সা র্সা | -া -নর্সা -ধা -পা | মা পা ধনা -সর্রা | র্সা -ধা -া পা I
অ০ ০ স্ত রে ০ ০০ ০ ০ ঘে রি তো০ ০০ রে ০ ০ নি

I -মা পা মা -গা | [গ]মা -রা -া সা | -া রা গা রা | গা -া গা মা I
০ ত্য রা ০ জে ০ ০ সে ই অ ভ য় আ ০ শ্র য়

I -া -া -া -া | {-া -া সা সা | রা মা রা মা | মা মা মা পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তো লো আ ন ত শি র ত্য জো রে

I পা পা পা পা } | -া -া -া -া | [প]ণা ধা পা ণা | ধা পা মগমা রা I
ভ য় ভা র ০ ০ ০ ০ স ত ত স র ল চি০০ তে

I মা রা মা পা | ধা র্সর্সা -া ধা | পধপা -া -া মা | গরা -গা সা সা II II
চা হ তাঁ রি প্রে ম০ ০ ০ মু খ০০ ০ ০ পা নে০ ০ "সু খ"